ELEVENTH HOUR
James Hadly Chase
Translate by
Nirmal Kanti Ghosh

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশিকা
শ্রীমতি আলোরানী পাত্র
২৮/এ পঞ্চানন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
প্রদোষকান্তি বর্মন

মুদ্রক
শ্রীজয়দেব আড়ু
নিউ জয়তারা প্রেস
২৭-বি, সাহিত্য পরি[illegible] স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

।। এক ।।

কেউই কখনো বলতে পারে না আঘাত কখন আসবে। যখন আমি রোলো মার্টিনকে দেখি তখন তার সম্বন্ধে গোপন মিলিটারী ফাইলে এই মন্তব্য লিখি। স্বাভাবিক অবস্থায় সে একজন ফূর্তিবাজ লোক বলা যায় না। তবে একটা কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে সে একটা বোকা।

মার্টিন খুব মদ খায়। মাঝে মধ্যে মাতাল হয়ে পড়ে এবং কিছুটা ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে।

যখন মার্টিনের সামনে দিয়ে কোন মেয়েছেলে হেঁটে যায় তখন সে কোন-রকম মন্তব্য করলেও করতে পারে। তবে এ নিয়ে যে সে খুব একটা মাথা ঘামায় তা আমার মনে হয় না।

এ কথাটা ভাবার যে আমার কোন কারণ নেই তা আদৌ বলা যাবে না। সে পরিণত নয় এবং যার জন্যে সে হ্যারিলাইমকে ভক্তি করে, সেই সঙ্গে ভালোও বাসে।

'স্বাভাবিক অবস্থায়' কথাটা লিখছি এজন্য যে, হ্যারিলাইমের অন্ত্যেষ্টির সময় আমি রোলো মার্টিনকে প্রথম দেখি। তখন ফেব্রুয়ারী, শীতকাল। চারিদিকে বরফ পড়েছে।

কবর খননকারীরা ভিয়েনার কেন্দ্রীয় গোরস্থানে বাধ্য হয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে বরফ খুঁড়ছিল। তখন তা দেখে আমার মনে হচ্ছিল, যেন প্রকৃতিও প্রাণপনে হ্যারিকে পরিত্যাগ করতে চাইছে। অন্তত পরিবেশ যেন সে কথা জানিয়ে দিচ্ছিল।

খননকারীরা বরফ সরালো এবং শেষ পর্যন্ত হ্যারিকে কবরস্থ করা হলো। ফলে তার অধ্যায় শেষ হলো।

হ্যারিকে কবর দেওয়ার সাথে সাথে মার্টিন চলে গেল। যেন তাড়াতাড়ি বিদায় নেয় বলা চলে। দেখে মনে হলো, সে যেন এখান থেকে দৌড়ে পালালো। অন্তত তার চলে যাওয়ার গতি দেখে তাই মনে হলো।

মার্টিনের বয়স পঁয়ত্রিশের কম হবে না। তবু যেন ওকে বুড়ো বলে মনে হলো। ছোট ছেলের মত ওর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

রোলো মার্টিন বন্ধুত্বে বিশ্বাস করে। তবে পরবর্তীকালে তাকে এর জন্য নিদারুণ আঘাত পেতে হয়েছিল। সে কথাগুলি বলে রাখা ভালো। ব্যাপারে অনেকের মত আমায়ও বলেনি। বললে হয়তো অনেক ঝামেলার হাত থেকে এড়াতে পারতো, অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।

এই আশ্চর্য এবং দুঃখের ব্যাপারটা জানতে হলে আমাদের কিছুটা পিছিয়ে যেতে হবে। ভিয়েনা পরিত্যক্ত ও বিষন্ন। ভিয়েনা চারটে বৃহৎ শক্তি কবলিত। রাশিয়া, বিট্রেন, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের অঞ্চলগুলো শুধু বিজ্ঞপ্তির দ্বারা চিহ্নিত।

চার শক্তির নিয়ন্ত্রণে শহরের মাঝে মাঝে বড় বড় বাড়িগুলো রয়েছে। ওগুলো জনসাধারণের, এরই মাঝে 'ইনিয়ার ... ' বাড়ি আছে। এটা একটা সুইশ বাড়ি। এ বাড়ির অনেক ক্ষম ... এর নির্দেশ অনুযায়ী এক মাস অন্তর এক একটা শক্তি ক্ষমতায় আসে এবং ... ই মত কাজ করে যায়।

তুমি যদি বোকার মত কোন নৈশ ক্লাবে ... শিলিং খরচ করে সময় কাটাও তাহলে বুঝতে পারবে। চার জনের একটা টহলদারী দল নিরাপত্তার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এই টহল সারারাত ধরে চলছে। শুধু তাই নয়, সেই দলে ঐ চার বৃহৎ শক্তির একজন করে থাকে।

যুদ্ধের মাঝামাঝি ভিয়েনা কেমন ছিল তা আমার জানা নেই। পুরানো গান আমার মনে নেই। ভুলে গেছি। অনেক চেষ্টা করলেও তার দু'একটা লাইন মনে করতে পারবো না। ফলে সে চেষ্টায় আর যাচ্ছি না।

চাকচিক্যের বেলায়ও আমার একই কথা। স্মরণ করতে পারছি না। সমস্ত কিছু ধূসর আমার কাছে।

আমার কাছে শহরটা গৌরবহীন। যা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। এর পিছনে হয়তো অনেক গোপন করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে। তা আমার অজানা। হয়তো অনেক খোঁজ খবর করলে জানা যাবে।

শহরটার সত্যি একটা ছন্নছাড়া অবস্থা। বরফে ঢেকে থাকে। সরায় না। ফেব্রুয়ারীতে তো একবারে ঢেকে যায়। রাশিয়ার অঞ্চল বরাবর ডানুয়ুব নদী। নদী যেন নিশ্চল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নদীতে তেমনি কাদা। এ অঞ্চলের চারদিকটা যেন ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ থাকে না। বলা আরো এ অবস্থা। চারিদিক ঝোপ ঝাড়ে ভর্তি। আগাছারও ইয়ত্তা নেই।

শুধু কবরখানা দেখে মনে হয় যেন অচল। এর পাখা হাওয়ায় চলে। সেগুলো একমাত্র সচল অবস্থায় রয়েছে। কবরখানার কাছেই একটা পুকুর। তবে একসময় ওটা একটা পুকুর ছিল তা বলা বোধ হয় ভালো। পুকুরের চারদিকে রেলিং দেওয়া আছে। সে রেলিং-এ মরচে পড়েছে এবং পুকুরও কচুরিপানায় ভর্তি। জল প্রায় দেখাই যায় না।

পুকুরের কাছে অনেকগুলো গাছ আছে। মাথায়ও বেশ বড়। তবে ওগুলো কি তা বলা মুশকিল। কাছে যাবার উপায় নেই। দূর থেকে চেনা যায় না। আর আগাছাগুলোও পাতলা বরফে ঢেকে রয়েছে।

এটা কেমন ছিল তা এখন সবটা মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু মনে আছে, যেমন রাশিয়ার সৈনিকরা পশমের টুপী পরে কাঁধে রাইফেল নিয়ে চলাৰ

ফেরা করছে। অথবা কেউবা ওভারকোট পরে পুরনো ভিয়েনার কোন একটা জানালায় বসে একটু একটু করে কফি খাচ্ছে।

হঠাৎ আমার ৭ই ফেব্রুয়ারীর কথা মনে পড়ে। তখন রোলো মার্টিন এখানে এসেছিল। তখন ভিয়েনার মোটামুটি অবস্থা এমন ছিল।

আমি আমার কাজ পত্তর এবং মার্টিনের কাছ থেকে যতটা সম্ভব জেনে ঘটনাটা সাজিয়েছি। আমি এর এক অক্ষর বানিয়ে বা মিথ্যে বলছি না। তবে মার্টিনের স্মরণশক্তি সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করতে যাচ্ছি না এবং এর মধ্যে একটি মেয়েকেও আনতে হবে। নইলে জমবে না। বাজে হয়ে যাবে। এবার আসুন সেই গল্পে আসা যাক।

।। দুই ।।

একজন ব্রিটিশ নাগরিক কেবলমাত্র পাঁচ পাউণ্ড বিদেশী মুদ্রা নিয়ে এখানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু খরচ করার কোন অধিকার নেই।

একথা রোলো মার্টিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করতে চেয়েছে। তাকে সাহায্য করেছে হ্যারি লাইম। তারই আমন্ত্রনে সে এখানে আসতে পেরেছে, কিন্তু অষ্ট্রিয়া এখনো অধিকৃত অঞ্চল।

এখানে আসার জন্য হ্যারি মার্টিনকে বলেছে, তুমি আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু-দের ব্যাপারে কিছু লিখতে পারো।

এ বিষয় মার্টিন অনভিজ্ঞ। তবু একথা বলা যায় না। সে সায় জানিয়েছিল। এখানে আসতে পারলে সে একটা দিনের জন্য অন্তত অবকাশ পাবে। ডাবলিন ও আমস্টারডামের ঘটনার পর সে মনে প্রাণে এটাই চাইছিল।

মার্টিন মেয়েদের উদাসিন বলা যায়। সে সব সময় মেয়েদের একটা সাধারণ ঘটনার মত বাদ দিতে চেষ্টা করে। কারন এগুলোকে ঠিক তার ইচ্ছানুসারে ঘটতো না। ভাবে, এতে ঈশ্বরের হাত রয়েছে। সে নিমিত্ত মাত্র।

মার্টিন এক সময় ভিয়েনায় এসে হাজির হয়। যখন সে এখানে পেঁছিলো তখন তার দৃষ্টি সতর্ক হয়ে উঠলো এবং মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখছে।

মার্টিনের তাকানোটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। অদ্ভুত লাগছে। তা আমার মনে রীতমতন সন্দেহ জাগিয়ে তুললো এবং একটা কথা বুঝতে পারছিলাম বিশেষ কয়েকজনের মধ্যে একজনকে দেখার ভয়ে ও শংকিত। অন্তত এর চোখ মুখের ভাব যেন সেই কথা বলছে।

একবার একটু বার্ক ডেক্সটারের কথা বলি। বার্ক ডেকস্টারের ছদ্মনামে রোলো মার্টিন সস্তার পাশ্চাত্য প্যাকেট বুক লিখতো। এটা তার পেশা। তার পাঠক সংখ্যাও অগণিত হলেও কিন্তু তার সময় খুব একটা ছিল না।

মার্টিন বলেছিল, হ্যারি ইচ্ছে করলে ব্রিটিশ হোটেল ও ক্লাবের খরচাপাতির জন্য স্থানীয় মদ্রা যোগাতে পারে। সুতরাং মার্টিন ঠিক পাঁচ পাউণ্ড ব্রিটিশ মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে ভিয়েনায় পা দিল।

প্লেনটা এসে লণ্ডনের ফ্রাংকফুটে দাঁড়ালো। এখানে এক ঘণ্টা থামলো, সেই সময় একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটলো। সে ঘটনায় আসি।

মার্টিন একটা আমেরিকান রেঁস্তোরায় ঢুকলো। ঢুকে সে 'হামবুর্গ' অর্ডার দিল। একসময় খেতেও শুরু করে দেয়। ঠিক তখনই সে দূর থেকে একজনকে আসতে দেখলো। তাকে সে চিনতে পারে। ও একজন সাংবাদিক।

সাংবাদিক মার্টিনের কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর মৃদু হেসে বলে, আপনিতো মিঃ ডেকস্টার, তাই না ?

মার্টিন একটু ইতস্তত বোধ করে। তবু সচকিত হয়ে আবার জানায়, হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন তো ?

—আপনাকে ছবির চেয়ে অনেক অল্প বয়সী লাগছে।

—ধন্যবাদ ! তাই নাকি ? মার্টিন একটু হাসে।

—এবার আপনাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

—আমি একটু এখন ব্যস্ত আছি।

—আমি আপনার বেশী সময় নেবো না।

—বলুন কি জানতে চান ?

—আপনি ফ্রাংকফুট সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি ?

মার্টিন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলে, একথা আপনি জানতে চাইছেন কেন ?

—আমি এখানকার একটা স্থানীয় সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি।

—প্লীজ ! আমায় এখন কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এখানে মাত্র দশ মিনিট হল এসেছি।

—তাই যথেষ্ট, সাংবাদিকটি আরো বলে। আমেরিকার উপন্যাস সম্বন্ধে আপনার কি ধারনা ?

—ওসব আমি পড়ি না, মার্টিন তাচ্ছিল্ল প্রকাশ করে। সাংবাদিক কিছুটা অবাক হয়ে পড়েন না ?

—না, মার্টিনের সেই একই উত্তর।

—এ উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

—আপনার আর কি কোন প্রশ্ন আছে ?

—আছে দু একটা।

—তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন।

—আপনি তো বেশ রসিক।

—কিসে বুঝলেন ? মার্টিনের পাল্টা প্রশ্ন।

—নইলে ও কথা বলতে পারতেন না। থাক্ সে কথা। আচ্ছা, ঐ যে সামনে বসা লোকটি, যার মাথার চুল ধূসর, সামনের দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে এবং এক খণ্ড রুটি চিবচ্ছে, তাকে কী আপনার ক্যারী বলে মনে হয় ?

—ক্যারি ? মার্টিন মুখ কুঁচকে কথা বলে। আপনি কেন ক্যারির কথা আমায় জিজ্ঞেস করছেন ?

—আমি আপনাকে জে, জি, ক্যারির কথা জিজ্ঞেস করছি।

—জে, জি, ক্যারি ? মার্টিন নামটা উচ্চারণ করে।

—হ্যাঁ সাংবাদিক মাথা নেড়ে সায় জানায়।

—না, ও নাম আমি শুনিনি।

—শোনেননি? সাংবাদিক বিস্ময় প্রকাশ করে।

—না, মার্টিনের সেই একই উত্তর।

—অবশ্য সবার যে সব কিছু শুনতে হবে এমন কোন কথা নেই, সাংবাদিক মার্টিনের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে। আচ্ছা, আপনারা গল্প লিখিয়েরা কী জগৎ ছাড়া?

—হঠাৎ এ কথার অর্থ? মার্টিন জানতে চায়।

সাংবাদিক সে কথার ধারে কাছে না গিয়ে বললো, আমি কিন্তু লোকটিকে ঠিকই চিনেছি।

—তবে আমাকে আর জিজ্ঞেস করলেন কেন। সুযোগ পেয়ে মার্টিনও ঠেস দিয়ে কথা বলে।

সাংবাদিক মার্টিনের কথার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাবে খরটা পার হয়ে বিখ্যাত ক্যারির কাছে এগিয়ে গেল।

ক্যারি সাংবাদিক দেখে ঠিক খুশী হলো না। তবু মুখ থেকে সে রুটির টুকরোটা নামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে আহ্বান জানালো। এটা নিছকই ভদ্রতা

ঐদিক সাংবাদিক মার্টিনকে 'গল্প লিখিয়ে' বলতে সে কিছুটা গর্ববোধ করলো, কিন্তু তার এই আনন্দটা বেশীক্ষণ থাকলো না। হতাশায় পরিণত হতে বেশী সময় লাগলো না, কারণ বিমান বন্দরে সে ক্যারিকে দেখতে পেল না।

মার্টিন ভাবে, এটা হ্যারি কী করে পারলো? ও যে বিমাম বন্দরে থাকবে না, তা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ সে এখানে তাকে আসতে লিখেছে।

মার্টিন মহামুশকিলে পড়ে যায়, আর তার পড়ার কথাও। এটা তার অচেনা জায়গা। এর আগে সে কোনদিন এখানে আসেনি, আর এখন তার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, মুদ্রা। এখানকার মুদ্রা তার পকেটে একটাও নেই।

মার্টিন আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে। ভাবে, হ্যারি কি বিমান বন্দরে আসার কথা ভুলে গেল? না, না, তা কী করে হবে? আরো যেখানে সে তাকে এখানে আসতে লিখেছে।

মার্টিনের এবার রাগ হয়। হবারই কথা। সে চোখে এখন সর্ষে ফুল দেখছে। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। খাওয়া তার মাথায় উঠেছে। ঘন ঘন সে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে।

মার্টিন ভাবে, হ্যারির কী এমন কাজে পড়লো যে সে এখানে আসতে পারলো না। আর সে কী ভদ্রতার পরিচয় দিতে ভুলে গেছে। এ রকম নানা কথা

সে ভাবতে থাকে।

হঠাৎ মার্টিনের আর একটা কথা মনে পড়ে, যদি হ্যারি না আসতে পারে, তাহলে তার জন্য বার্তা রেখে যাওয়া একান্তই উচিত ছিল। সে রাগে গজ গজ করতে থাকে।

মার্টিন ভাবলো সে এখন এখানে না এলেই পারতো। এখানে এসে সে এক মহা ঝকমারির কাজ করেছে। আবার উল্টে তাকে হ্যারি লোভ দেখিয়েছে যে সে এখানে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তুদের নিয়ে যা হোক কিছু লিখতে পারে।

মার্টিন লেখক মানুষ। সে যদিও এ ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নয়। তবু বন্ধুর কথায় সায় জানিয়েছিল। ফেলতে পারেনি, আর তার কী না এই পরিণতি হলো।

মার্টিনের মনটা অভিমানে ভরে ওঠে, আর তার খুব খিদে পেয়েছে বলেই সে এখানে বসে কিছু খাচ্ছে। নইলে এ মুহূর্তে কিছুই খাবার মত তার মানসিকতা নেই।

মার্টিনের অভিমানের বদলে রাগ হচ্ছে। এই তার বন্ধুত্বের পরিচয়। আর এই বন্ধুত্বের বড়াই সে এতদিন করতো। এ কথা সে ভাবতেও পারছে না। ছিঃ, ছিঃ।

আবার একটা কথা মনে হওয়ায় মার্টিনের মনটা নরম হয়ে পড়ে। মনের আর রাগ পুষে রাখতে পারে না। ভাবে হঠাৎ যদি ও কোন বিপদে জড়িয়ে পড়ে? কিংবা এমনও তো হতে পারে, সে অসুখে পড়েছে। নইলে ও এখানে না এসে কিছুতেই থাকতে পারতো না। এ তার দৃঢ় বিশ্বাস।

মার্টিন এখন খাবে কী! খাওয়া তার মাথায় উঠেছে। সে তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে থাকে।

হঠাৎ মার্টিন ভাবে, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, হ্যারি তার সঙ্গে একটু রসিকতা করছে। অর্থাৎ হ্যারি তাকে বিপদে ফেলে একটু মজা করার ধান্ধায় আছে। অচেনা জায়গায় সে কেমন বিপদে পড়েছে, তা দেখে একটু আনন্দ পেতে চাইছে।

হ্যারি মার্টিনের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেও সে অসুখী হতো না। অবশ্য এর একটা সঙ্গত কারণ আছে, আর বন্ধু বান্ধবদের সাথে একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে না তো কার সঙ্গে করবে!

মার্টিনের স্কুলের কথা মনে পড়ে। সে আর হ্যারি একই স্কুলে পড়তো। আগে সে ওকে চিনতো না। সে যেচে ওর সঙ্গে আলাপ করতে যায়নি। বরং ওই যেচে এসে তার সঙ্গে আলাপ করেছে, তোমার নাম কি? মার্টিন কিছুটা অবাক হয়েছে, আমার নাম?

--হ্যাঁ, তোমার নাম। তুমি ছাড়া এখানে তো আর কেউ নেই।

এ কথা শুনে মার্টিন একটু লজ্জা পেয়ে গেল। আরপর সে বলেছিল,

আমার নাম বলতে পারি এক শর্তে।

শর্ত? হ্যারি অবাক না হয়ে পারে নি।

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা দোলাতে আরম্ভ করেছিল।

—তা শর্তটা কি? হ্যারি জানতে চেয়েছিল।

—তোমায় আমার খেলার সাথী হতে হবে।

—খেলার সাথী? তোমাকে?

—হুঁ, মার্টিন এক দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে ছিল।

—তা হওয়া হবে।

—হবে তো? মার্টিন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়।

—বললাম তো হবে, হ্যারি হেসেছে, আমার কথা তোমায় বিশ্বাস হচ্ছে না?

—না, তা নয়।

—তবে? হ্যারি প্রশ্ন না করে থাকতে পারেনি।

—তবু তুমি তিন সত্যি করে বলো।

—বললাম, এবার হলো না? না আরো দিব্যি কাটতে হবে?

—না, না, তার কোন দরকার নেই। ঠিক আছে।

—তা এবার আমার একটা কথায় জবাব দেবে?

—দেবো, নিশ্চয়ই দেবো, বলো তুমি কি জানতে চাও?

—তুমি আমায় অমন করে দিব্যি করিয়ে নিচ্ছিলে কেন?

—আসলে..... ,মার্টিন কথাটা শেষ করতে পারেনি।

—আসলে কী?

—আমার কোন বন্ধু নেই। আমি ভাব করতে চাই, কিন্তু সবাই আমায় এড়িয়ে চলে। তাই এমন করে চেষ্টা করছিলাম।

—ও, এই কথা।

—হ্যাঁ।

হ্যারি মার্টিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, আজ থেকে আমরা দু'জনে বন্ধু হোলাম। সব সময় এক সঙ্গে থাকবো। কখনো আলাদা হবো না। এর কথা যেন শপথের মতো শোনাচ্ছিল।

মার্টিনও খুশী হয়ে বলেছে, আমিও আমার কথা রাখবো কখনো খেলাপ করবো না।

—তা নয় হলো, কিন্তু তোমার নামটা এখনো আমায় বলোনি।

—আমার নাম রোল্ডো মার্টিন।

—কিন্তু আমি তোমার একটা নাম দিতে চাই।

—কি নাম?

—শুধু মার্টিন, তারপর হ্যারি মার্টিনের হাতে আলতো করে একটা

ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, তা মার্টিন বলে ডাকলে রাগ করবে নাতো ?

—রাগ করবো ? তোমার উপর ?

তবু আগে ভাগে কথাটা জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি। শেষে যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দাও।

—না; না, তোমার এসব ভাবার কোন কারণ নেই। তোমার ঐ নামেই আমি খুশী। তাছাড়া, আমার মাও কখনো আমায় 'রোলো', আবার কখনো মার্টিন বলে ডাকতো।

—যাক্ আমি নিশ্চিত হোলাম।

—তা আমার নামটা তো জেনে নিয়েছো, কিন্তু নিজের নামটাতো এখনো বলোনি।

—সত্যি ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে।

হ্যারির কথা বলার ধরণ দেখে মার্টিন হেসে ফেলেছিল, খুবই অন্যায় করেছো।

—তা কী শাস্তি হবে ?

—তা পরে ভেবে বলবো। আপাতত নামটা আগে বলতো, নইলে কিন্তু শাস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

—এ কাজটা করবেনা আমি এখুনি আমার নামটা বলছি। আমার নাম হ্যারি লাইম।

—এত বড় নাম কিন্তু আদৌ পছন্দ নয়, মার্টিন নবাবী চালে কথাটা বলেছিল।

—আমাকে তোমার যে নামে ডাকতে ইচ্ছে করবে আমায় তুমি সেই নামেই ডেকো। আমার কোন আপত্তি নেই।

—তোমার কথায় খুশী হোলাম।

—আমিও আনন্দিত হোলাম।

তারপর ওরা দু' বন্ধুতে নানা ব্যাপার নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেছে। যা দেখে অন্য ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল, কিন্তু সেদিকে ওদের আদৌও নজর ছিল না। আর মার্টিনের তো নয়ই, কারণ এ রকম একটা বন্ধুত্বের তার বড় অভাব ছিল। এতদিন সে এর জন্য বড় কষ্ট বোধ করেছে। স্কুলে যাবার মধ্যেও তেমন একটা বড় আনন্দ সে খুঁজে পেত না। তাই এক আধ দিন যে কামাই করেনি তাও নয়। সত্যি, আজ মার্টিন দারুণ খুশী। শুধু খুশী বললে ভুল হবে, তার এ মুহূর্তে আনন্দে যেন হাতে তালি দিয়ে নেচে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল।

মার্টিনের মনে পড়ে, এরপর তারা দু'জনে সর্বত্র একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। কখনো কাছ ছাড়া হতো না। সত্যি ছোটবেলাকার দিনগুলো বেশ ছিল। মনটা সরলতায় ভরে থাকতো। তখন যে ঝগড়াঝাটি হতো না তা নয়, তার

আবার ভাব হতে বেশী সময় লাগতো না, কারণ তখন স্বার্থ নিয়ে এত মাথা ঘামাতো না। সত্যি অতি সহজেই মনের বরফ গলে যেত।

মার্টিনের আর একদিনের কথা মনে পড়ে। তখন তারা কোন ক্লাসে পড়তো তা এখন ঠিক মনে করতে পারছে না। তবে এটা তার খেয়াল আছে, সেদিন ছিল একটা ছুটির দিন। সম্ভবত রোববার। তখন উঁচু'র দিকে কোন একটা ক্লাসে পড়তো। হঠাৎ হ্যারি মার্টিনের বাড়িতে ঢুকে ডাকতে থাকে, মার্টিন, ও মার্টিন।

যদিও হ্যারির অমন করে ডাকার কোন দরকার ছিল না, কারণ তাকে মার্টিনের বাড়ির সবাই চেনে। অর্থাৎ মার্টিনের বাড়িতে তার অবারিত দ্বার। তবু সে ডাকে।

মার্টিন যখন হ্যারির ডাক শুনে বেরুতে যাবে, ঠিক তখনই হ্যারি তার ঘরে হাজির। হ্যারিকে দেখে মার্টিন বলে, কি ব্যাপার ?

—কথা আছে।

—কি কথা ?

—শিকারে যাবে ?

যদিও শিকারের কথা শুনে মার্টিনের বুকে কম্পন জাগে, কারণ সে একটু ভীতু ধরনের ছেলে। তবু সে জানতে চায়, কোথায় ?

হ্যারি মার্টিনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে মিশছে। তাই সে আগে জানতে চায়, সে যেতে রাজী কি না। জিজ্ঞেস করে, আগে বলো যাবে কি না।

—মানে··· ··,মার্টিন আমতা আমতা করতে থাকে। তবু শিকারের কথা শুনে যে একবারে যেতে চাইছে না তাও নয়। কারণ গত সোমবার তাদের ক্লাসের রবার্ট তার বাবার সঙ্গে পিকনিকে গেছিল। সেই সঙ্গে তারা শিকারও করেছে। তিনটে বুনো মুরগী মেরেছে, আর সেই গল্প তার পরের দিন ক্লাসে এসে রবার্ট ফলাও করে সবাইকে বলেছে।

—আরে যাবে কি না তা স্পষ্ট করে বলো না ? হ্যারি মার্টিনকে জিজ্ঞেস করে। আর ভয়ের কি আছে। সঙ্গে তো আমি থাকছি। রাজী হয়ে যাও না!

—রাজী, মার্টিন সায় জানায়।

—থ্যাংক ইউ! হ্যারি বেজায় খুশী।

—কিন্তু শিকারে গেলে তো বন্দুক চাই।

—বন্দুক ? হ্যাঁ তা দরকার। তা আমার ভাবনা।

—বন্দুক তোমার আছে ?

—আছে, হ্যারি মাথা নাড়ে।

—আছে ? মার্টিন যেন হ্যারির কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। তার মনে যেন কেমন সন্দেহ হতে থাকে।

—হ্যাঁ মশাই, হ্যারি হেসে মাথা নাড়ে।

—তা কী শিকার করবে?

—যা পাবো তাই শিকার করবো।

—বাঘ ভাল্লুক যদি আসে?

—আসুক তাও শিকার করবো।

—ইস! মার্টিনের অবিশ্বাসী গলা।

—আরে ওসব ওখানে কিছুই নেই।

—নেই?

—না।

—তবে ও জঙ্গলে কি আছে?

—সাধারণত খরগোসই বেশী আছে।

—খরগোস? তা আমায় মারতে দেবে তো?

—নিশ্চই দেবো। শিকারে যাবে তা তোমায় মারতে দেবো না তা কখনো হয় নাকি!

তারপর মার্টিনের মনে আছে, সে একটাও খরগোস মারতে পারে নি। তার টিপই নেই। গুলিগুলো বেশ দূরে দিয়ে চলে গেছিল। মারতে পারেনি বলে তার আফসোস হয়েছিল ঠিকই, তবু সেদিনের আনন্দের কথা সে আজও ভুলতে পারেনি। তা তার মনের মণিকোঠরে অক্ষয় সম্পদ হয়ে চিরদিন থাকবে।

তবে একথাও ঠিক, হ্যারির যে হাত খুব ভালো ছিল তা নয়। সে কয়েকবার বিফল হলেও পরে স্থির নিশানায় বেশ কয়েকটা খরগোস মারতে পেরেছিল।

এরকম অনেক ব্যপারে মার্টিন ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও হ্যারি তাকে কখনো ত্যাগ করে অন্যকে নিতনা। এতে মার্টিন ভীষণ খুশী হতো। ফলে সেই বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট আছে, যা এই দীর্ঘ কুড়ীবছর পরেও ছেড়ে যায়নি।

কিন্তু এখন হ্যারি এখানে না আসায় মার্টিন সত্যি বিমর্ষ এবং একটু আগের অভিমানটা তার এখনও যায়নি। আসলে সে তাকে যতটা ভালবাসে, তার উপর আবার সামান্য কারণেই মনের মাঝে স্বযত্নে রাখা গোপন মনের অভিমানের পাল্লাটা ভারী হয়ে ওঠে। প্রকৃত ভালোবাসার এই তো ধর্ম। মার্টিন তার ব্যতিক্রম হয়ে নজীর সৃষ্টি করতে চায় না।

মার্টিনের পাশের ফাঁকা চেয়ারে একটা লোক বসতে তার চিন্তার ছেদ পড়ে। তবু কী ভাবনাগুলো সহজে যেতে চায়? যায় না। ওগুলো যে মধুর স্মৃতি, যা বুকের অতলে লুকিয়ে থাকে।

অন্য লোক আমাদের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার চাইতে, কিন্তু ছোট করে নিজেদের ভাবতে চাই না। এ পরিস্থিতিতে মার্টিনের তাই মনে হলো। তাকে আর কারুর দরকার নেই।

মার্টিন এখন বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ভারী আবহাওয়া।

আকাশে কালো কালো মেঘ চারদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একটু আগে হয়তো বৃষ্টি হয়ে গেছে। হলেও এখন তা বুঝবার কারণ নেই, কারণ রাস্তায় এখন গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে। সেই সঙ্গে হাড় কাঁপানো একটা ঠাণ্ডা বাতাস তার কান নাকের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে তাকে যেন চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

এই পাতলা বরফের গুঁড়োগুলো দেখে মার্টিনের মনে হয়, এত আস্তে পড়ছে যে চার পাশের ধ্বংসস্তুপগুলোর মধ্যে যেন চিরদিনই পড়ে থাকবে এবং সেগুলো পড়ে এমন একটা আকার নিচ্ছে, যা দেখে মনে হয়, যেন চিরদিনের বরফে ঢাকা একটা জায়গা। কোনদিন এর বরফ যেন গলবে না।

বাস থেকে নেমেও মার্টিন অপেক্ষা করলো যদি হ্যারির দেখা মেলে, কিন্তু কোথায় হ্যারি। অগত্যা তাকে হোটেলে যেতে হয়। হোটেলের নাম 'অ্যাস্টোরিয়া'। এখানে সে হ্যারির দেখা পেল না। তবু জিজ্ঞোসা করলো।

হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে মার্টিন গিয়ে দেখা করে নিজের পরিচয় দেয় তারপর বলে, হ্যারি এসেছে ?

ম্যানেজার মাথা নাড়ে, না।

—আমার জন্য কি কোন খবর রেখে গেছে।

—উহুঁ, ম্যানেজার মাথা দু'দিকে দোলায়।

—বড় অদ্ভূত ব্যাপার হলো।

—তবে ক্রাবিন এসেছিল।

—কে ক্রাবিন ?

—তা তো জানিনা। আপনি ওকে চেনেন না ?

—চেনাতো দূরের কথা। ও নাম আমি কোনদিন শুনিনি।

—ও আপনার নামে একটা ম্যাসেজ রেখে গেছে।

—ম্যাসেজ ? আমার নামে ? মার্টিন নিজেকে দেখায়।

—হ্যাঁ।

—আপনার কোনরকম ভুল হচ্ছে না তো ?

—না, না। এতে ভুল হবার কি আছে !

—ম্যাসেজটা আপনার কাছে আছে ?

—আছে, বলে ম্যানেজার ড্রয়ার খোলে। এই নিন।

—থ্যাংক ইউ ! মার্টিন ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানায়। এরপর সে পাতাটা খোলে। তাতে লেখা রয়েছে—আপনাকে আগামীকালের বিমানে আশা করছি। দয়া করে বর্তমানে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। আপনার জন্য হোটেলের ঘর বুক করা আছে। চিন্তার কিছু নেই।

কিন্তু রোলা মার্টিন এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকার লোক নয়। হঠাৎ তার মনে হলো, ওদিকের হোটেলের লাউঞ্জে বেশীক্ষণ বসে থাকলে, সে হয়তো

কোন ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে পারে। এরকম সে একটা আশংকা করে চলেছে।

মার্টিন ভাবে, কেউ তাকে মদ খাবার জন্য অহ্বাহন জানাতে পারে। তাছাড়া, সবচেয়ে বিপদজনক ঘটনায় মাথা গলাবার আগে রোলো মার্টিনকে বলতে শুনলাম, যা ঘটবার তা ঘটে গেছে, আর কিছুতে জড়াতে চাইনা।

রোলো মার্টিনের সব সময় মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। রোলো শব্দটা ডাচ শব্দ, কিন্তু 'মার্টিন' শব্দটা ক্রিশ্চিয়ান।

রোলো চলমান মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছিল। আবার কিন্তু মার্টিন মনে মনে তাদের পরিত্যাগ করছিল। এখন আমি ভাবছি, এদের মধ্যে পাশ্চাত্য গল্প লিখিয়ে কে ছিল ?

যাক্, মার্টিন হ্যারির ঠিকানা জানতো। ফলে তার ক্রাবিনের প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না। থাকার কারণও নয়। ও'তাকে চেনে না। তবে এ কথা ঠিক কোথাও একটা ভুল হয়েছে। যদিও সে ফ্রাংকফুর্টের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছে না।

মার্টিনের এ মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ে। তাতে সে খানিকটা আনন্দিত হয়। তবে মনটা তার ঠিক ভালো নেই।

মার্টিন হ্যারিকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের ওখানে গিয়ে কোথায় উঠবো ?

হ্যারি কথাটা শুনে অবাক হয়েছিল, কোথায় আবার উঠবে! আমার ফ্ল্যাটে।

তোমার ফ্লাটে আমার কোনো অসুবিধে নেই। তবে···। বলে সে কথাটা শেষ করতে পারেনি।

—তবে কি ?

—তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।

—অসুবেধে ? তোমার জন্য ?

—না যদি······।

—এ কথা তুমি ভাবতে পারলে ?

—এ কথা বলা আমার অন্যায় হয়েছে। আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

—ব্যস হয়েছে, আর বলতে হবে না।

হ্যারির এই ফ্ল্যাটটা ভিয়েনার এক প্রান্তে এবং বেশ বড়, তার ফ্ল্যাটটা সে একজন জার্মানীর কাছ থেকে নিয়েছিল। এবার মার্টিনের আর একটা কথা মনে পড়লো। সে এখন আর হ্যারির কথা ভাবতে চায় না। ভাবলে মনটা তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে এবং মাথাও ঠিক রাখতে পারছে না। রাগে তার সারা শরীর জ্বলছে। তবু সে নিজেকে সংযত করে। তবে শুধু তখন থেকে একটা কথাই ভেবে চলেছে, হ্যারি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলো কী করে ? সে তার বন্ধু। শুধু বন্ধু বললে ভুল হবে। অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই স্কুল থেকে পরিচয়, যা বিশ বছরেও চিড় ধরেনি। সেই হ্যারি কী না···। না, না,

সে আর এসব ভাবতে চায় না। ভাবতে না চাইলে কি হবে। মনের মধ্যে যে মনটা আছে, সে তো তাকে রেহাই দিচ্ছে না।

যাক্, মার্টিন পেঁছলে হ্যারি তার ভাড়া মিটিয়ে দেবে, এই ভেবে সে একটা ট্যাক্সি নিল এবং ট্যাক্সি করে ব্রিটিশ অঞ্চলের শেষ বাড়িটায় গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে সোজা চারতলায় উঠতে লাগলো।

ভিয়েনার মত নীরব শহরে একটা নতুন লোক কি করে এত তাড়াতাড়ি নীরবতা সম্বন্ধে সচেতন হলো তা কে জানে।

ওদিকে একতলা দু'তলা করে মার্টিন তে-তলায় পেঁছলো। পেঁছেই তার একটা কথ. মনে হলো, সে চারতলায় গিয়ে হ্যারির দেখা পাবে না। কেন জানি না তার মনে এ ধারণা এলো।

তবু মার্টিন চারতলায় পেঁছলো এবং ভেবেছে তাই হলো। এবার বুঝতে পারলো, কেন হ্যারি বিমান বন্দরে যায়নি।

চারতলায় গিয়ে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে মার্টিন দেখতে পায়, দরজার বড় হাতলে শোকের কালো চিহ্নের দিকে নজর গেলে, তখনই সে বুঝতে পারলো এ পৃথিবীতে আর কোথাও সে হ্যারিকে দেখতে পাবে না।

রান্নার লোক, অথবা হ্যারি ছাড়া অন্য কেউ মরতে পারে, কিন্তু কুড়িটা সিঁড়ি পার হবার আগেই মার্টিন বুঝতে পেরেছিল, হ্যারি আর নেই, সব শেষ।

মার্টিন সাথে সাথে বুকের মাঝে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। সে হ্যারিকে ভক্তি করতো। মানতো। স্কুলের রঙীন দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ে। ভাবে, কী সুন্দর সে দিনগুলো ছিল। এরপর সেই স্কুলের অকালের দিনগুলোর পর কুড়িটা বছর পার হয়ে গেলেও তাদের বন্ধুত্বের ভিড় ধরেনি।

ইতিমধ্যে প্রার্থনার ঘণ্টা বাজতে থাকে। এ রকম ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হ্যারির পাশের ফ্ল্যাটের দরজাটা সহসা খুলে যায়। সেখান থেকে একটি লোক বেরিয়ে এলো।

লোকটি মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি হ্যারির ফ্ল্যাটের বেল টিপছিলেন ?

—হ্যাঁ, মার্টিন সায় জানায়।

—বেল বাজিয়ে আর লাভ নেই।

—এ কথা বলছেন কেন। মার্টিন যেন কুকড়ে ওঠে।

—ও ফ্ল্যাটে কেউ নেই। হ্যারি মারা গেছে।

—হ্যারি নেই ? মারা গেছে ? মার্টিনের গলাটা যেন আর্তনাদের মত শোনায়। তার বুকে যেন শেল বেঁধে।

—না, হ্যারি লাইম নেই। একটা দুর্ঘটনায়…, লোকটি কথা শেষ করতে পারে না। কথার মাঝে সে থেমে যায়।

এ আপনি বলছেন কী। মার্টিনের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ভাবে,

যে তাকে এখানে আসতে বলেছে সে কী না নেই। এ কথা কী বিশ্বাসযোগ্য ? না এ কথা ভাবা যায় ?

পর মুহূর্তে মার্টিন আবার ভাবে, ঐ লোকটি নিশ্চয় তার সঙ্গে ঠাট্টা করবে না। তার সঙ্গে নিশ্চয় তার ঠাট্টা সম্পর্ক নয়। আর মৃত্যু নিয়ে এভাবে কেউ ঠাট্টাও করে না। তাহলে ? একটা অশুভ চিন্তা তাকে এ মুহূর্তে কুরে কুরে খেতে থাকে।

লোকটি বলে, বুঝতে পারছি, একথা আপনার মেনে নিতে অসুবিধে হচ্ছে। তবে এখন এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমি আপনাকে মিথ্যে বলছি না। আর মিথ্যে বলতেই বা যাবো কেন ! এর মধ্যে আমার কোন রকম স্বার্থ বা অন্য কিছু নেই।

—তা তো ঠিকই। মার্টিন আস্তে কথা বলে। তবু আপনার কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। তার চোখ অসম্ভব রকম জ্বালা করতে থাকে। এখনি বুঝি চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসবে।

—কিন্তু ঘটনাটা সত্যি।

—তবু ও ··, মার্টিনের অসহায় গলা।

—আমি আপনাকে কি করে বিশ্বাস করাই বলুন তো !

লোকটির কথাঃ বলার ভাব এমন তাতে মনে হয় সে যেন মহা ফাঁপড়ে পড়ে গেছে। অবশ্য সে বোঝে যে, এ মুহূর্তে অনেকেই প্রিয়জনের মৃত্যু সংবাদটা সহজে মেনে নিতে পারে না।

মার্টিন অস্বাভাবিক গলায় কথা বলে, আপনি এ কথা আমায় কিছুতেই বোঝাতে পারবেন না। ওর চোখ সজল হয়ে ওঠে।

—আচ্ছা। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

—না, না, মনে করার কি আছে ! মার্টিন নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছে। অথচ তার ভেতরটা ভেঙে মুচড়ে গুঁড়িয়ে যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মাথায় সহস্র বোলতা যেন তাকে দংশন করে চলেছে। সে তার নীরব সাক্ষী। তাকে চুপ করে থাকতে হচ্ছে। এ ছাড়া, এখন তো উপায় নেই। তবু খানিকটা কাঁদতে পারলে তার মনটা অন্তত কিছুটা হাল্কা হতো, কিন্তু এখন সে হু হু করে কাঁদতেও পারবে না। সে যে বড় হয়েছে। তাকে ওভাবে কাঁদতে দেখলে অন্যরা হকচকিয়ে যাবে।

মার্টিন ভাবে, মানুষের বয়স বাড়লে তারা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। মাপা কথা, চাপা হাসি। কত রকম ভাবে তাদের মেপে ঝেপে চলতে হয়।

লোকটি বলে, তাহলে কথাটা আপনাকে জিজ্ঞেস করি ?

—অ্যা ! মার্টিন একটু চমকে লোকটির দিকে তাকায়।

লোকটি সে কথার জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে বলে, কি ভাবছেন ? তারপর মার্টিনকে কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই তার উত্তর দেয়। নিশ্চই হ্যারি লাইমের কথা ভাবছেন। ভাবাই স্বাভাবিক। আরো যেখানে আপনি তার খোঁজে এসেছেন। সবই অদৃষ্ট আর কী।

লোকটি ফের বলে, যাক্, হ্যারি লাইম আপনার কে হয় ?

—ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, মার্টিনের বুক ভেঙে যেন কথাটা বেরিয়ে আসে। দীর্ঘ কুড়ি বছরের পরিচয়।

—কুড়ি বছর ?

—হ্যাঁ, মার্টিন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

—তাই আপনি আমার কথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আরো বিশেষ করে প্রিয়জনের ক্ষেত্রে তো বটেই। আপনার কথা ভেবে আমার দারুণ কষ্ট হচ্ছে। বলে, লোকটি মার্টিনের দিকে তাকায়।

—কষ্ট হচ্ছে ?

—হ্যাঁ।

এরপর একটা কথা মার্টিন বলবেনা বলবেনা করেও বলে ফেললো, আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না তো ? কথাটা বলেই ও এক দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ছে না। তার এ দৃষ্টি যেন এখন অন্তর্ভেদি। লোকটির ভেতরটা যেন ও দেখতে চাইছে।

—ঠাট্টা ? আমি করছি ? আপনার সঙ্গে ? লোকটি কিছুটা বিস্মিত। কথা বলার সময় তার গলা সামান্য চিড় খেয়ে যায়।

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ এ কথা ভাবার কারণ ? লোকটি এবার ঈষৎ রেগে যায়। তার কথার সুর বেসুরো ঠেকছে।

মার্টিন দেখতে বা বুঝতে চাইল না যে, লোকটি তার কথায় রাগ করেছে কি না। আর এসব বুঝবার মত তার এখন মানসিকতাও নেই। সে রাগে, যন্ত্রণায়, দুঃখে, হতাশায় কখনো বা কাতর কখনো বা অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

তাই মার্টিন বলে, একথা বলার যে একটা সঙ্গত কারণ নেই তা আমি বলতে পারবো না।

—সঙ্গত কারণ আছে ? লোকটি একটু ঝুঁকে মার্টিনের দিকে তাকায়। সেই সঙ্গে রাগেও ফুঁসছে।

—হ্যাঁ।

—তা কারণটা জানতে পারি কি ?

—অবশ্যই।

—কারণ অনেকে বিদেশী পেয়ে পরিহাস করতে চায়। আপনার কাছে

যেটা ঠাট্টার বিষয় আমার কাছে সেটা মৃত্যুর সমান হতে পারে। আমার এ কথাটা বুঝুন।

—আমি এসব তত্ত্বকথা বুঝি না।

—বোঝেন না?

—না।

—তাহলে আর কিছু বলার নেই।

—আপনি কি একজন বিদেশী?

—হ্যাঁ।

—কোত্থেকে আসছেন?

—আমি আজই ইংল্যান্ড থেকে এসেছি।

আপনি বিদেশী হলেও মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে কেউ কারুর সঙ্গে ঠাট্টা করে কি না তা আমার জানা নেই। তবে এ মুহূর্তে আমি করছি না। এটা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

—আপনি কি আমার কথায় রেগে গেছেন? মার্টিন একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছে।

—না, না, আমি রাগ করিনি। আমিও তো মানুষ। আপনার মানসিকতা আমি বুঝতে পারছি। এ সময় অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যখন আমার দাদা…। যাক্, সে সব কথা। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন।

মার্টিন এবার লোকটির কথা কী করে অবিশ্বাস করবে। নিজের কানেই তো সে সব কিছু শুনলো। এখন একথাগুলো অবিশ্বাস করা মানে সব কিছু অস্বীকার করা। তা করা যায় না। সমাজে বাস করতে গেলে এসব মেনে নিতে হয়।

মার্টিনের পা যেন টলছে। মাথা ঝিমঝিম করছে দেহে যেন আর শক্তি নেই। এছাড়া, পথের ক্লান্তিও যেন তাকে এ মুহূর্তে ভীষণ ভাবে পেয়ে বসেছে।

মার্টিনের সবচেয়ে বড় দুঃখ হলো, সে একটা বারের জন্য হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে পারলো না। একটু কথা বলতে পারলে তার বুকের বোঝা অন্তত কিছুটা হাল্কা হতো। এ সব ভোলবার নয়। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করবে।

মার্টিন চোখে এখন অন্ধকার দেখছে। এ রকম ভাবে হট করে একটা মৃত্যুসংবাদ শুনলে কেই বা মেনে নিতে পারে। অন্য কেউ পারে কি না সে জানে না। সে অন্তত পারে না।

তাছাড়া, মার্টিন একটু ভীতু সম্প্রদায়ের মানুষ। সে যদি জানতো, হ্যারির অসুখ করেছে এবং অসুস্থ অবস্থাতেই মারা গেছে, তাহলে সে কষ্ট পেত ঠিকই,

কিন্তু এতটা পেত না। তাতে অন্তত কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ থাকতো। এ যেন একবারে বিনা মেঘে বজ্রপাত। তার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে।

মার্টিন এবার লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, আমায় একটু বসতে দিতে পারেন? আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

—আপনি এ বেঞ্চিটায় বসুন।

—ধন্যবাদ।

বসতে পেয়ে মার্টিন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে এখন খানিকটা সুস্থবোধ করছে। তবে মাথার সেই যন্ত্রণা এখনো তার রয়ে গেছে।

হঠাৎ মার্টিনের মনে পড়ে, তখন হ্যারি আর সে ক্লাস নাইনে পড়ছে। দু'জন শিকারে গেছে। বলাই বাহুল্য সে হ্যারির সঙ্গী মাত্র। হ্যারিই তার বন্দুক দিয়ে অনেকগুলো খরগোস মেরেছিল।

তা দেখে মার্টিন হেসে বলেছিল, হ্যারি তোমার বন্দুকের হাত তো দারুণ! অব্যর্থ লক্ষ্য। শিকার ফসকায় না বললেই চলে।

—তোমার হাতটাও কিন্তু মন্দ নয়।

—আবার টিপ?

—হ্যাঁ।

—তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই।

—একটা খরগোস মারোনি?

—সে তো তিনবারের পর।

—আস্তে আস্তে হবে।

—যার হয় না নয়তে, তার নব্বোয়েতেও হয় না।

—হাঃ, কথাটা কিন্তু দারুণ বলেছো!

মার্টিন এতে খুশী না হয়ে বলে। আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি? হ্যারি জানতে চেয়েছিল।

—তুমি বড় হয়ে একজন ইঞ্জিনীয়ার হবে।

—ইঞ্জিনীয়ার? হ্যারি হাসতে শুরু করে দিয়েছিল। আমি?

—হ্যাঁ তুমি, নয়তো ডাক্তার হবে।

তারপর হাসি থামিয়ে হ্যারি জিজ্ঞেস করেছে, হঠাৎ আমার সম্বন্ধে তোমার এ সব ধারণা হবার কারণ কি?

—কারণ না থাকলে কথাগুলো কী আমি এমনি বলছি!

—সেই কারণটাই তো আমি জানতে চাইছি।

—যার হাত এত ভালো সে ওসব কিছু একটা না হয়ে কিছুতেই যায় না।

—কিন্তু বন্ধু, একটা কথা ভুলে যেওনা।

—কি কথা?

—তার জন্য পড়াশুনায় খুব ভালো হওয়া দরকার।

—তুমি পড়াশুনোয় এমন তো কিছু খারাপ নও।

—দেখো, তুমি তো ভালো বলতে পারলে না! সত্যি কথা এ ভাবে হট করে মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। ওর ধর্মও যে তাই, আর তুমি আমার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক ভালো।

—তা হয়তো অস্বীকার করছি না। তবু তুমি পড়াশুনায় যা আছো, তাতেই হবে। প্রয়োজন হলো তীক্ষ্ন বুদ্ধি। সে দিক দিয়ে তুমি বরাবরই আমায় টেক্কা দিচ্ছো।

—কিন্তু আমার ভাগ্যে ওসব হয়তো কিছুই হবে না।

—দেখো ঠিক হবে।

—কিন্তু……।

—কিন্তু কি?

—মনে হচ্ছে, আমার অপঘাতে মৃত্যু হবে।

—অপঘাতে মৃত্যু? তোমার?

—হ্যাঁ।

—হঠাৎ একথা কেন বলছো?

—জানি না। হঠাৎই মনে হলো তাই বললাম।

—ওসব অলুক্ষণে কথা আর কখনোই হবে না। এসব কথা তোমার মনে হলোই বা কেন?

—মন তো সব সময় নিজের দখলে থাকে না। তাই ও কখন কি ভাবে তা কি করে তোমায় বলবো।

—তবুও আমার সামনে অন্তত এসব কথা বলবে না।

—তাই হবে।

—মনে থাকবে তো?

থাকবে। অন্তত কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করবো। মার্টিন ভাবে, শেষে হ্যারির কথাই কি না সত্যি হলো? ও সত্যিই দুর্ঘটনায় মারা গেল। ওর কথা এমন করে কি করে বললো? ওকি ওর মৃত্যুর পরোয়ানা আগে ভাগে পেয়েছিল?

মার্টিনের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। যেদিন হ্যারির ও কথা শুনে ওর মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিল, আর আজ কিনা সেই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। সত্যি, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

মার্টিন ভাবে, তার এখন একটু মদ পেলে ভালো হতো। অন্তত তাহলে এ সবের হাত থেকে কিছু সময়ের জন্য সে ভুলে থাকতে পারতো, কিন্তু অচেনা একজন লোকের কাছে সে কী করেই বা মদের কথা বলে! না, তা চাওয়া যায় না। তাহলে সে তাকে নির্লজ্য ভাববে, আর তার কপাল মন্দ। সে যে একটু মদ খাবে তারও উপায় নেই। তার পকেট একেবারে খালি।

একটা পয়সাও নেই। ভগবান সব দিক দিয়ে যেন তার পিছনে লেগেছে।

—মিঃ… ।

মার্টিন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লোকটার দিকে তাকায়, অ্যা! আমায় কিছু আপনি বললেন ?

—বলছি, কি ভাবছেন ?

—কি আর ভাববো! মার্টিন হতাশয় ভেঙে পড়ে। সব শেষ। তাই আজ আর ভাববার কিছু নেই।

মার্টিন আমায় পরে বলেছিল, প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। আমি জানতে চাই, কবে এ ঘটনাটা ঘটলো ?

—বৃহস্পতিবার।

—কেমন করে ?

—গাড়ি চাপা পড়ে, এই বলে মার্টিনকে আরো জানাই। আজ সন্ধ্যে-বেলা হ্যারিকে কবর দেওয়া হয়েছে। একটু আগে এলে তাদের আপনি দেখতে পেতেন।

—তাদের মানে ?

—মানে হ্যারির বন্ধু-বান্ধবদের কথা বলছি।

—হ্যারিকে কি হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল ?

—না, তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ ছিল না।

—কেন ?

—কারণ সে তার নিজের ফ্ল্যাটের কাছেই মুহূর্তের মধ্যে মারা গেছিল। তার কাঁধে জীপ গাড়ির মাডগার্ডের প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। তাতে সে খরগোসের মত রাস্তার মাঝে ছিটকে পড়েছিল এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়।

'খরগোস' শব্দটা লোকটি ব্যবহার করতে মার্টিন ভাবে, হ্যারি সহসা যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মার্টিনের মনে পড়ে, হ্যারি ছোটবেলায় বন্দুক দিয়ে খরগোসকে গুলি করতো। তখন খরগোস আহত অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চেষ্টা করতো। সেই বন্দুকটা একবার হ্যারি তাকে দেখিয়েছিল।

মার্টিন এবার অপরিচিত লোকটির কাছে জানতে চায়, হ্যারিকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে ?

—কেন্দ্রীয় কবরস্থানে, লোকটি বলে। কিন্তু বরফের মধ্যে তাকে কবর দিতে খুব অসুবিধে হয়েছে।

—ঠিক আছে, চলি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! বলে মার্টিন সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামতে থাকে।

ওদিকে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির ভাড়া মার্টিনের পক্ষে মেটানো

সম্ভব নয়। সে ফের ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন্দ্রীয় কবরস্থান চেনেন ?

—চিনি, ট্যাক্সি ড্রাইভার সায় জানায়।

—ওখানে চলুন।

কথাটা কোন রকমে মার্টিন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে দেহের ভার পিছনের গদীতে ছেড়ে দেয়। সে যেন আর পারছে না। এবং ট্যাক্সির ভাড়া সে কি করে মেটাবে তাও সে জানেনা। এ কথা এখন সে আর ভাবতে চাইছে না। সে হ্যারি লাইমের শেষটুকু দেখতে চললো। তার কপালে শেষে এই ছিল !

মার্টিন কিছু ভাবতে না চাইলে কি হবে ! তার পকেটে মাত্র পাঁচটা মুদ্রা পড়ে রয়েছে। যা না থাকার সামিল। সে আদৌ বুঝতে পারছিল না ইংল্যান্ড শহরের পাঁচটা মুদ্রা নিয়ে ভিয়েনার কোথাই সে থাকবে ! সত্যি, একটা সমস্যার কথা।

মার্টিন ট্যাক্সিকে ভাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় কবর খানায় হাজির হয়। রাশিয়ার অঞ্চল দিয়ে ঢুকে খুব তাড়াতাড়ি আমেরিকার এলাকার মধ্যে যাওয়া যায়। অবশ্য এসব সে পরে জেনেছিল। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে আইস্ক্রিমের দোকানগুলো দেখে তার আমেরিকার অঞ্চল বলে চিনতে কোনই অসুবিধে হয়নি। বাইরের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে।

কবরখানার চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। সেই পাঁচিলের পাশ দিয়ে ট্রাম রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার অন্যদিকে প্রায় এক মাইল জুড়ে বড় বড় বাড়ি এবং বাজার রয়েছে। আর সেখান থেকে কবর খানার জন্যও ফুল কেনা যায়।

মার্টিনের এই বিরাট কবরখানার আয়তন সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, আর এখানেই কিনা হ্যারির সঙ্গে তার শেষ মিলন হবে।

এখানে পা দিয়েই যেন মার্টিনের মনে হলো, হ্যারির তারবার্তা এখানে রাখা আছে। তাতে যেন লেখা আছে—হাইড পার্কে আমার সঙ্গে দেখা করো। তারপর সে কবরখানায় প্রবেশ করে আধমাইলটাক উত্তরে এগিয়ে দক্ষিণে বাঁক নিল।

এত বরফ পড়েছে তাতে চার পাশে দাঁড় করানো মূর্তিগুলো দেখতে অদ্ভূত লাগছিল এবং এই কবরখানাও চারটে বৃহৎ শক্তির মধ্যে ভাগ করা। রাশিয়ার অঞ্চলটা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত মূর্তিগুলোকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল। ফ্রান্সের অঞ্চলটা কাঠের ক্রুশ ও ছেঁড়া তেরঙা পতাকা দ্বারা চিহ্নিত।

মার্টিনের মনে পড়ে, হ্যারি একজন ক্যাথলিক। সুতরাং ব্রিটিশ অঞ্চলে তাকে কবর দেওয়া যাবে না। ফলে শবধারী লোকগুলো বনের আরো গভীরে চললো। সেখানের কবরগুলো গাছের তলায় যেন হাঁ করে বাঘের মত তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ গাছের তলা দিয়ে তিনজনের একটা দল বেরিয়ে এলো। তাদের পরনে

যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সাজ পোশাক। তারা কবরের মধ্যে যীশুরে উদ্দেশ্যে ক্রুশ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তারা হঠাৎ যেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জায়গা দেখতে গেল। বিরাট পার্কের একটা ছোট জায়গার বরফ পরিষ্কার করা হয়েছে। তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে একটা ছোট দল। একজন পুরোহিত কি যেন বিড় বিড় করে বলে চলেছে, আর তার কথাগুলো যেন পাতলা বরফের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

আর সেই সময় একটা কফিন গর্তে নামানো হলো। স্যুট পরা দু'জন লোক কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজনের হাতে ফুলের মালা। তা থাকা সত্ত্বেও সে কবরে দিতে ভুলে গেল। তা দেখে তার সঙ্গী তাকে কুনুই দিয়ে ঠেলা মেরে সচেতন করে দেয়। তাতে সে হকচকিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি মালাটা নিচে ফেলে দেয়।

আর ঠিক তখনই নজরে এলো, একটি মেয়ে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত চোখে দেওয়া। হয়তো সে নীরবে কেঁদে চলেছে। নইলে চোখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন!

আমি প্রায় কুড়ি গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশেই অন্য একটা কবর এবং ওখান থেকে নজর করছি, হ্যারির শেষ কৃত্যটুকু নজর করছিলাম, ওখানে কারা এসেছে।

মার্টিন চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। আমার গায়ে বর্ষাতি চাপানো। ও আমায় সম্পূর্ণ একজন অপরিচিত লোক বলে ভাবলো। সেটা ভাবাই স্বাভাবিক।

ও আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো। যাকে কবর দেওয়া হলো তাকে আপনি কি চেনেন?

আমি মাথা নাড়ি, হ্যাঁ।

—ওর নাম কি?

—ওর নাম হ্যারি লাইম।

ওর নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। বুঝতে পারি, ও খুব ব্যাথা পেয়েছে। অথচ প্রথমে ওকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে, ও সহজে ভেঙে পড়ার মত লোক নয়। তবে এখানে একটা কথা বললে হয়তো অনুচিত হবে, তবু আমি বলছি। হ্যারির মত মানুষের জন্য সত্যিকারের শোক করার মত কোন লোক থাকতে পারে বলে আমি জানতাম না।

শেষ পর্যন্ত মার্টিন আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, আপনি হ্যারির কে হন?

ও জানায়, আমি হ্যারির বন্ধু।

—বন্ধু ? অনেকদিনের আলাপ ?

—হ্যাঁ। সেই স্কুল থেকে আমাদের আলাপ, তারপর মার্টিন বলে এরা কারা।

—এরা হ্যারির বন্ধু। আপনি এদের সঙ্গে পরিচিত হতে চান ?

—না থাক্। এ সময় ওদের বিব্রত করতে চাই না। এ কথা বলে ও হয়তো ভাবলো। হ্যারির জীবনের আগের কুড়ি বছরের দাবীদার একমাত্র তাকেই বলা যায়।

তারপর কবর দেওয়া হয়ে যেতে সে বড় বড় পা ফেলে যে ট্যাক্সি করে এসেছিল। সেই ট্যাক্সির দিকে সে এগিয়ে যায়। সে কারুর সঙ্গে বিন্দুমাত্র কথা বলার চেষ্টা করেনি এবং তার চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যি, সে বড় আঘাত পেয়েছে। তার কষ্ট হবে বই কী !

একটা কথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে, কোন লোকের উপর কোন ফাইল লেখা কখনো শেষ করা যায় না, আর সত্যি বলতে কি, সকলে মারা গেলেও একশো বছর পরে ফাইলটা বন্ধ করা যায় না। সুতরাং আমি মার্টিনকে অনুসরণ করলাম, কারণ আমি অন্য তিনজনকে চিনতাম। তাই আমি নতুন জনের পরিচয় ভালোভাবে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠলাম।

আমি একটু তাড়াতাড়ি মার্টিনের কাছে গিয়ে বললাম, আমি সঙ্গে গাড়ি আনিনি। আপনি কি আমায় দয়া করে একটু শহরে পৌঁছে দেবেন ? তাহলে ভালো হয়।

—নিশ্চয় মার্টিন জোর দিয়ে বলে।

তবে একটা কথা বেশ ভালো করেই জানতাম যে, আমি মার্টিনের সঙ্গে গেলেও আমার জীপ ড্রাইভার আমাকে ঠিক অনুসরণ করবে। আসলে এ ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মাঝে একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে আছে।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। মার্টিন একবারও পিছন ফিরে তাকালো না। শেষবার তাকানো বা শেষবারের মত হাত নাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তো কৃত্তিমতায় ভরা, অন্তত আমার তাই মনে হয়। আমার এ ধারণাটা ভুলও হতে পারে।

হঠাৎ মার্টিন আমার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম কি তা জানতে পারি কি ?

—আমার নাম ক্যালোয়ে। এবার আপনার নামটা যদি দয়া করে বলেন।

—আমার নাম রোলো মার্টিন।

—আপনি তো হ্যারি লাইমের বন্ধু বলেছিলেন, তাইনা ?

—হ্যাঁ।

—অথচ গত সপ্তাহে এ কথা স্বীকার করতে বেশির ভাগ লোকই দ্বিধান্বিত হতো।

কেন বলুন তো ?

—সে কথায় আমি পরে আসছি। আচ্ছা আপনি কি এখানে অনেকক্ষণ আগে এসেছেন ? আমি জানতে চাই।

—আমি আজ বিকেলে ইংলণ্ড থেকে এখানে এসেছি।

—ও, আমি হতাশার ভঙ্গিতে মার্টিনের দিকে তাকাই।

—হ্যারি আমায় এখানে থাকার আহ্বান জানিয়েছিল।

—হ্যারি ? সত্যি, এটা একটা দুঃখের ব্যাপার।

—কিন্তু আমি তার দেখা পাইনি।

—এতে বোধ হয় আপনি অনেকটা দুঃখ পেলেন ?

—হ্যা।. ভীষণ।

তারপর মার্টিন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমায় একটু মদ খাওয়াতে পারেন। মদ খাওয়া আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কিন্ত আমার কাছে কোন টাকা নেই। শুধু পাঁচ পাউণ্ড ব্রিটেনের মুদ্রা রয়েছে। এ মুহূর্তে একটু মদ পেলে আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

—নিশ্চয়ই, বলে একটু ভেবে ড্রাইভারকে 'স্ত্রাসের' একটা ছোট পানশালার কথা বললাম। আমার মনে হয়েছে, অন্যান্য পানশালার ভীড়ও হয়তো পছন্দ করবে না।

'স্ত্রাসের' এই পানশালার পানীয় মূল্য অনেক। ফলে খুব কম লোকই এখানে আসে। যারা আসে তারা বনেদী।

বারে ঢুকতে দরজার গায়ে লেখা আছে দেখলাম, বার সন্ধ্যে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। তা সত্ত্বেও লোক যে কোন সময় ঢুকে সেখানে মদ খেতে যেতে পারে !

বারে এখন তেমন ভীড় নেই। ফলে আমরা একটা ছোট কেবিনে জায়গা পেয়ে যাই। আমাদের পাশের কেবিনে এক দম্পতি বসে মদ খাচ্ছে। এ ছাড়া, আর কাউকে চোখে পড়লো না। আমার পরিচিত বেয়ারা আমায় দেখে অভিবাদন করে কিছু স্যাণ্ডউইচ এবং মদের পাত্র রেখে চলে যায়।

মার্টিন প্রথম পেগ শেষ করলো। দ্বিতীয় পেগ খেয়ে সে বললো, হ্যারি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল। আজ বড় আঘাত পেলাম। এ দুঃখ সহজে ভুলতে পারবো না।

আমি এ কথার কোন জবাব দিলাম না। ভাবে এ মুহূর্তে মার্টিন সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু কথা দরকার। তাই পাক খোঁচা দিয়ে নিজে স্বার্থে বললাম, এ যে কোন সস্তা দরের উপন্যাসের ডায়লগ আওয়ালেন।

—সস্তা দরের উপন্যাসের ডায়লগ ? ঠিকই বলেছেন।

—করণটা জানতে পারি কি !

—আমি যে তাই লিখি।

যদি এ ভাবে খোঁচা দিয়ে কিছু জানতাম, কিন্তু তিন পেগের পর আমার মনে হলো, ও খুব কমই কথা বলে।

আম বলি, এবার আমি আপনাকে একটাকে অনুরোধ করবো।

—বলুন কি জানতে চান।

—এবার আপনাকে নিজের সম্বন্ধে এবং হ্যারির ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলতে অননুরোধ করবো।

এ কথার উত্তর না দিয়ে মার্টিন বললো, আমি আরো মদ চাই। আমি হ্যারিকে ভুলতে পারছিনা। তারপর সে বলে আমি একজন অপরিচিত লোককে বেশী বিরক্ত করতে চাই না। দু'এক পাউণ্ড ব্রিটিশ মুদ্রা অস্ট্রিয়ান টাকায় ভাঙিয়ে দেবেন ?

—ও নিয়ে আদৌ চিন্তা করবেন না, বলে আমি হাত ইশারা বলে বেয়ারা ডাকি। আমি লণ্ডনে ছুটি কাটাতে গেলে আমায় আপনি এ ভাবেই শোধ করে দেবেন।

এরপর আমি সহসা কাজের কথায় আসি। আমি মার্টিনকে জিজ্ঞেস করি ; হ্যারির সঙ্গে কখন আপনার প্রথম পরিচয় হয় ?

হট করে এ কথার উত্তর না দিয়ে মার্টিন মদের গ্লাসটা নানান দিকে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। তারপর গ্লাসের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যারিকে আমি যতটা জানি, ততটা আর কেউ জানে না। জানা সম্ভব নয়। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—কতদিন ধরে হবে ?

—দীর্ঘ কুড়ি বছরের কমতো নয়ই। আমরা স্কুলে এক সঙ্গে পড়তাম। সে জায়গাটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। যেন চোখের সামনে ভাসছে। স্কুলের সেই নোটিশ বোর্ড, ঘণ্টা, যা আজও আমি ভুলতে পারিনি। বলতেই বলে স্কুলেই স্মৃতি। সহজে ভোলা যায় না, কারণ স্কুলের দিনগুলোই তো বড় মধুর। দায়দায়িত্বহীন সময়।

একটু থেমে মার্টিন আবার বলে, তবে একথা ঠিক, হ্যারি আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিল। তবে ওর মত বুদ্ধিবান আমি আর কাউকে দেখিনি এবং ওর এই বুদ্ধির জন্য আমি অনেক ঝামেলা থেকে এড়িয়েছি। এর জন্য ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ; এটা অন্তত আমি মনে প্রাণে উপলব্ধি করি। না করলে অন্যায় হবে।

মার্টিন একটু আগের মতন আবার গ্লাস ঘোরাতে থাকে। এভাবে কিছুটা সময় দেখার পর বললো, তার মত লোক আমি আর দেখিনি। হ্যারি হ্যারিই। ওর তুলনা ও নিজেই।

—আচ্ছা, ও কি পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল ?

—না, তা ঠিক নয়। তবে তার বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। আমি ইংরেজী এবং ইতিহাসে অনেক ভালো ছিলাম। তবু তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে আমায় অনেকবার নাজেহাল হতে হয়েছিল। মার্টিন মাথা নাড়ে।

—আর সে?

—ও নিখুঁতভাবে বেরিয়ে আসতে পারতো। এটা ওর একটা বাড়তি গুণ ছিল। ছিল উপস্থিত বুদ্ধিও, সেটা অনেকেরই থাকে না। ফলে অন্যদের চেয়ে একে আমি আলাদা চোখে দেখতাম এবং ওর জন্যে গর্বও বোধ করতাম। কারণ আমি যে ওর বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মার্টিন কথা শেষ করে একটু সময়ের জন্য থামে। তারপর সে হো হো করে সহসা হেসে উঠে। তাতে আমি ভাবলাম, হ্যারির শোকটা হয়তো সাময়িক-ভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

এরপর মার্টিন রসিকতা করে বলে ওঠে, আমি কিন্তু সব সময়ই ধরা পড়ে যেতাম। কারণ ওর তুলনায় আমি সেরকম চালাক চতুর ছিলাম না। বোকাই বলা চলে।

আমি এর সঙ্গে যোগ করি, এতে হ্যারির সুবিধে ছিল।

—এতে হ্যারির সুবিধে ছিল?

—হ্যাঁ।

—কী সব আজে বাজে বকছেন! মার্টিন রেগে যায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে কথা বলে। পাশের কেবিনের দম্পতি কথা বলছিল। তাদের কথা থেমে যায়।

—কিন্তু আমার তো তাই মনে হয়, আমি বলি।

—আপনার তো অনেক কিছুই মনে হতে পারে! তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। এরকমে আপনি অনেক কিছুই বলতে পারেন।

প্রতিবাদ জানিয়েও মার্টিন ক্ষান্ত হয় না। ফের বলে, দোষ আমারই থাকতো। অথচ ইচ্ছে করলে সে আমার চেয়ে চালাক কাউকে সঙ্গে নিতে পারতো, কিন্তু সে কখনো তা করতো না। কারণ ও যে আমায় বড় ভালো-বাসতো। আমার সমস্ত অপরাধ ও ক্ষমার চোখে দেখতো। ওর মতন মানুষ হয় না।

এ কথা শুনে আমি মনে মনে ভাবলাম, আমিও হ্যারিকে ঠিক এমনিই দেখেছি।

তারপর আমি অন্য কথায় এলাম। আমি মার্টিনের কাছে জানতে চাই, আপনি হ্যারিকে শেষ বারের মত কবে দেখেছেন?

—কবে দেখেছি? মার্টিন ভাবতে আরম্ভ করে। দাঁড়ান, একটু ভেবে বলছি। ও চোখ বন্ধ করে।

একটু ভেবে মার্টিন আবার বলতে আরম্ভ করে, চিকিৎসকদের সম্মেলনে যোগ দিতে সে দু'মাস আগে ওখানে এসেছিল। আপনার হয়তো জানা আছে।

সে একজন চিকিৎসক ছিল, কিন্তু একটা কথা শুনলে অবাক না হয়ে কিছুতেই পারবেন না যে, সে কখনো প্রাকটিস করতো না।

—প্রাকটিস করতো না ?

—না।

—আবার বলছেন চিকিৎসক ছিল।

—তা তো ছিলই। এটাই তো ওর মজার ব্যাপার।

—এর কোন কারণ ছিল ?

—তা ছিল বইকী! কোনো জিনিস একবার জানা হয়ে গেলে সে ব্যাপারে সে একবাবে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো। কোনো উৎসাহ দেখাতো না। কেমন যেন একটা নির্লিপ্তভাব।

—কেন বলুন তো ?

—ওটাই ছিল ওর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

—বড় অদ্ভূত ধরনের মানুষ তো।

—তবে সে প্রায়ই বলতো যে, ডাক্তারিটা মাঝে মাঝে কাজে লাগে। ওটার দৌলতে কিছু করা যায়। তা শুনে আমার মনে হতো, ওর কথাগুলো ঠিক।

আমি মার্টিনের কথা শুনে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে ওর কাছে প্রশ্ন করছি। জেনে নিচ্ছি।

মার্টিন আমায় আরো জানায়, হ্যারির রসিকতাবোধ আমায় মুগ্ধ করতো। ও সত্যিকারের একজন রসিক মানুষ ছিল। সে ইচ্ছে করলে এই লাইনে লোককে হাসিয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করতে পারতো। অবশ্য এটা আমার ধারণা।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

সহসা মার্টিন কথা শেষ করে শিস দিয়ে একটা গানের সুর ভাজতে সুরটা আমার খুব পরিচিত লাগে।

তারপর শিস থামিয়ে মার্টিন বলে, এ সুরটা আমি কখনো ভুলবো না। তাকে একটু বিমর্ষ দেখাতে থাকে।

—কেন বলুন তো ?

—এটা হ্যারি সব সময় গুণ গুণ করতো, কিন্তু আমি আদৌ ভাবতে পারছি না, ও-ওভাবে মরলো কী করে! তার মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

আমি বললাম, এভাবেই মরাটা তার পক্ষে ভালো হয়েছে।

—সবচেয়ে ভালো হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—তার মানে কোন কষ্ট পায়নি ?

—সে দিক দিয়ে তার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

আমার মনে হয় মার্টিনের বেশ নেশা হয়েছে। আস্তে আস্তে সে মাথা নাড়াচ্ছে। চোখটা মাঝে মাঝে খুলছে বন্ধ করছে।

এরপর আমার গলার আওয়াজে মার্টিন সচকিত হলো এবং তারপর সে বিপদজনকভাবে আস্তে আস্তে বললো, আপনি তার সম্বন্ধে কি জানতে চাইছেন ?

—কিছুই না।

দেখলাম এ কথাটা বলার ফাঁকে তার ডান হাতটা মুঠিবন্ধ হয়ে এসেছে। বলি, সব অবস্থায় গায়ের জোর দেখিয়ে লাভ নেই।

এর পর মার্টিনের হাতের আওতার বাইরে চেয়রটা সরিয়ে নিয়ে বললাম, হেড কোয়াটার থেকে ওর তদন্তের ভার আমি শেষ করেছি। বলে আমি ওর দিকে তাকাই। ওর প্রতিক্রিয়া ভালোভাবে লক্ষ্য করতে থাকি। ওর হাতটা এখনো মুঠিবন্ধ।

—কী শেষ করেছন ? মার্টিন ঈষৎ চেচিয়ে কথা বলে। ওর মতন মানুষ হয় না। ও যে আমার হ্যারি।

—তা হতে পারে। আমি অনেক কিছু জেনেছি।

—কী জেনেছেন ?

—ওর এই দুর্ঘটনা না ঘটলে ওকে জেলে পচে মরতে হতো।

—জেলে ? তাও আবার পচে ?

—আপনি কি অত বাজে বকছেন !

—আজে বাজে সয় ঠিকই বলছি।

—ঠিকই বলছেন ? মার্টিন একটু ঝুঁকে আমার দিকে তাকায়। তা কারণটা দয়া করে বলবেন কী ?

সে এই শহরের খুব বাজে ধরনের লোক ছিল।

—বাজে ধরণের লোক ? হ্যারি ?

—হ্যাঁ।

—আপনার মাথা ঠিক আছে তো ?

—আছে বলেই তো জানি।

—তবু একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেবেন।

—উপদেশের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ !

—ঠাট্টা করছেন ? মার্টিনের টনটনে জ্ঞান। মদ খেলেও সে মাতাল হয়নি। তবু এ মুহূর্তে সে মাতাল হতে চায়। হ্যারির মৃত্যুটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

—ঠাট্টা ? আপনাকে ? আমি ?

—আমার তো মনে হচ্ছে। নইলে ও কথা আপনি বললেন কী করে ? মার্টিনের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

—না, না। তাছাড়া, আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করতে যাবো কেন! আপনার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক!

—নেই বলেই তো জানতাম।

হঠাৎ আমার নজরে এলো মার্টিনের দৃষ্টি আক্রমণাত্মক। তাকে ঠিক আমার স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। ফলে ওর ব্যাপারে একটু সচকিত হয়ে উঠলাম। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও একটু কাতাল হয়ে উঠেছে। ও আমার কিছু করতে পারবে না। বড়জোর পানশালার পরিবেশটা একটু অন্যরকম করে তুলবে, সেটাই যা একটু লজ্জার ব্যাপার হবে। তবে ম্যানেজার থেকে শুরু করে অনেক বয়ই আমায় চেনে। ওরা এটা ক্ষমার চোখে দেখবে।

—মার্টিন জানতে চাইলো, আপনি কি পুলিশের লোক?

—হ্যাঁ। আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

—আমি তাদের বরাবর ঘেন্না করি।

—ঘেন্না করেন? আমার চোখ কিছুটা কুঁচকে যায়।

—হ্যাঁ, মার্টিনের স্পষ্ট জবাব।

—এর কারণটা আমি জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই। তারা অত্যাচারি।

—দরকারে তা হতে হয় বই কী!

—অদরকারেও হয়, মার্টিনের পাল্টা জবাব।

—এটা একটা বাজে অভিযোগ।

—বাজে মোটেই নয়, মার্টিনের ধারালো গলা। আর অভিযোগ করলে আপনারা কান দেন। পুলিশ বলে কথা।

—আপনার এ কথাও জানতে পারছি না।

মানা নামানা এটা আপনার ব্যাপার, আর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনারা এক একটা বোকার ডিম।

—বোকা? হঠাৎ এ ধরণের মন্তব্যের কারণ?

—অনেক—অনেক কারণ আছে।

—যেমন!

আপনি এ ধরণের বই লেখেন? আমি মার্টিনকে খোঁচা দিয়ে কথা বলি। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার নজরে এলো, মার্টিন চেয়ার দিয়ে আমার বেরুবার পথ আগলাতে চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে তার মুখেও একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ বেয়ারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতে সে বুঝতে পারে এখন আমার কি ধরনের সাহায্যের প্রয়োজন। ভাবি, একই পানশালায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার যাওয়ার এই একটা মস্ত সুবিধে, যা অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না।

বেয়ারা এগিয়ে আসতে মার্টিন নিজেকে গুটিয়ে এবং মুখে কৃত্রিম হাসির

রেখা ফুটিয়ে বললো, আমার বইতে জমিদারের চরিত্র ঠিক এরকম হয়ে থাকে।

আমি এ কথার কোন রকম জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আসি। বলি, আপনি কি আমেরিকায় ছিলেন ?

—না ! মার্টিনের রাগ যায়নি। সে চেঁচিয়ে কথা বলে। এটাও কী একটা পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ।

—উহুঁ শুধু কৌতূহল নিবারণের জন্য। আমি হেসে বলি।

—কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, আপনি আমায় হ্যারির সঙ্গে জড়াতে চাইছেন। তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। মার্টিন দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলে।

—আমার মনে হয় না, হ্যারি আপনার মত লোককে দলে টানতে চেয়েছিল, আমি ইচ্ছে করে মার্টিনকে খোঁচা দিই।

এর জবাবে মার্টিন তাচ্ছিল্য ভরে বললো, আপনাদের শহরে পেট্রোলের চোরা কারবারে কাউকে ধরতে না পেরে মৃত হ্যারির নামে দোষ চাপাতে চাইছেন, যা সাধারণতঃ পুলিশরা করে থাকে।

এর উত্তরে আমি বলি, আমি স্টকল্যাণ্ডইয়ার্ড থেকে আসছি। এবং সরকারী কাজে আমি একজন কর্নেল।

সহসা মার্টিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ওর চোখ জ্বলছে। বুক সামান্য ওঠা নামা করছে। ও বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

আমি ভালো লড়িয়ে নই এবং ও আমার চেয়ে মাথায় ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হবে। চেহারাও মন্দ নয়।

তবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলি, কোন পেট্রোলের ব্যাপার নয়।

—তাহলে টায়ারের ? মার্টিনের জিজ্ঞস্য।

—তাও নয়, আমি শান্ত ভাবেই জবাব দি।

—তবে সাকারিনের ব্যাপার ?

মার্টিন এরপর একটু ঝুঁকে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, দু'একজন নির্দোষীকে বাদ দিয়ে প্রকৃত খুনীকে ধরার তো চেষ্টা করতে পারেন। যাতে কাজের কাজ হয়।

—আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

—ধন্যবাদ। মার্টিন বিকৃত মুখে হাসে।

—কিন্তু একটা কথা কি জানেন।

—কি কথা ? মার্টিনের দৃষ্টি এখনো খরখরে।

—খুন করারও হ্যারির আওতায় পড়তো।

—খুন ও জখম হ্যারির ব্যাপার ছিল। বলে হঠাৎই মার্টিন টেবিল উল্টে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু নেশার জন্য তার লক্ষ্য ঠিক ছিল না। সে উঠে আবার আমায় আক্রমণ করার আগেই ড্রাইভার কোত্থেকে ছুটে এসে তাকে

ধরে ফেললো।

আমি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললাম, ও একজন লেখক। মদ খেয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে। তুমি ওকে কিছু করো না।

মার্টিন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, শুনুন, মি ক্যালামান,... ...।

—আমি ক্যালামান নই, আমি মার্টিনকে বাধা দিয়ে বলি। আমি ক্যালাও। তা বলুন কি বলবেন?

—মার্টিন রেগে বলে, দেখছি আপনার দুর্ভাগ্যের শেষ থাকবে না।

—আমার মনে হচ্ছে এটা আপনার কোন গল্পের ডায়লগ।

এ কথার ধার কাছে না গিয়ে মার্টিন রাগতভাবে বলে, আমাকে আপনি আসলে অপরাধী করতে চাইছেন।

তারপর আমার কথার উত্তর না চেয়ে মার্টিন ফের বললো, এবার আমি যেতে চাই মিঃ ক্যালাম্যন।

আমি একটু আগের মত প্রতিবাদ না করে বললাম, এখন আপনাকে মেরে আমি ক'দিন শুইয়ে রাখতে পারতাম।

—সে চেষ্টা একবার করে দেখবেন নাকি?

—তা আমি করতে চাই না।

—আপনার অসীম করুণা বলতে হবে।

—তবে আপনাকে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা ছেড়ে পালাতে হবে।

—তাই নাকি? মার্টিন বিকৃত মুখে যেন ব্যাঙ্গ করলো।

আমি মার্টিনের এ কথার বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে কিছু টাকা ওর পকেটে গুজে দিয়ে বললাম, আশাকোরি আজকের রাতটা আপনার কোন রকম অসুবিধে হবে না।

মার্টিন গুম হয়ে আছে। এর কোন উত্তর দিল না।

—তবে কাল ভোরের প্লেনে লণ্ডনের জন্য যাতে আপনার সীট বুক করা থাকে তার ব্যবস্থা আমি করবো।

—তাই নাকি? মার্টিন টেনে কথা বলে।

—হ্যাঁ, আমি মাথা দোলাই।

—ও ভয় আমায় দেখাবেন না, মার্টিনের স্পষ্ট বক্তব্য।

—ভয় দেখাচ্ছি? আমি? আপনাকে?

—আপনার কথা শুনে তো আমার তাই মনে হচ্ছে।

—আমি আমার মতামতের কথা আপনাকে জানালাম।

—তা আমি আদৌও মানতে পারছি না। আমার এখানে আসার যাবতীয় কাগজপত্তর ঠিক আছে।

—ঠিক আছে তাই না?

—হ্যা। মার্টিনের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

—বেশ। ভালো কথা।

—শুনে খুশী হোলাম।

—অন্যান্য শহরের মত এখানেও টাকার দরকার হয়।

—এটা বলে দেবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!

—কালোবাজারে ব্রিটেনের পাউণ্ড ভাঙাতে দেখলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করবো।

—গ্রেপ্তার করবেন? আমাকে?

হ্যাঁ। আমার দৃঢ়তাপূর্ণ জবাব।

তারপর আমি কথা শেষ করে মার্টিনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ড্রাই-ভারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওকে ছেড়ে দাও।

মার্টিন ছাড়া পেয়ে ধুলো ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, পানীয়র জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

—তবে আমার মনে হয়, এসব খরচ সরকারের ব্যায়ের আওতায় পড়বে। মার্টিন আমায় হুল ফোটাতে চাইলো।

—হ্যাঁ। আমি হেসে মার্টিনের কথায় সায় জানায়। বলি, আপনার কথাই ঠিক।

—আশা করছি, দু'এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার আমাদের দেখা হবে। মার্টিন এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—এত দেরি করে?

—আপাতত আমার তাই মনে হচ্ছে।

ওযে খুব রেগে গেছে, তা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু তখনো বিশ্বাস করতে পারিনি, ওর কথার কোন গুরুত্ব আছে। আমার মনে হয়েছে, ও নিজের আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য এ কথাগুলো বললো।

—কাল বিদায় বেলা আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমি বলি।

—বিদায় বেলা? মার্টিন মৃদু হাসে।

—হ্যাঁ, আমি মাথা দোলাই।

—অনথা কষ্ট করে কাল বিমান বন্দরে যাবেন না। কারণ কাল আমি আদৌ যাচ্ছি না। এটা আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলতে পারি। আমার এখানে অনেক কাজ আছে।

—থাক্, পরের কথা পরে হবে। ড্রাইভারকে আপনার সঙ্গে দিলাম। ও আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে। সেখানে আপনি রাতের আশ্রয় এবং খাবার দুই পাবেন।

—এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না, মার্টিন বলে।

কথা শেষ করে মার্টিন বেয়ারাকে জায়গা করে দিয়েছে ভাবলাম, কিন্তু ও সহসা আমার চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুঁষি চালালো। রাগে ও যেন গজরাতে থাকে।

আমি কোন রকমে মাথা সরিয়ে ওর ঘুঁষি থেকে নিজেকে বাঁচালাম। ওকে কোন রকম পাল্টা আক্রমণ করলাম না। তবু মার্টিন রেহাই পেল না।

কিন্তু ড্রাইভারের এক ঘুঁষিতে মার্টিন মেঝেতে ছিটকে পড়লো এবং তার ঠোঁট ফেটে গেছে। তাতে রক্তের আভা।

তারপর আমি মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি একটু আগে বলে ছিলেন যে, কোন রকম মারামারি করবেন না।

মার্টিন জামার হাতা দিয়ে ক্ষতস্থানটা মুছতে থাকে এবং এর জবাবে রাগতোভাবে কি যেন বললো, তা ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না। শুধু একটু বোঝা গেল যে, সে ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই করতে পারতো।

ওদিকে সারাদিন অনেক ধকল গেছে। রোলো মার্টিনকে নিয়েও খুব ক্লান্ত। একটা অবসন্নতা আমায় ঘিরে ধরেছে। তারপর ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললাম, ওকে হোটেলে পেঁাছে দাও। পথে কোন মতেই আঘাত করো না।

কথা শেষ করে বেয়ারার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লাম। এরপর বেয়ারা আসতে পানীয়র অর্ডার দিলাম।

ইতিমধ্যে ড্রাইভার বলে উঠলো মিঃ মার্টিন দয়া করে এই পথ দিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।

॥ তিন ॥

এর পরের ঘটনা পেইনের কাছ থেকে শুনিনি ঠিকই, শুনেছিলাম রোলো মার্টিনের কাছ থেকে। পেইন হোটেলে পৌঁছে ম্যানেজারকে বললো, এই ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে প্লেনে এসেছেন। কর্ণেল ক্যালাও ওঁকে একটা ঘর দিতে বলেছেন।

ম্যানেজার কর্ণেল ক্যালাওর নাম শুনে বলে, আমি ওঁর জন্য এখুনি একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

পেইন ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানায়।

ওদিকে হোটেলের কুলী মালপত্তর এনে মার্টিনকে জিজ্ঞেস করে, এখানে আপনার রিজার্ভেশন আছে?

মার্টিন ক্ষতস্থানে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নাড়ে, উহুঁ!

ম্যানেজার এবার মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি কি মিঃ ডেকস্টার?

—হ্যাঁ, আমিই ডেকস্টার।

—আপনার জন্য একটা ঘর বুক করা আছে।

—ধন্যবাদ! বললো বটে, তবে মার্টিনের মুখ থেকে রুমাল সরানো যায় না। হাত চাপা দিয়েই বলে। ঘরটা কত দিনের জন্য বুক করা আছে, তা জানতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই ম্যানেজার খাতার পাতা ওল্টাতে থাকে।

—কত দিনের জন্য? মার্টিন ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—এক সপ্তাহের জন্য।

—আচ্ছা, আচ্ছা মার্টিন মাথা দোলায়।

হঠাৎ পাশ থেকে মার্টিনকে লক্ষ্য করে একজন বলে উঠলো, বিমান বন্দরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারিনি বলে দুঃখিত। আপনার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হচ্ছে।

—তা একটু হয়েছে বই কী।

—আমার নাম ক্রাবিন।

মার্টিন ক্রাবিনের দিকে তাকায়। ক্রাবিন মাঝ বয়সী। শক্ত সমর্থ পুরুষ। মাথার মাঝে টাক। চোখে এত মোটা ফ্রেমের চশমা, যা কোনোদিন সে দেখেনি।

ক্রাবিন দুঃখ প্রকাশ করে জানায়, হেড কোয়ার্টার ভুল করে তারা বার্তায় জানায় যে, আপনি আসছেন না। আমার জানা একজন লোক আপনার আসা সম্বন্ধে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে বলতে আমি সঙ্গে সঙ্গে বিমান বন্দরে যাই।

—আপনি গেছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, ক্রাবিন জানায়। কিন্তু আমার কপাল মন্দ। ততক্ষণে আপনি

বিমান বন্দর ছেড়ে চলে গেছেন। যাক্, আমার বার্তাটা হোটেল থেকে পেয়েছেন তো?

—হ্যাঁ পেয়েছি, মার্টিন অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল, কারণ সে মুখ থেকে হাত সরায় না। ক্ষতস্থানে রুমাল চাপা দেওয়া।

—মিঃ ডেকস্টার, আপনার সঙ্গে এ মুহূর্তে সাক্ষাৎ করতে পেরে বেশ উত্তেজনা বোধ করছি।

—ধন্যবাদ! মার্টিন এখন খানিকটা স্বস্তি বোধ করছে।

ছোটবেলা থেকে আপনাকে আমি এ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বলে ভাবি, ক্লাবিনের গদ গদ ভাব।

এতে মার্টিনের খুশী হবার বদলে ক্লাবিনের দিকে ভ্রুকুঁচকে তাকালো। তারপর ঠোঁট ফাঁক করতে যন্ত্রনা হওয়ায় প্রতিবাদ না করে বক্তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

—অস্ট্রেলিয়ার অগণিত পাঠকের কাছে আপনি প্রিয়। বিশেষ করে আপনার 'বিশাক্ত ছোবল' বইটা আমার দারুণ ভালোলাগে।

মার্টিন এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চিন্তা করে গভীরভাবে। এরপর আস্তে বলে, আমি কি এখানে এক সপ্তাহ থাকতে পারবো।

—হ্যাঁ পারবে ক্লাবিন জানায়।

—অনেক ধন্যবাদ! মার্টিন যেন চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে।

তারপর একটা কথা মনে হওয়ায় মার্টিন বলে, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম, যদি কিছু মনে না করেন।

—না, না, মনে করবো কেন! বলুন কি জানতে চান।

—আমার এখানকার খাওয়ার প্রতিদিনের বিল কে মেটাবে?

—মিঃ স্মিড, ক্লাবিন জানায়।

—মিঃ স্মিড? ভালো কথা।

—আপনার হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দরকার।

—ঠিক ধরেছেন, মার্টিন মাথা দুলিয়ে বলে।

—ওটা আমিই মেটাবো।

—বাঃ খুব ভালো কথা।

—আমার মনে হয়, কাল আপনি একটু একা থাকতে চাইবেন।

—ঠিক ধরেছেন।

—আপনার কোথাও বেরোবার দরকার হলে বলবেন।

—নিশ্চয়ই জানাবো।

—ও হ্যাঁ, আপনাকে একটা কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি।

—কি কথা? মার্টিন জানতে চায়।

—পরশুদিন এখানকার এক সভায় উপন্যাসিকদের নিয়ে এক আলোচনা চক্র

করবে।

—খুব ভালো কথা।

—তাতে আপনি সভাপতি হলে আমরা ভীষণ খুশী হবো।

মার্টিন এখন ক্রাবিনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার সব প্রস্তাবেই সে রাজী। তাছাড়া, এক সপ্তাহ বিনা খরচে থাকা যাবে, এটা একটা কম কথা নয়।

—আপনি রাজী হওয়ায় সত্যি আনন্দিত হোলাম।

পরে আমি জেনেছিলাম, মার্টিন একগ্লাস মদ, একটা মেয়েছেলে এবং একটু ঠাট্টা তামাসা বা নতুন কোন উত্তেজনার জন্য সে সব কথাতেই রাজী।

মার্টিনের মুখে রুমাল চাপা থাকায় ক্রাবিন কিছুটা বিনয়ের সঙ্গে বলে, মিঃ ডেকস্টার আপনার দাঁতে কি ব্যাথা? তাহলে আমার একজন চেনা ভালো দাঁতের ডাক্তার আছে।

—আমাকে একজন আঘাত করেছে। তাই……।

—হায় ভগবান। ছিনতাই কারিদের হাতে পড়েছিলেন নাকি।

—না, চোর-ডাকাত নয়।

—তবু ভালো কথা।

—একজন সৈনিকের হাতে পড়েছিলাম।

—সৈনিক? খুব বদরাগী ছিল বুঝি?

—আমি ওর কর্ণেলগিরি ঘুচিয়ে দিলাম

—দেখি আপনার কোথায় লেগেছে।

মার্টিন রুমাল সরিয়ে ঠোটের ক্ষতস্থানটা ক্রাবিনকে দেখায়।

ক্রাবিন প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। কিছু বলতে পারে না।

তারপর মার্টিন পরিস্থিতি সহজ করার জন্য বলে, আচ্ছা আপনি 'নির্জন আরোহীর' বইটা পড়েছেন?

—বোধ হয় না, ক্রাবিন মাথা নাড়ে।

মার্টিন বললো, 'নির্জন আরোহীর' সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে এক জমিদার গুলি করে মেরেছিল। এই গল্পটায় সে আইনগতভাবে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছিল।

ক্রাবিন একথা শুনে বলে, আমি কখনো ভাবিনি যে ঐ ধরনের পশ্চিমী উপন্যাসগুলো আপনি পড়েন।

—আমিও তো লিখি, কথাটা জানাতে গিয়েও মার্টিন একটা কথা ভেবে থেমে যায়।

তারপর এ কথা না বলে মার্টিন বলে, আমি কর্ণেল ক্যালামিনের পেছনেও ঠিক এইভাবে লাগবো।

—আচ্ছা ঐ কর্ণেল লোকটি কে? ক্রাবিন জানতে চায়।

—তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, মার্টিন ক্রাবিনের

দিকে তাকায়।

—বলুন আপনি কি জানতে চান।

—হ্যারী লাইমকে আপনি চেনেন?

—হ্যাঁ, ক্রাবিন আস্তে বলে। তবে…। ক্রাবিন কথার মাঝে থেমে যায়। ইচ্ছে করে কথাটা শেষ করে না।

—তবে কি মার্টিন কিছুটা চিন্তিত।

—তবে খুব একটা ভালো করে চিনি না।

—সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

—আমার মনে হয় না সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে তার কোন মিল থাকতে পারে।

—সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে আমার কোন বন্ধুর মিল নেই।

—আমার তাই মনে হয়েছে।

মোটা চশমার আড়ালে ক্রাবিনের চোখদুটো অসহায়ভাবে ওঠানামা করলো। তারপর সে জানায়, আপনার একটা কথা জানা আছে কি না আমার জানা নেই যে, হ্যারি লাইমের থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ ছিল।

—থিয়েটার? হ্যারি লাইমের ঝোঁক ছিল?

—আমার তো তাই মনে হয়।

—কেন মনে হতো?

—সে যে মাঝে মাঝে তার একজন অভিনেত্রী বন্ধুকে নিয়ে আসতো।

—বয়স কত? মার্টিন জানতে চায়।

—বেশ অল্পই হবে।

—তবু কত? মার্টিন আগ্রহ প্রকাশ করে।

—কুড়ি বাইশ হবে।

—অভিনয় কেমন করে?

—কাঁচাই বলা যায়।

মার্টিনের হঠাৎ একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। সে যখন কবরস্থানে গেছিল তখন একটি মেয়েকে দেখেছিল। সে মেয়েটি তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

তারপর মার্টিন বলে আমি হ্যারির কোন বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। যদি এ ব্যাপারে আপনি আমায় সাহায্য করেন, তাহলে খুব ভালো হয়।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আচ্ছা এই মেয়েটির সঙ্গে আপনি পরিচিত হতে চান? ক্রাবিন জিজ্ঞেস করে।

—মার্টিন বলে আমার কোন আপত্তি নেই।

—সেই অভিনেত্রী মেয়েটিকে আপনি হয়তো সভায় দেখতে পারেন।

—মেয়েটি কি অস্ট্রিয়ান? মার্টিন আগ্রহ প্রকাশ করে।

—যদি ও মেয়েটি নিজেকে অস্ট্রিয়ান বলে, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ও

অস্ট্রিয়ান নয়।

—কি হতে পারে?

—ও হাঙ্গেরীয়ান। হ্যারি সম্ভবত ওর কাগজ পত্তর ঠিক করে দিয়েছে। ক্রাবিন এসব কথা জানায়।

—আচ্ছা মেয়েটির নাম জানেন?

—জানি বলেই ক্রাবিন ভাবতে থাকে।

—কি নাম?

ক্রাবিন একটু ভেবে বলে, ও নিজেকে আন্না স্মিড বলে পরিচয় দেয়।

এরপর মার্টিনের মনে হলো, তার আর ক্রাবিনের কাছে কিছু জানার নেই। তাই সে বলে, আমি দারুণ পরিশ্রান্ত। একটু বিশ্রাম করতে চাই। কাল ভোরে আপনাকে ফোন করবো।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

তারপর ক্রাবিন যাওয়ার আগে পার্স থেকে কিছু পাউণ্ড বার করে মার্টিনের দিকে এগিয়ে দেয়, এটা রাখুন।

মার্টিন তা নিতে নিতে বলে, এতে কত পাউণ্ড আছে?

—বেশী নয়।

—তবু কত?

—মাত্র দশ পাউণ্ড আছে।

—ধন্যবাদ!

—গুড নাইট।

এরপর ক্রাবিন চলে যেতে মার্টিনের মনে হলো, তার ঘণ্টায় সব মিলিয়ে বারো পাউণ্ড আয় হলো এবং তা বেশ তাড়াতাড়ি হয়েছে এটা বলা চলে। এরকম আরো কিছু কথা সে ভাবে।

তারপর মার্টিন বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে দিতে তার বড় নিজেকে পরিশ্রান্ত বলে মনে হলো। এরপর সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না।

এক সময় মার্টিন ভিয়েনার স্বপ্নের মাঝে ডুবে যায়। সে যেন বরফের মাঝে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাঁটছে। প্যাঁচা ডাকছে, আর হ্যারির মত একটা অপরিচিত লোককে শিষ দিতে দেখলো এবং ও যেন ওখানে কোন একটা গাছের তলায় তার জন্য অপেক্ষা করছে, কিন্তু এত বরফের মাঝে সে নির্দিষ্ট গাছটাকে ঠিক চিনতে পারে না।

তারপর প্যাঁচাটা জোরে ডেকে উঠতে দেখে মার্টিনের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং দেখতে পায় ফোনটা এক নাগারে বেজে চলেছে।

মার্টিন একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিসিভারটা তুলে নিল, হ্যালো। একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর তার কানে এলো।

কে যেন বলে উঠলো আপনি কি রোলো মার্টিন?

—হ্যাঁ ডেকস্টার না বলায় মার্টিন খুশী হলো। আপনি কে কথা বলছেন? সে জানতে চায়।

—আপনি আমায় চিনবেন না।

—তবু একটু পরিচয় যদি দিতেন।

—আমি হ্যারি লাইমের বন্ধু।

—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে খুশী হবো। তা আপনি কোথায় থাকেন? মার্টিনের জিজ্ঞাসা।

—আমি পুরনো ভিয়েনার ঠিক মোড়ের মাথায় থাকি।

—আচ্ছা, আমাদের সাক্ষাৎকারটা কি কাল করা যায় না? আজ আমি বড্ড টায়ার্ড।

—আচ্ছা, আচ্ছা, অপর পক্ষ অস্বস্তি বোধ করে।

—সেইজন্য বলা আর কি।

এ কথার কোন জবাব না অপর পক্ষ বলে, হ্যারি মরে যাবার আগে আমায় অনুরোধ করেছে, যেন এখানে আপনার কোন রকম অসুবিধে না হয়।

—আমি ভাবছি···, বলেই মার্টিন বলতে যাচ্ছিল। হ্যারির তো মরে যাবার আগে কোন রকম কথা বলার অবস্থা ছিল না।

হঠাৎ মার্টিনের মনে হলো, কেউ যেন তাকে সাবধান করে দিল। ফলে সে প্রসঙ্গ বদলালো। বললো, এখনো কিন্তু আপনার নামটা আমার জানা হলো না।

—আমার নাম কার্টাস, বলেই সে আরো জানায়। আমি আপনার কাছে যেতে পারতাম, কিন্তু ও অঞ্চলে অস্ট্রিয়ানদের যাবার কোন অধিকার নেই।

—তাহলে কাল সকালে আমাদের পুরনো ভিয়েনায় দেখা হতে পারে। মার্টিন জানতে চায়।

—ঠিক আছে, তবে কাল পর্যন্ত আপনার কোন অসুবিধে হবে না তো। কার্টাস প্রশ্ন করে।

—হঠাৎ এ কথা বলছেন?

—মানে হ্যারি বলেছিল, আপনার হাতে কোন টাকা-পয়সা নেই তো। তাই এ কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, অন্য কিছু ভেবে নয়।

—আপাতত আমার কোন রকমে চলে যাবে। হ্যারি আপনাকে ঠিক কথাই বলেছিল। ও আমার সত্যিকারের বন্ধু ছিল।

—আর আমি সে জন্যই···।

—তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

—না, না, এতে ধন্যবাদের কি আছে! তাহলে ফোনটা রাখছি।

—ঠিক আছে।

মার্টিন রিসিভারটা হাতে নিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকে,

ভিয়েনায় এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এই তৃতীয় লোক, যে তাকে আবার টাকা দিতে চাইছে।

তখনও মার্টিন রিসিভার নামিয়ে রাখেনি। অপর পক্ষেও নিশ্চয়ই তাই করেছিল। নইলে সে তার গলা কী করে শুনতে পেল!

কার্টসের কথায় মার্টিনের চিন্তায় ছেদ পড়ে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলে, হ্যালো!

—কাল সকালে আমাদের দেখা হতে পারে?

—সকালে। ক'টায়।

—এগারোটার সময়?

—কোথায়।

—স্ট্রাসের পুরনো ভিয়েনায়।

—ঠিক আছে, আপত্তি নেই। হ্যাঁ ভালো কথা, আপনাকে ওখানে আমি চিনবো কী করে?

—তার ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি।

—যেমন?

—আমার পরনে থাকবে বাদামী স্যুট।

—সে তো অনেকের পরনেই থাকতে পারে।

—হ্যাঁ তা পারে।

—তাহলে যে আমায় বোকায় পড়তে হতে পারে।

—এবার যে কথাটা বলবো তাহলে হয়তো আর পড়তে হবে না।

—কোন কথাটা?

—আমার হাতে থাকবে আপনার লেখা একটা বই, যাতে আমায় চিনতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

—আমার লেখা বই?

—হ্যাঁ, কার্টস সায় জানিয়ে বলে।

—তা আপনি কোথায় পেলেন?

—হ্যারি দিয়েছিল। তাহলে ঐ কথা রইলো?

—মার্টিন এর কোন উত্তর না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে ফের চিন্তার মাঝে ডুবে যায়। মনে পড়ে কর্নেল তাকে বলেছিল, হ্যারি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল।

সহসা মার্টিনের কেমন যেন মনে হলো, হ্যারির মৃত্যু রহস্যজনক। স্বাভাবিক নয়, যা পুলিশও বার করতে প্যারেনি।

তারপর মার্টিন পরপর দুটো সিগারেট শেষ করলো। তার দুই চোখ আবার ঘুমে জড়িয়ে আসে। তার রাতের খাওয়া হলো না। তবু হ্যারির মৃত্যু রহস্য তাকে ঘিরে রইলো।

॥ চার ॥

মার্টিন আমায় বলেছিল, সেই লোকটাকে প্রথম দেখে যা আমার খারাপ লেগেছিল, তা হলো পরচুলা। সেটা ওর মাথায় ঠিক মত লাগানো ছিল না। তবে পরচুলের পিছনের চুলগুলো সমান করে ছাঁটা ছিল। অথচ তার চুলের রেখাগুলো দেখে মনে হতো, ওর মধ্যে একটা খেয়ালী মন এবং মুগ্ধ করার মত একটা রূপ আছে। তার চোখের কোণের রেখাগুলো সম্ভবত স্কুলের মেয়েদের ভালো লাগবে।

মার্টিনের কাছ থেকে যখন এই কথাগুলো শুনছিলাম তখন সেই পড়ন্ত বরফের মধ্যে দিয়ে একটি মেয়ে দ্রুত অফিসের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ওর মধ্যে একটা ব্যস্ত ভাব।

মেয়েটিকে দেখে মার্টিনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আমি মার্টিনকে খুশী করার জন্য বললাম, মেয়েটিকে দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দরী, তাই না?

—সুন্দরী। মার্টিনের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়?

মার্টিন মেয়েটির দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো, ও সব একবারে বাদ দিয়েছি মিঃ কালাও। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এ রকম একটা সময় আসে যখন এর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় না।

—আপনার কথা আমি অস্বীকার করছি না। তবে আমার মনে হলো, মেয়েটিকে আপনি কিন্তু বেশ লক্ষ্য করেছিলেন।

—ঠিক বলেছেন, বলে মার্টিন ভাবতে থাকে। কেন জানি না মেয়েটিকে দেখে আমার একজনের কথা খুব মনে পড়ছিল।

—কার কথা?

—অ্যান্না স্মিডের।

—সে কে? ও-ও তো একজন মেয়ে।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। একভাবে বলতে গেলে তাই হয়।

—'একভাবে' বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?

—সে ছিল হ্যারির প্রেমিকা।

—আপনি এখন ওর দেখাশুনো করবেন?

—না মিঃ কালাও। সে অন্য ধরনের মেয়ে। তাকে তো আপনি হ্যারির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় দেখেছেন। আর আমি এখন ও সব ব্যাপারের মধ্যে থাকতে চাই না।

—যাক্‌ আপনি কিন্তু আমায় এতক্ষণ মার্টনের কথা শোনাচ্ছিলেন।

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা দোলায়। তাহলে শুনুন।

মনে হলো, কার্টিস সেখানে বসে মনোযোগ দিয়ে শ্যানটাফের 'নির্জন আরোহী' বইটা পড়ার ভান করছে, আর মার্টিন যখন তার টেবিলটার সামনে গিয়ে বসলো তখন সে বললো, বইটার উত্তেজনা আপনি দারুণ ভাবে টিকিয়ে রেখেছেন।

—উত্তেজনা? মার্টিন কিছুটা অবাক।

—রহস্য জিইয়ে রাখতে আপনি একজন নিপুণ কারিগর। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ শেষ হলেই পরেরটা পড়ার জন্য প্রবলভাবে আগ্রহ জাগে।

—ধন্যবাদ! মার্টিন এতে ততটা খুশী হলো না। সে কাজের কথায় আসতে চায়। তাই সে জিজ্ঞেস করে, আপনি তো হ্যারিলাইমের বন্ধু ছিলেন, তাই না?

—শুধু বন্ধু? কার্টিস বিস্ময় প্রকাশ করে।

—তাহলে? মার্টিন কথাটা কার্টিসের দিকে ছুড়ে দেয়।

—সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। অবশ্য আপনাকে বাদ দিয়ে।

—সে কি করে মারা গেছে তা আমায় বলুন।

বলছি, বলে কার্টিস একটু ভেবে নিল। দুর্ঘটনার সময় আমি হ্যারির সঙ্গে ছিলাম। আমরা একসঙ্গে হ্যারির ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসে। তখন সে কুলার নামে তার আমেরিকান বন্ধুকে দেখতে পেয়ে তাকে হাত তুলে ডাকলো। তারপর হ্যারি রাস্তা পার হবার জন্য পা বাড়াতে সহসা একটা জীপ মোড় ঘুরে এসে তাকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দেয়।

একটু থেমে কার্টিস আবার বলে, তবে সত্যি কথা বলতে গেলে, দোষটা ছিল হ্যারিরই। তার ঐ ভাবে রাস্তা পার হওয়া মোটেই উচিত হয়নি। তখন ড্রাইভারের কিছু করার ছিল না।

তারপর মার্টিন বললো, আমায় হ্যারির একজন প্রতিবেশী বলেছিল, ও সাথে সাথে মারা গেছিল।

—তাহলে তো ভালোই হতো।

—কেন?

—সে অ্যাম্বুলেন্স ডাকা পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

—তাহলে তখন সে কথা বলেছিল? মার্টিনের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

—শেষ সময়ে আপনার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল।

—আমার সম্বন্ধে? মার্টিন দুঃখ পায়।

—হ্যাঁ।

—কি বলেছিল?

—সে ঠিক কি বলেছিল তা এ মুহূর্তে আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে সে আমায় অনুরোধ করেছিল, আপনি এখানে এসে পৌঁছলে আমি যেন আপনার দেখাশুনো করি।

একটু থেমে মার্টিন আবার বলে, আমি আপনার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

মার্টিন এ কথার জবাব না দিয়ে বলে, হ্যারি মারা যাবার সাথে সাথে তার ঘরে আমায় আসতে বারণ করে দিলেন না কেন ?

—আমি তার করেছিলাম।

—করেছিলেন ? মার্টিন অবাক হয়।

—হ্যাঁ, কার্টস মাথা দোলায়।

—কিন্তু আমি তো সে তার পাইনি।

—দুর্ভাগ্যবশত তা আপনার হাতে গিয়ে পেঁছায়নি।

—হ্যাঁ, তাই হবে, আর আমারও কপাল। নইলে এখানে এসে আমায় এ দৃশ্য দেখতে হয়!

—ভিয়েনার এখন যা অবস্থা তাতে সেন্সার হতে প্রায় পাঁচ ছ'দিন লেগে যায়।

তারপর মার্টিন একটু ইতস্তত করে বলে। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

—কি কথা ?

—হ্যারির সম্বন্ধে।

—স্বচ্ছন্দে।

—আচ্ছা, আপনি জানেন, হ্যারি কোন বাজে ব্যাপারে জড়িত ছিল। যা নিয়ে পুলিশও তাকে সন্দেহ করতো।

—মা সবাই জানে, আমরা সিগারেট জাতীয় জিনিস বিক্রী করে স্থানীয় পয়সা রোজগার করি।

—তাহলে পুলিশ সন্দেহ করছে কেন ?

—তা তো বলতে পারছি না, কার্টস হেসে বলে। তবে মাঝে মাঝে পুলিশের মাথায় অদ্ভুত তত্ত্ব ভর করে তো।

এ কথা শুনে মার্টিন বলে, তবে একটা কথা আমি আপনাকে বলতে পারি, যা শুনলে আপনিও খুশী হবেন। কারণ আপনি তো হ্যারির বন্ধু ছিলেন।

—আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে। বলুন কি বলতে চান।

—আপনি আমার যাবার ব্যবস্থা করলেও আমি এখন এখান থেকে নড়ছি না।

—যাবেন না ? কার্টসের চোখ কুঁচকে যায়।

—হ্যাঁ, মার্টিনের মুখে আত্ম প্রত্যয়ের হাসি।

—কারণটা যদি দয়া করে বলেন।

—আমি পুলিশের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত না করে এখান থেকে এক পাও নড়ছি না।

—তাতে লাভ কি ! কার্টসের মুখে একটা দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটে ওঠে। এ করেও কী আমরা হ্যারিকে ফিরিয়ে আনতে পারবো ?

—তা পারবো না ঠিকই, তবে…… ।

কথার মাঝে কার্টস মার্টিনকে থামিয়ে দিয়ে বলে, প্লিজ ! ওসব পুলিশের ঝামেলার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইবেন না।

—জড়াতে আমি চাই না, তবে আমি দেখতে চাই, কর্ণেল হ্যারিকে এত দোষারোপ করছে। তাকে আমি ভিয়েনা ছাড়া করতে পারি কি না।

—আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কি করতে চাইছেন।

—আমি হ্যারির মৃত্যুর সময় থেকে অনুসন্ধান শুরু করবো।

—অনুসন্ধান ? আবার সেই পুলিশের ঝামেলায় নিজেকে জড়াতে চাইছেন ? কার্টসের খানিকটা নিরাশ গলা।

—জড়াতে আমায় হবে। এছাড়া, কোন উপায় নেই।

—একথা কেন বলছেন ?

—হ্যারি আমার প্রিয় বন্ধু। তাকে কেউ দোষারোপ করবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

—আমি আপনার রাগের এবং দুঃখের কারণটাও বুঝি। তবু বলছি… । কার্টস কথাটা শেষ করে না।

—উপায় নেই। আপনি আমায় একটু সাহায্য করবেন ?

—কি ব্যাপার ?

—আপনি আমায় কুলারের ঠিকানাটা দেবেন ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেবো।

—ও হ্যাঁ, আর ড্রাইভারের ঠিকানাটাও দেবেন।

—ড্রাইভারের ঠিকানা তো আমি জানি না।

—তবে ড্রাইভারের ঠিকানা আমি পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে জেনে নিতে পারবো আশা করি।

—আচ্ছা। কার্টস মাথা নাড়ে।

—হ্যারির সেই প্রেমিকাকে কোথায় পাওয়া যাবে ?

—হ্যারির প্রেমিকা ?

—হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—কিন্তু . , কার্টস ইতস্তত করতে থাকে।

—কিন্তু কি ?

—দেখা না করাই ভালো।

—এ কথা কেন বলছেন ?

—হ্যারির ব্যাপারে কথা বললে মেয়েটি দুঃখ পাবে।

—দুঃখ পাবে ? যাক্, আমি এখন আর মেয়েটির ব্যাপারে কিছু ভাবতে

চাই না। দরকার আমার হ্যারির বিষয় জানা।

—একটু থেমে মার্টিন ফের বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

—নিশ্চয়ই।

—হ্যারিকে পুলিশ কি ব্যাপারে সন্দেহ করছে, তা আপনার কি জানা আছে ? মার্টিন কথাটা বলে কার্টসের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখ ফেরাতে পারে না।

—না, আমার জানা নেই।

—অবশ্য অনেক কাছের বন্ধুও এ কথা জানতে পারে না।

—কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছিলাম।

—কি কথা ?

—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আপনি হ্যারির ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যদি কিছু নোংরা বেরিয়ে পড়ে।

—নোংরা ? মার্টিন একটু টেনে কথা বলে।

—হ্যাঁ।

—সেটুকু ঝুঁকি আমায় নিতে হবে বই কী !

—আপনি অনুসন্ধান করুন। তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। আরো বিশেষ করে আপনি যখন ওর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তবে একটা কথা কি ভেবে দেখেছেন ?

—কি কথা ?

—এতে যেমন সময় দরকার, তেমন প্রয়োজন টাকার।

—সময় আমার যথেষ্ট আছে, টাকার ব্যাপারে আপনি আমায় সাহায্য করবেন না ?

—যদিও আমি ধনী লোক নই, কার্টস জানায়, তবু হ্যারিকে কথা দেওয়া অনুযায়ী আপনার এখানে থাকার এবং ফিরে যাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। অনুসন্ধানের ব্যাপারে টাকার কথাটা সে উল্লেখ করে না।

মার্টিনও-ও কথায় না গিয়ে বললো, আমি কিন্তু একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বাজী ধরতে পারি ?

—কি ব্যাপারে ?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হ্যারির মৃত্যুর মধ্যে কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। এটা আমি আপনাকে বলতে পারি।

যদিও কথাটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন, তবুও মার্টিনের দৃঢ় বিশ্বাস। হ্যারির মৃত্যু খুন না হলেও বেশ কিছুটা রহস্যজনক।

—রহস্য ? কার্টস বিস্ময় প্রকাশ করে হাসে।

—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছে।

কার্টিস মার্টিনকে জিজ্ঞেস করে, রহস্য বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? কথাটা বলেও তার অস্বস্তি ভাবটা যায় না।

আমার ধারণা, পুলিশের ব্যাপারে হ্যারির মৃতদেহ যতটা সুবিধে হয়েছিল, কিন্তু আসল ব্যাপারে যারা জড়িত তাদেরও কি একই সুবিধে হয়েছিল? মার্টিন প্রশ্ন করে।

একথা শোনার সাথে সাথে কার্টিস যেন কেমন ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক করে বলে, সাহায্যের দরকার হলে আমায় নিশ্চয়ই বলবেন। তবে মার্টিনের ও কথার উত্তর সে এড়িয়ে যায়।

—সে তো বলবই। যাক্, এখন আমায় কুলারের ঠিকানাটা দিন।

—এই নিন, বলে একটা কাগজে খস খস করে কি যেন লিখে কার্টিস মার্টিনের দিকে এগিয়ে দেয়

—আপনার ঠিকানাটা পেলেও ভালো হতো।

—আমার ঠিকানা?

হ্যাঁ, বিদেশে আছি তো। কখন কি দরকার লাগে, তাই ঠিকানাটা চাইছিলাম আর কি।

—ঠিক আছে, বয়ল কার্টিস ঠিকানাটা লিখে দেয়।

—ধন্যবাদ!

কার্টিস উঠে দাঁড়িয়ে পরচুলা ঠিক করে বলে, আপনি আমার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন না। তারপর সে মার্টিনের লেখার অনেক প্রশংসা করে হেসে বলে। এবার আমি উঠি।

কিন্তু বেরুবার আগে কার্টিস হাত দিয়ে মুখ মুছলো তখন মার্টিনের সন্দেহ হলো, এর হাসিটা যেন কৃত্তিমতায় ভরা এবং একরাশ সন্দেহ নিয়ে সে তার গতিপথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

॥ পাঁচ ॥

যোশেফস্টাডের থিয়েটার। স্টেজের দরজার কাছে এখন একটা চেয়ার নিয়ে মার্টিন বসে আছে। ইতিমধ্যে সে অ্যান্না স্মিডের কাছে কার্ড পাঠিয়েছে। তাতে লিখেছে হ্যারির বন্ধু। কার্ডটা পাঠিয়ে সে নানারকম চিন্তা ভাবনা করছে।

হঠাৎ মার্টিন প্রশ্ন করলো, অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা একের পর এক চলে যাচ্ছে

—মিঃ মার্টিন……।

হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে মার্টিন উপরের দিকে তাকায়। তখন সে পর্দার ফাঁক দিয়ে অ্যান্না স্মিডকে দেখতে পায়।

মার্টিন এবার অ্যান্না স্মিডের দিকে তাকায়। অ্যান্না দেখতে খুব একটা সুন্দরী নয়। তবু এর মধ্যে একটা আলগাশ্রী আছে, যা ওকে কামনায় করে তুলেছে। ওর চুল কালো। চোখ বাদামী, আর ওর কপাল চওড়া, তাতে ওকে ভালোই লাগছে।

অ্যান্না জানতে চায়, আপনি কি উপরে আসবেন?

মার্টিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, নিশ্চয়ই।

—আমার ঘরটা ডান দিকের প্রথম ঘরের পরেরটা।

এর মধ্যে একটা কথা বলে রাখি। আমায় মার্টিন বলছিল, এ জগতে কিছু কিছু লোক আছে, যাদের দেখেই মনে হয়, ওদের কাছ থেকে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। অ্যান্না স্মিড সেই দলেরই একজন হয়ে উঠেছে।

যাক্, এবার ঘটনায় আসা যাক্।

মার্টিন অ্যান্নার কথায় সায় জানিয়ে বলে, আসছি।

মার্টিন এক সময় অ্যান্নার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চায়। আসতে পারি।

—আসুন, অ্যান্না মার্টিনকে স্বাগত জানায়।

মার্টিন অ্যান্নার ঘরে ঢুকে লক্ষ্য করলো, অভিযাত্রীদের ঘর যেমন হওয়া উচিত তেমন নয়। ওর ঘরে তার পোশাক-আশাক বা প্রসাধন দ্রব্য তেমন কিছুই নেই। শুধু কেটলিতে জল গরম হচ্ছে।

অ্যান্না মার্টিনের দিকে তাকায়, আপনি বসুন। চা খাবেন?

মার্টিন ঘাড় কাৎ করে বসে, হ্যাঁ, এক কাপ চা হলে তো এ সময় খুবই

ভালো হয়। অথচ সে চা খাওয়াকে রীতিমতন ঘৃণা করে।

এক সময় চা তৈরী হয়ে যায়। অ্যান্না মার্টিনের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, চিনি ক'চামচ দেবো?

—এক চামচ, মার্টিন জানায়।

তারপর চায়ের কাপে চিনি ছেড়ে দিয়ে অ্যান্না মার্টিনের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়, এই নিন।

—ধন্যবাদ! মার্টিন চায়ের কাপে চামচ দিয়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বলে। এরপর কোন রকম ওষুধ গেলার মত সে চাটা খেয়ে নেয়।

তারপর মার্টিনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে অ্যান্না বসে। তার হাতেও গরম চায়ের কাপ। সে আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিতে থাকে। ঠিক যেমন আধুনিকারা করে থাকে।

মার্টিন চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, আপনাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

অ্যান্না চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। সে থেমে যায়। বলে, বলুন, কি জানতে চান।

মার্টিন অন্য কোন রকম ভনিতায় না গিয়ে একবারে সরাসরি কাজের কথায় আসে, হ্যারির ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার দেখা করার প্রয়োজন ছিল! তাই না এসে কিছুতেই পারলাম না।

—হ্যারির ব্যাপারে? অ্যান্না অবাক হয়।

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা দোলায়।

হ্যারির কথা শুনে অ্যান্নার মুখের ভাব পাল্টে যায়। সে নিস্পৃহভাবে বলে, কি আপনার জিজ্ঞাস্য?

মার্টিন কথাটা বলেই বুঝতে পারে, তার নিজের সম্বন্ধে বন্ধু হিসেবে কিছু বললে এক্ষেত্রে হয়তো সুবিধে হতে পারে। তাই সে বলে, আমরা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে পরিচিত। আর আপনি হয়তো জানেন, আমরা এক স্কুলে পড়েছি এবং পরবর্তীকালেও আমাদের সম্পর্ক অটুট ছিল।

—যখন আপনার কার্ড পেলাম তখন আপনাকে আমি 'না' বলতে পারলাম না, কিন্তু হ্যারির ব্যাপারে আমার কিছুই বলার নেই।

—কিন্তু আমি হ্যারির সম্বন্ধে…।

অ্যান্না কথার মাঝে মার্টিনকে থামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। হ্যারি আজ তো মৃত।

—কিন্তু আমরা দু'জনেই তো তাকে ভালোবাসি।

—ভালোবাসতাম।

—না, এখনো ভালোবাসি, মার্টিন অ্যান্নার কথার মৃদু প্রতিবাদ করে। ও যেন এখনো আমার বুকের মধ্যে রয়েছে। ওর উত্তাপ যেন আমি অনুভব করতে পারি।

তারপর একটু থেমে মার্টিন আবার বলে, আপনি কুলার বলে কাউকে চেনেন ?

—সেই আমেরিকান ছোঁড়াটা ?

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা নেড়ে সায় জানায়।

—হ্যারি মারা যেতে ঐ ছেলেটা আমায় কিন্তু টাকা দিয়ে বলেছে, এটা আপনাকে হ্যারি দিতে বলেছে।

—হ্যারি মারা যাবার সময় আমার কথা চিন্তা করেছে। তাতে আমার মনে হয়, ও খুব একটা যন্ত্রনা পায়নি।

—সে কথাটা তো নিজেকে সব সময় বোঝাতে চাই। চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। তবু এক এক সময় ওর চিন্তায় বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

—আচ্ছা, হ্যারি মারা যাবার সময় আপনি কি ডাক্তারের কাছে গেছিলেন ? মার্টিন জানতে চায়।

—না, তখন ডাক্তারের কাছে আমার যাবার মত মনের অবস্থা ছিল না। অন্যরা গেছিল।

—যাক্, সেই সুনা ড্রাইভারটা কোর্টে কি বলেছিল, তা কি আপনার এখন মনে আছে ?

—হ্যাঁ, মনে আছে, অ্যান্না মাথা নাড়ে। তবে। .

—তবে কি হয়েছিল ?

—ড্রাইভার দারুণ ভয় পেয়ে গেছিল।

—কেন ভয় পেয়েছিল ?

—কারণ ও হ্যারিকে চিনতো।

—তারপর ?

—শেষে কুলারের সাক্ষী ওকে বাঁচালো।

হঠাৎ জানলার বাইরে থেকে কে যেন অ্যান্নাকে ডাকলো। তাতে অ্যান্না একটু ইতস্তত বোধ করে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললো, এখানে বাইরের লোকের বেশীক্ষণ থাকার নিয়ম নেই। তাই…।

মার্টিন যাবার আগে জরুরী কথাটা সেরে নিতে চায়, তাই সে বলে, পুলিশ হ্যারিকে কেন সন্দেহ করছেন তা কি আপনি জানেন ?

—না, অ্যান্নার স্পষ্ট জবাব।

—তবে আমার মনে হয় মারাত্মক কোন কিছুর সঙ্গে হ্যারি জড়িয়ে ছিল এবং তাতেই পুলিশ ওকে সন্দেহ করছে।

—আপনার অনুমান মিথ্যে না হলেও হতে পারে।

—আচ্ছা, আপনি কার্টস বলে কাউকে চেনেন ?

—ঠিক মনে করতে পারছি না।

—আপনার সুবিধের জন্য বলছি, লোকটা মাথায় পরচুলা পরে।

তাহলে আপনি সেই লোকটার কথা জিজ্ঞেস করছেন।

তারপর একটু থেকে অ্যান্না আবার বলে, আমার মনে হয়, ওরা সবাই মিলে হ্যারিকে খুন করেনি তো? এমন কি সেই ডাক্তারটাকে পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয়।

আবার যেন অ্যান্না হতাশার মাঝে ভেঙে পড়ে, যাক্, ভেবে আর কি হবে! সবই তো শেষ।

—কিন্তু আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না। মার্টিনের চোয়াল সহসা শক্ত হয়ে ওঠে।

—আপনি কী করবেন?

—আমি হ্যারির মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবো!

আবার কে যেন বাইরে থেকে অ্যান্নার নাম ধরে ডাকতে মার্টিন বলে, যাক্ আমি এখন চলি। আবার হয়তো আপনার কাছে আমার আসতে হতে পারে। তা কিন্তু এখুনি আপনাকে আমি বলে রাখছি।

—একটু দাঁড়ান।

মার্টিন যেতে যেতে অ্যান্নার দিকে পিছন ফিরে তাকায়, কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ। অ্যান্না মাথা নাড়ে।

—বলুন, এখন মার্টিনের কিছুটা সংযত গলা।

—আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

—ও। আচ্ছা, আচ্ছা।

ওরা দু'জনে পাশাপাশি চলেছে। দুজনের পরনে ভারী পোশাক। অদূরে কুয়াশা। আকাশে একটু মেঘ মেঘ ভাব। পাতলা রেশমের চাদরের মত গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ চারদিক পড়ে চলেছে।

মার্টিনের বেশ শীত শীত করছে। শরীরটাকে চাঙ্গা করার জন্য কিছু একটা প্রয়োজন। হ্যারির ব্যাপারটা জানার পর কোন ক্লাবে বসে কিছু পান করতেও তার মন চাইছে না। হ্যারি যে নেই এখনো সে যেন ভাবতে পারছে না।

ক্লাবে ঢোকার চিন্তা মন থেকে বাদ দিয়ে মার্টিন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা অ্যান্নার দিকে এগিয়ে দেয়, চলবে নাকি?

—থ্যাঙ্ক ইউ। ঠিক আছে।

মার্টিনের মনের মাঝে নানা কথা ভেসে বেড়াচ্ছে। বলা বাহুল্য, তা হ্যারিকে ঘিরে। তার কথা সে কী করে ভুলবে! তাদের এই বন্ধুত্ব ভোলার নয়। নয় বলেই তো সে ইংল্যান্ড থেকে ছুটে এসেছে শুধু তার সঙ্গে একটিবার দেখা করার জন্য। ও যে তার হৃদয়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে আছে। থাকবেও চিরদিন।

তবে একটা কথা ভেবে মার্টিন আজও ব্যথিত। সে শুধু অবাক হয়ে ভাবছে, হ্যারি কেন তাকে অ্যান্নার কথা জানালো না ?

মার্টিন এখানে এসে প্রথম অ্যান্নার কথা জানতে পারলো। আগে জানতে পারলে সে নিশ্চয়ই রসিকতা করে বলতো, এখন নিশ্চয়ই বিয়ে করেছো ? আর অভিনেত্রী যখন তখন নিশ্চয়ই সাংঘাতিক সুন্দরী ? তাই এ মুহূর্তে তোমার সৌভাগ্যকে কিছুতেই ঈর্ষা না করে থাকতে পারছি না। এ কথা কিন্তু অকপটেই স্বীকার করছি।

মার্টিন সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া আকাশের দিকে ছেড়ে আরো ভাবে, সে হয়তো আরো বলতো, আলাপ না করিয়ে দাও অন্তত একটা ছবি পাঠাও, যা দেখে চোখ সার্থক করি।

তার ভাবনায় মার্টিন হয়তো আরো যোগ করতো, তা উইকে এণ্ডে প্লেজার ট্রিপে কোথায় কোথায় যাচ্ছো ? আর হানিমুনের জায়গাটাও নিশ্চয়ই এর মধ্যে ঠিক করে রেখেছো ?

মার্টিনের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। না, এ কথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়নি। পেলে হয়তো এ ঘটনা না জানার জন্য দুঃখ করতো ঠিকই, তবু এ পরিস্থিতির চেয়ে সে হাজার গুণ খুশী হতো।

—মিঃ মার্টিন, কি ভাবছেন ?

—অ্যাঁ! মার্টিন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে লজ্জিতভাবে অ্যান্নার দিকে তাকায়। কিছু বলছিলেন ?

—বলছি, কি ভাবছেন ?

—না, তেমন কিছু নয়।

—আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলছে।

—কি কথা ?

—বলবো ? কথাটা অ্যান্না বলবে কিনা ভাবছে।

—নিশ্চয়ই বলবেন ?

—আমার কাছে আপনি কিন্তু লুকোবার চেষ্টা করছেন।

—লুকোবার চেষ্টা করছি ? আমি ? আপনার কাছে ?

—হ্যাঁ, অন্তত আমার তো তাই মনে হচ্ছে, যদিও অ্যান্না তার কথার ততটা গুরুত্ব না দিয়ে বলে। তবু সে স্থির দৃষ্টিতে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—তাহলে সত্যি কথা বলবো ?

—বলবেন বই কি!

—বললে আপনি কিছু মনে করবেন নাতো ?

—না, না, মনে করার কি আছে! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি আমার এমন কিছু বলবেন না যাতে আমি অসম্মান বোধ করতে পারি। আরো

বিশেষ করে আপনি যখন হ্যারির বন্ধু ছিলেন।

—সত্যি কথা বলতে কি, হ্যারির সঙ্গে যে আপনার পরিচয় হয়েছে, ও তা আমায় আদৌও জানায়নি।

—ও, এর বেশী কিছু অ্যান্না বলে না।

—সে কথা ভেবে এখন আমি দুঃখ পাচ্ছি। অথচ হ্যারি আমায় অকপটে সব কথা বলতো। কোন কথাই সে লুকতো না। অর্থাৎ আমাদের দু'জনের মনের মাঝে কোন দরজা ছিল না।

—আপনাকে ওর জানানো উচিত ছিল। তবে একটা কথা আমি আপনাকে বলতে পারি।

—কি কথা? মার্টিন যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে অ্যান্নার দিকে তাকায়।

—আপনি যখন হ্যারির বন্ধু ছিলেন তখন আজ থেকে আপনিও আমার বন্ধু হলেন।

—মিস স্মিড! মার্টিন খুশী হলো।

—হ্যাঁ, মিঃ মার্টিন।

—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

—না: না, এতে ধন্যবাদের কি আছে! আর হ্যারির যখন আপনি বন্ধু, তখন আপনিও ওর মত ভালো হবেন। তাইতো আপনাকে আমি এত কথা না বলে থাকতে পারলাম না। আসলে……।

—আসলে কি? থামলেন কেন? বলুন?

—আসলে কি জানেন, আমি এখন বড্ড একা হয়ে পড়েছি। এই নিঃসঙ্গতা ভাঙার জন্য আমি আপনার সঙ্গে চলেছি। ঘরের মধ্যে আর থাকতে পারছি না। দম যেন আটকে আসছে, আর ঘরে একা থাকলেই হ্যারি যেন একবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। ওর নিশ্বাসের পরশ যেন আমার ওষ্ঠ প্রান্তে জেগে আমায় মাতাল করে তোলে। উঃ, সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! আমি আর সহ্য করতে পারি না। তখন আমার পাগল হয়ে ওঠার মত অবস্থা হয়। এক এক বার ভাবি, সত্যি আমি বুঝি পাগলই হয়ে যাবো।

অ্যান্নার জন্য মার্টিনের কষ্ট হয়। বলে, না, না, মিস স্মিড, ও কথা দয়া করে বলবেন না।

—বলতে আমি তো চাই না। তবু আবার না বলেও পারছি না। ওকে ভোলা যায় না। অ্যান্নার গলায় হতাশার সুর।

মার্টিন ভাবে, অ্যান্না যদি এমুহূর্তে কিছুটা কাঁদতে পারতো, তাহলে ও খানিকটা শান্তি পেত। ওর বুকের বোঝা কতকটা হাল্কা হতো। আর কাঁদতে পারছে না বলেই ওর গুমরে রয়েছে, আর মাঝে মাঝে হতাশার মতো ভেঙে পড়ছে। বেচারী।

—আসলে ও ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন।

সিগারেটটা মার্টিনের এমন বিস্বাদ লাগছে। মুখটাও যেন কি রকম তেতো লাগছে। তাই সে পুরো সিগারেটটা না খেয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা দূরে ফেলে দেয়।

অ্যান্না তা দেখেও কিছু বললো না। তবে ও বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছে। ওর মুখেও কে যেন কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। এ মুহূর্তে ঠাণ্ডা লাগলেও তেমন কাতর হচ্ছে না। একটা যেন জড় অবস্থার মধ্যে সে রয়েছে, আর নিজের জন্য যেন কিছু ভাবতেও চায় না। যেমন চলছিল তেমন নিঃশব্দে মার্টিনের সঙ্গে চলেছে।

অ্যান্নার কোন কথা বলতে ভালো লাগছে না এবং মার্টিন তাকে বিরক্ত করছে না দেখে সে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে।

তবু অ্যান্না বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে চায় না। সে কথা বলতে চায়। নইলে হ্যারি যে একবারে তার কাছের মানুষ হয়ে ওঠে। তাকে দহন করে। তবে শুধু যে তাকে দহন করে তাও নায়। তাকে জাগায়। কাঁদায়।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে মার্টিন বলে, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

—কি কথা? অ্যান্না কথা বলতে পেয়ে যেন বর্তে গেল। তার অসহ্য লাগছে। হ্যারি তাকে এক দারুণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে গেছে।

—এখন ভাবছি, কথাটা হয়তো আপনাকে না জিজ্ঞেস করাই উচিত। করলে হয়তো আপনি……।

—আমি কি? অ্যান্না মার্টিনের দিকে তাকায়।

—জিজ্ঞেস করলে হয়তো আপনি দুঃখ পাবেন।

—দুঃখ? অ্যান্না অতি কষ্টের মাঝেও একটু হাসলো। তবে হাসিটা সে বেশীক্ষণ ঠোঁটের মাঝে ধরে রাখতে পারে না। বড় করুণ সে হাসি।

—হাঁ, মার্টিনের দৃষ্টি সামনের দিকে।

অ্যান্না বিষন্ন মুখে বলে, নতুন করে আপনি আমায় আর কি দঃখ দেবেন! যা কষ্ট পাবার তা তো পেয়েছিই। তাই এখন আর কোন কথাতেই ভয় কিংবা দুঃখ পাই না। ও আমার অনেকটা এখন গা সওয়া।

একটু আগের মতন অ্যান্নার মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। তারপর সে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, বলুন, কি জিজ্ঞেস করবেন?

মার্টিন একটু ইতস্তত করে বলে, আপনি কি হ্যারিকে আগে থাকতেই চিনতেন? এ কথাটা তার জানা ভীষণ দরকার। ভাবে, যদি চেনে, তাহলে সে ওর কাছে হ্যারির ব্যাপারে অনেক খবরা-খবর পেতে পারে, যা অনেকের পক্ষে জানা সম্ভব না হতেও পারে।

—না, অ্যান্না এখনো পুরোপুরি স্বভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। কথার

মাঝে তার বেদনার সুর ঝরে পড়ে। এই একটা কথাই তার ভেতরের বেদনাটা যেন জাগিয়ে দেয়।

—ওর সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কি করে হলো।

—অর্থাৎ আমাদের প্রথম আলাপের কথা জানতে চাইছেন? অ্যান্না পথ চলতে চলতে থেমে যায়।

হঠাৎ অ্যান্না পথের মাঝে থেকে দাঁড়াতে মার্টিন একটু আপনি অস্বস্তি বোধ করে। সেই সঙ্গে সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে থাকে। ভাবে, ওকে এ কথা জিজ্ঞেস করা তার মোটেই উচিত হয়নি। ভাবে, এরকম তো কত প্রেম কাহিনী অজানা থেকে যায়। এটাও নয় যেতো। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। সত্যি, ওকে তার প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা জিজ্ঞেস করা মোটেই উচিত হয় নি। এ কথা ভেবে সে নিজেকেই বার বার দোষারোপ করতে থাকে। ছিঃ, ছিঃ।

ঢিল হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার উপায় নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে।

তবে মার্টিন লেখক মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে একটা যুৎসই ডায়লগ মনে মনে আওড়ে বলে ফেললো, অবশ্য বলতে আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।

কথাটা বলেই মার্টিনের মনে হলো। কথাটা কেমন যেন সে জলো জলো বলে ফেলেছে। তাই সে ঘাড় ফিরিয়ে অ্যান্নার দিকে তাকিয়ে ফের বললো, আমার অদম্য কৌতূহল বোধহয় আপনার ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

—না, না, আপনার এতে সংকোচের কোন করেণ নেই, কথাটা বলে অ্যান্না আবার চলতে শুরু করে। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমি ওর ব্যাপারে আপনাকে সব কিছু বলতে চাই এবং.......।

—এবং কি? মার্টিনের ঠাণ্ডা লাগছে। আবার একটা সিগারেট ধরাবে কি না ভাবছে। না, তেমন উৎসাহ বোধ করলো না। তাছাড়া, অ্যান্নাও থাকার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো না।

—আমি আপনার মধ্য দিয়ে ওকে নতুন ভাবে জানতে পেরেছি।

—হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

না, না, আমার কথায় আপনি কোন রকম ভয় পাবেন না, অ্যান্না বলে। হঠাৎ কথাটা মনে হলো বলেই বললাম।

—না, আমি ভয় পাইনি। মানে আমি বলতে চাইছিলাম, আপনার কথাগুলো ঠিক......।

—মানে ঠিক বুঝতে পারছেন না, তাই না?

—হ্যাঁ, মার্টিন হাতদুটো বুকের উপর চেপে চলতে থাকে। মাথাটাও ভার ভার লাগছে। হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে।

—আসলে আপনি হলেন গিয়ে ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই ওর ব্যাপারে

অনেক কথা হয়তো আপনার কাছে জানতে পারবো।

—নিশ্চয়ই পারবেন, মার্টিনের নাক ও কান দিয়ে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস ওর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে যেন ওকে অবশ করে দিতে চাইছে, আর গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়েই চলেছে।

—হ্যাঁ, যা কথা হচ্ছিল, হ্যারির সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় এই যোশেফস্টাড থিয়েটারে।

—এই থিয়েটারে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু……, মার্টিন কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারে না। অবশ্য এর যে একটা সঙ্গত কারণ ছিল না, তা নয় এবং কারণটা সে বেশ ভালো করেই জানতো। তাই তার এ অস্বস্তি।

—কিন্তু কি?

—ওর সিনেমা থিয়েটারের প্রতি অনুরাগ ছিল তা তো আমার জানা ছিল না, মার্টিন বলে।

—অবশ্য ওর ছিল কি না তা আমি বলতে পারবো না।

—তারপর? মার্টিনে জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

—সেদিন বোধহয় ছুটির দিন ছিল। তারিখটা ঠিক আমি মনে করতে পারছি না। তবু অ্যান্না ভাবতে থাকে। তবে ডায়রীটা দেখলে জানতে পারবো। ওটা আমার ঘরে আছে।

—ডায়রীতে সব কিছু বুঝি লিখে রাখেন?

—সব কিছু নয়।

—তবে? মার্টিন একের পর এক প্রশ্ন অ্যান্নাকে করে চলেছে, যার মধ্য দিয়ে হ্যারির ব্যাপারে সব কিছু জানতে চাইছে।

—মানে কিছু স্মরণীয় ঘটনা লিখে রাখি। এই আর কি।

—সেদিন কি ওর আগমনের ক্ষণটা আপনার কাছে সেরকম কিছু মনে হয়েছিল। মার্টিনের হাত এখনো বুকের কাছে জড়ো করা।

—তখন নাও হতেও পারে।

—এরপর? মার্টিন ফের প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেদিন সম্ভবত গুডফাইডে ছিল।

একটু থেমে অ্যান্না আবার বলতে আরম্ভ করে, সবে অভিনয় শেষ হয়েছে। ঘরে ফিরে বেশ ক্লান্ত অনুভব করছিলাম। তাই পোশাক না ছেড়েই বিছানায় গা ছেড়ে দিয়েছি।

দরজা ভেজানো। ঘরে স্বল্প পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। মাথার দিকের একটা জানলা খোলা।

থিয়েটারের একটা কাজের ছেলে এসে দরজা ঠেলে বললো, মিস স্মিড,

ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি ?

—না, অ্যান্না চোখ না খুলেই সাড়া দেয়।

—আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চাইছে।

—আমার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ।

অ্যান্নার একটা ইতস্তত জড়ানো বিরক্তি।

—তাকে উপরে নিয়ে আসবো ?

অ্যান্না সে কথার জবাব না দিয়ে বললো, এর আগে সে কি কোনোদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ?

—না. ছেলেটা মাথা নাড়ে।

অ্যান্না একটু চিন্তয়ে পড়ে যায়, তার নাম জিজ্ঞেস করেছো ?

—করেছি।

—কি নাম বলেছে ?

—হ্যারি লাইম।

—হ্যারি লাইম ? অ্যান্না আদৌ খুশী হতে পারলো না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ও নামে আমি কাউকে চিনি না। তাই অন্য কাউকে বোধ হয় ডাকছে। তোমার শুনতে ভুল হয়েছে।

—কিন্তু আমি যে নিজের কানে আপনার নাম শুনলাম।

—তবু আমি বলছি, তোমার ভুল হয়েছে।

—ভুল ? ছেলেটা কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারে না।

—হ্যাঁ, অ্যান্না যেমন বিছানায় শুয়ে আছে তেমনই বিছানায় শুয়ে থাকে। তার বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

—আমি গিয়ে আর একবার তার নাম জিজ্ঞেস করে আসবো ?

—তাই যাও।

একটু পরে ছেলেটা ফিরে এসে অ্যান্নাকে একই কথা জানায়, হ্যাঁ, উনি আপনাকেই ডাকছেন।

ঠিক আছে, আমার ঘরে নিয়ে এসো, অ্যান্নাকে বাধ্য হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো।

একটু পরে হ্যারি এলো। তারপর সেই ছেলেটা চলে যেতে হ্যারি অ্যান্নার দিকে তাকিয়ে একটা ফুলের তোড়া এগিয়ে দিয়ে হেসে বলে, আপনার আজকের অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদ।

নিজের কৃতিত্বের কথা শুনলে কেনা আনন্দ পায় ! স্বভাবত অ্যান্নাও খুশী হলো। ধন্যবাদ জানিয়ে সে হাত বাড়িয়ে ফুলের তোড়াটা নেয়। এরপর সে লজ্জিত হয়ে বলে, এই দেখুন, আপনাকে বসতে বলা হয়নি। আপনি

সোফাটায় বসুন।

—ধন্যবাদ! আপনাকে বিরক্ত করছি নাতো?

—না, না, আদৌ নয়। আদৌ নয়। আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? অ্যান্না হ্যারির দিকে তাকায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন, হ্যারি সোফায় বসে বলে।

—আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।

—কোন কথা?

—আমার অভিনয় আপনার ভালো লেগেছে?

—হ্যাঁ, হ্যারি হেসে মাথা নাড়ে।

—ধন্যবাদ! অ্যান্না খুশী হয়।

—আপনি এখন ক্লান্ত জেনেও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

অ্যান্না হ্যারির এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললো, কিন্তু আমাকে তো সবাই কাঁচা অভিনেত্রী বলে।

—ওটা কিন্তু একটু বেশী বাড়াবাড়ি। ভালো পার্ট করতে না পারলে থিয়েটার গোষ্ঠী নিশ্চয়ই আপনাকে পুষতো না।

এ কথায় অ্যান্না খুশী হলো। হাসলো। বললো, একটু কফির ব্যবস্থা করি। এখন মদ দিতে পারছি না।

—ওসব কিছু চাই না। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন তাহলেই হবে, বলে হ্যারি হাসে।

—আমি কোথাও যাচ্ছি না, আর আমি বড় দরের অভিনেত্রীও নই। তাই অন্তত একটু কফি হোক।

—অবশ্য আমার এ মুহূর্তে যে একটু পানীয় দরকার হয়ে পড়েছে, তাও আবার অস্বীকার করতে পারছি না।

এরপর কফি পান করার পালা চুকতে হ্যারি পকেটে হাত দিয়ে একটা ছোট্ট ডায়রী বার করে বলে, একটা অটোগ্রাফ দেবেন?

নিশ্চয়ই, কথাটা বলেই অ্যান্না ভাবে। একজন উঁচু দরের শিল্পী বলে এর আগে কেউ তাকে ভাবেনি। ফলে সে হ্যারির কাছে কৃতজ্ঞ।

তারপর দু'জন দুজনের পরিচয় জেনেছে। অবসর সময়ে তাদের একত্রে দেখা গেছে। এরপর তারা কখন 'আপনি' থেকে 'তুমিতে' নেমে এসেছে তা তারা বোধহয় নিজেরাও জানে না। পরে তা জানতে পেরে আনন্দের মাঝে হারিয়ে গেছে।

দু'জনে আবার চলতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে অ্যান্না তার কাহিনী শেষ করেছে। এখন কারুর মুখে কোন কথা নেই।

ওদিকে বরফ পড়া বিরামহীন গতিতে চলেছে। আকাশে এখন ততটা মেঘ

নেই। তবে উত্তরের হাওয়ায় একটা কনকনে ঠাণ্ডা ভাব।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম স্টপেজে চলে এসেছে। অ্যান্না বলে, এবার আমার ট্রামে উঠতে হবে। সে বিদায় চায়।

মার্টিন মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, যাবেন বই কি!

—আবার দেখা হলে খুশী হবো।

—আমিও, তারপর মার্টিন ইতস্তত করে কিছু কথা বলে। আপনাকে আর একটা কথা বলার ছিল।

—বলুন। এর জন্যে এত সংকোচবোধ করছেন কেন?

—না, ঠিক সংকোচ নয়। তবে আপনি অভয় দিলেই আমি কথাটা আপনাকে বলতে পারি।

—অর্থাৎ আমার অনুমতি চাইছেন?

—হ্যাঁ, মার্টিন পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়।

—কথাটা খুব সাংঘাতিক বলে মনে হচ্ছে, অ্যান্না একটা কথা ভেবে বলে।

—না, না, তেমন কিছু নয়।

—তাহলে আমার অনুমতি আপনি চাইছেন কেন?

—মানে……, এমন একটা কথা যে আপনাকে বলতে আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

—তা কথাটা কি?

—মানে আমি বলছিলাম……, মার্টিন কথাটা শেষ করতে পারে না। সে কথার মাঝে থেমে যায়।

—বলুন কি বলবেন! এত ইতস্তত করার কোন কারণ নেই, আর আমি তো আগেই বলেছি, আপনি হ্যারির বন্ধু। আপনি কখনো আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না।

—সে তো নিশ্চয়ই।

—তবে বলতে এত দ্বিধা বোধ করছেন কেন!

—আমি বলছিলাম, আপনার ডায়রীতে আমাদের আজকের কথাগুলো আপনি লিখে রাখবেন?

—না, অ্যান্নার স্পষ্ট জবাব।

—লিখে রাখবেন না?

—উহুঁ, অ্যান্নার সেই একই উত্তর।

—কারণটা যদি বলেন?

—হ্যারি মারা যাবার পর আমি আর ডায়রী লিখি না।

—ছেড়ে দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কারণ?

—এখন আমার লেখার মত কিছু নেই। আমার জীবনটা এখন নিজের কাছেই আমার মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে।

—না, না, এ কথা বলবেন না।

—বলতে তো চাই না, কিন্তু কথাগুলো ঠিক মনের মাঝে চলে আসে। তখন আমার উন্মাদ হবার মত অবস্থা হয়ে ওঠে, আর যত রাত বাড়তে থাকে তত যেন হ্যারি আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। তখন ও কথা বলতে চায়। আমি শুধু বোবা দৃষ্টি নিয়ে ওর দিয়ে তাকিয়ে থাকি! সে কী যন্ত্রনা তা বলে আপনাকে বোঝাতে পারবো না।

অ্যান্নার মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে, আমি একবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি।

কিন্তু আপনার সামনে তো একটা বিরাট জগৎ পড়ে রয়েছে, আর আপনার বয়সই বা কত! এভাবে মুষড়ে পড়লে বাকী জীবনটা কাটাবেন কী করে! মার্টিন অ্যান্নাকে বোঝাতে চায়।

—সে কথা আমি আর ভাবতে পারছি না।

—কিন্তু না ভাবলে তো চলবে না।

—আমি সব কিছু ভুলে থাকতে চাই।

—মানুষ তো তা পারে না। তার চাহিদা তো অনেক।

—চাহিদা?

—হ্যাঁ।

—আমার এখন আর চাহিদা বলতে কিছুই নেই। সব ফুরিয়ে গেছে অ্যান্নার মুখখানা করুণ হয়ে ওঠে!

—এখন আপনার মন উতলা। তাই এ কথা আপনার মনে হচ্ছে। একদিন দেখবেন… ।

—তখন সে কথা ভাবা যাবে, অ্যান্না কথার মাঝে মার্টিনকে থামিয়ে দেয়। আসলে এখন তার এসব নিয়ে আলোচনা করতে মন চাইছে না।

কথা শেষ করে অ্যান্না ভাবে, মার্টিন বোধ হয় তার কথায় কিছু মনে করলো, কিন্তু সে তো এখন অসহায়। কি করবে। আঘাত পেলেও সে ইচ্ছে করে কথার মাঝে হুল ফোটাতে চায়নি। তার মনের কথা সেই জানে! সেই তার একমাত্র নীরব সাক্ষী।

যাক্, এ কথা ভেবে অ্যান্না আর মন খারাপ করতে চাইছে না। এরপর সে সামনে এসে পড়া ট্রামের দিকে তাকিয়ে বলে, চলি।

—আবার আমাদের দেখা হবে তো?

—হবে।

—ধন্যবাদ।

—গুডবাই।

—গুডবাই।

।। ছয় ।।

পেশাদারী গোয়েন্দার চেয়ে শখের গোয়েন্দার সুবিধে অনেক বেশী। তার কাজের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম থাকে না। সত্যি কথা বলতে কি, রোলো মার্টিন একদিনে যা কাজ করেছিল, আমার লোক হলে সেই কাজ করতে দু'দিন লাগতো। তার সবচেয়ে বড় সুবিধে হলো। সে হ্যারির বন্ধু। ওতে সে সরাসরি ভেতরে থেকে এগোতে পারছিল, কিন্তু আমাদের বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকার অসুবিধে থাকে।

ডাঃ উইন্কলারের কাছে একটা কার্ড পাঠিয়েছেন মার্টিন। তাতে লেখা আছে—হ্যারি লাইমের বন্ধু।

ডাঃ উইন্কালারের বৈঠকখানা ঘরটা দেখে যেন মনে হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিকের জিনিস পত্তরে ঠাসা। দেয়ালে অনেকগুলো ক্রুশ ঝোলানো। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর। কাঠের এবং আইভরির পুরনো মূর্তিগুলো চারদিকে ছড়ানো ও বড় বড় উঁচু চেয়ারগুলো দেখে মনে হচ্ছে, ওগুলোতে গীর্জা পুরোহিতরা বসে।

ডাঃ উইন্কালার ছোট্ট খাট্টো চেহারার মানুষ। পোশাক আশাক চটকদার। পরনে কালো কোট। উঁচু কলার। তার ছোট্ট গোঁফটা টাইয়ের পটের মত দেখাচ্ছে।

সহসা ডাক্তার মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললো. আপনি কি মিঃ মার্টিন? হ্যারির বন্ধু?

—হ্যাঁ ডাক্তার, মার্টিন মাথা নাড়ে। আপনার সংগ্রহ শালাটা তো ভারী চমৎকার!

ডাক্তার তাতে খুশী হলো। তারপর বললো, মিঃ মার্টিন, আপনার আগমনের কারণটা জানতে পারি কি? কারণ আমি একজন রোগীকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

—আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করছি, মার্টিন একটু লজ্জিতভাবে বলে। আমরা দু'জনেই হ্যারির বন্ধু ছিলাম।

—'আমরা' বলতে আপনি কি আমাকেও বোঝাচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—আমাকে এ থেকে বাদ দিতে পারেন।

—কেন?

—আমি তার চিকিৎসক ছিলাম মাত্র।

—যাক্, হ্যারি আমায় এখানে ডেকেছিল তার কোন একটা ব্যাপারে সাহায্যের জন্য, কিন্তু এখানে পা দিয়ে দেখি সব শেষ।

ডাক্তার তা শুনে গাঢ় স্বরে বললো, সত্যি, হ্যারির ব্যাপারটা বড় দুঃখের।

—আমি সমস্ত কিছু জানতে চাইছি।

—কিন্তু আপনাকে জানাবার মত আমার কিছুই নেই।

—একবারে কিছুই নেই ?

—না।

—তবু আমি অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—আমি যা জানি তা আপনাকে বলছি।

—বলুন, মার্টিন আগ্রহ প্রকাশ করে।

—গাড়ি চাপার পর আমি গিয়ে দেখি, হ্যারি আর বেঁচে নেই। সে মৃত।

—আচ্ছা, ঐ ঘটনার পর তার কি জ্ঞান থাকা সম্ভব ?

– কিছুটা সময়ের জন্য থাকলেও থাকতে পারতো।

—ডাক্তার, আপনি কি নিশ্চিত, এটা একটা নিছক দুর্ঘটনা ?

—আমি সেখানে ছিলাম না, ডাক্তার দেয়াল থেকে একটা ক্রশ তুলে নেয়। আর আমার মতামত মৃত্যু কি কারণে ঘটেছিল তারই উপর সীমাবদ্ধ এবং এতে অ পনার অসন্তোষের কি কোন কারণ আছে ?

শখের গোয়েন্দার আরো একটা সুবিধে আছে যে তারা বেহিসেবী হয়ে অপ্রয়োজনীয় সত্যি কথা বলে যে কোন তত্ত্ব দাঁড় করাতে পারে।

যাক্ এদিকে ডাক্তারের উত্তরে মার্টিন বললো, পুলিশ হ্যারিকে বাজে ও সাংঘাতিক ব্যাপারে জড়িয়েছিল এবং আমার মনে হয়, এটা খুন অথবা আত্মহত্যা।

—এ ব্যাপারে আমার কোন মতামত নেই, ডাক্তার গম্ভীরভাবে জানায়।

—আচ্ছা, আপনি ডাঃ কুলার বলে কাউকে চেনেন ?

—না, ঠিক মনে করতে পারছি না।

—হ্যারির মৃত্যুর সময় সে কিন্তু ওখানে ছিল।

—তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাকে দেখেছি। আচ্ছা। সে কী পরচুলা পরে ? ডাক্তার জানতে চায়।

—না। আপনি তাকে কার্টসের সঙ্গে ভুল করছেন।

ডাক্তার কেবলমাত্র সুবেশধারী নয়। সে যথেষ্ট সচেতনও। তার বিবৃতি সংক্ষেপ করলে সেগুলো থেকে কোন রকম সন্দেহ জাগে না।

তারপর ডাক্তার বলে, সেখানে কিন্তু আরো একজন ছিল।

মার্টিন সে কথার গুরুত্ব না দিয়ে অন্য কথা বলে, আপনি কি অনেকদিন ধরে হ্যারির চিকিৎসা করে আসছিলেন ?

—হ্যাঁ, ডাক্তার মাথা নাড়ে।

—কতদিন হবে ?

—তা ধরুন, প্রায় বছর খানেক হবে।

—যাক্, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালোই হলো, আর আমি আপনার সময় নষ্ট করবো না।

—না, না, তাতে কি আছে !

—আচ্ছা, তাহলে আজ চলি, মার্টিন দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

—হুঁ, ডাক্তার আবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

॥ সাত ॥

মার্টিনের অনুসন্ধানের পর্ব এতক্ষণ পর্যন্ত চললেও কোন বিবৃতির মধ্যে সন্দেহের ছায়া খুঁজে পাইনি। যাক্, ডাক্তারের বাড়ি থেকে বেরুবার পর কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। সে ইচ্ছে করলে হোটেলে ঘুমতে পারতো, আর কুলারের সঙ্গে দেখা করলেও তার কোন রকম ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু হঠাৎ কি খেয়াল হতে সে মৃত হ্যারির ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়ায়।

মার্টিন ভাবে, হ্যারির প্রতিবেশীর কাছে যাবে, যে তাকে জানিয়ে ছিল, হ্যারি আর নেই। তার সঙ্গে কথা বলা খুবই দরকার, কিন্তু রাস্তায় পা দিয়ে মনে হলো কুলারের ওখানে গেলে তার ভালো হয়। তবে আগে কোথায় যাবে তা নিশ্চিত হবার জন্য পকেট থেকে পয়সা বার করে টস করে হ্যারির ফ্লাটের দিকে রওনা হয়।

এক সময় মার্টিন হ্যারির পাশের ফ্ল্যাটে হাজির হয় এবং বেল টিপতে হ্যারির প্রতিবেশী সেই লোকটি বেরিয়ে আসে। লোকটির চেহারা ছোট্টখাট্টো।

লোকটি হ্যারিকে দেখে হেসে বললো। ও আপনি। আপনি তো হ্যারির বন্ধু।

ইতিমধ্যে লোকটির স্ত্রী ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটি তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললো, ইলসে, এ কোন পুলিশের লোক নয়। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পার। এ হ্যারির বন্ধু। আমার কাছে এর আগে একদিন এসে ছিল।

ইলসে এ কথার কোন জবাব দিল না। তবে স্বামীর কথা খুব একটা বিশ্বাস করতে পেরেছে কিনা তা কে জানে! একবার স্বামী, আর একবার মার্টিনের দিকে তাকিয়ে ভেতরের দিকে চলে যায়। তবে তার যাবার মধ্যে একটা অশান্ত ভাব ফুটে উঠেছে, যেটা মার্টিনের চোখেও ধরা পড়েছে।

লোকটি এবার মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, আমি সে দুর্ঘটনাটা দেখেছি।

মার্টিন পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি কি করে বুঝলেন (২) ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল?

—তার একটা কারণ আছে।

—আমি সেই কারণটা জানতে চাই।

—ভেতরে আসুন বলছি।

এরপর মার্টিন ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে লোকটি তাকে বেশ খাতির করে বসিয়ে ওর দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়, সিগারেট ধরান।

মার্টিনের সিগারেট নেবার ইচ্ছে ছিল না। তবু সে একটা পেল, ধন্যবাদ! এটা নিছকই ভদ্রতা। এরপর সে সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলে। এবার বলুন। এটা আমার জানা দরকার।

—হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষার শব্দ হতে জানালার কাছে আমি এক রকম ছুটে যাই! গিয়ে দেখি হ্যারিকে ধরাধরি করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছে।

—আচ্ছা, আপনি কি এ ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছেন?

—না, লোকটি মাথা নাড়ে।

—কেন?

—কারণ পুলিশের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাই না। তাছাড়া,…।

—তা ছাড়া কি?

—আমি তো সবটা জানি না।

—আচ্ছা, দুর্ঘটনার পরই কি মনে হচ্ছিল, হ্যারি খুব কষ্ট পাচ্ছে?

—উহুঁ!

—এ কথা কেন বলছেন?

—কারণ ও সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।

—আপনি কি একজন ডাক্তার?

—না।

—তাহলে ওটা কি করে বুঝলেন?

—কারণ আমি মরা রাখা ঘরের হেড ক্লার্ক। আমি জানলা থেকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছি যে, ও মারা গেছে। বেঁচে নেই।

মার্টিন লোকটির কথার প্রতিবাদ করে বলে, কিন্তু অনেকে বলেছে যে, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়নি।

—মৃত্যুকে আমি যতটা চিনি, তারা ততটা চেনে না। আমার নাম হেরচক। আমার অভিজ্ঞতার কথা আশে পাশের লোককে জিজ্ঞেস করবেন। তাহলেই জানতে পারবেন যে আমার কথাটা মিথ্যে কি না।

—না, না, আমি আপনার কথা অস্বীকার করছি না, মার্টিন একটু ইতস্তত করে বলে। তবে আমি খবর নিয়ে জেনেছি, হ্যারি ডাক্তার আসার আগেই মারা গেছে।

—না, সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে। হেরচক তার কথায় বেশ জোর দিয়ে বলে। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন।

মার্টিন এ ব্যাপারে আর কোন কথায় না গিয়ে বলে, তবে মিঃ হেরচক,

আপনার কোর্টে সাক্ষী দেওয়া উচিত ছিল।

—কিন্তু মিঃ মার্টিন, পুলিশের ব্যাপারে প্রত্যেকের সাবধান হওয়া উচিত। কেই বা যেচে পুলিশের কাছে যেতে চায়! তাছাড়া, আমি তো একা প্রত্যক্ষদর্শী নই।

—আর কে কে ছিল?

—তিনজনকে দেখেছি, হ্যারির দেহ বয়ে আনছে।

—হ্যাঁ, তা আমি জানি, তাদের মধ্যে একজন ড্রাইভার ছিল।

—না, ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামেনি, হেরচক বাধা দিয়ে বলে। ও গাড়িতেই বসে ছিল।

কথাটা বলে মার্টিন একটু চমকে ওঠে, আপনি সেই লোকগুলোর একটু বর্ণনা দিতে পারেন?

হেরচক ভালো করে তাদের লক্ষ্য করেনি, আর ঐ রকম একটা অপ্রীতিকর ঘটনার পর সে জানলা বন্ধ করে দিয়েছিল, কারণ এ রকম একটা ঘটনার সঙ্গে সে নিজেকে আদৌ জড়াতে চায়নি।

তাই হেরচক একটু কাঁচু মাচু হয়ে বলে, সত্যিকথা বলতে কি, আমার সাক্ষী দেবার কিছুই নেই।

মার্টিন মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ভাবে, তাহলে সাক্ষী দেবার মত কেউই নেই। তবুও তার মনে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা একটা খুন। অথচ এরা কেউই তাকে হ্যারির মৃত্যুর সঠিক সময় পর্যন্ত জানালো না। এখন পর্যন্ত সে হ্যারির দু'জন বন্ধুর সন্ধান পেয়েছে, যারা তাকে টাকা এবং দেশের ফিরতি প্লেনের টিকিট কেটে দিতে চেয়েছে। তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তি কে?

তারপর মার্টিন হেরচককে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আপনি কি হ্যারিকে ফ্ল্যাট থেকে বেরুতে দেখেছেন?

—না, হেরচক মাথা নাড়ে। তা আমি দেখিনি।

—কোন রকম চিৎকার শুনেছিলেন?

—না। শুধু একটা ব্রেক কষার শব্দ কানে ভেসে এসেছিল।

এসব শোনার পর মার্টিন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, কার্টস, কুলার এবং সেই ড্রাইভার ছাড়া জানা যাবে না হ্যারি খুন হয়েছিল কিনা।

মার্টিন আবার কাজের কথায় ফিরে আসে, সে হেরচককে জিজ্ঞেস করে, হ্যারির ফ্ল্যাটের চাবি কার কাছে থাকে?

—আমার কাছে আছে।

—আমি কি একবার হ্যারির ফ্ল্যাটটা দেখতে পারি?

—নিশ্চয়ই, এরপর হেরচক তার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকে।

—যাই বলে, ইল্‌সে কিচেন থেকে বেরিয়ে আসে।

—একবার হ্যারির ফ্ল্যাটের চাবিটা আনো তো ?

—আনছি, ইলসে ঠিক খুশী নয়।

—একটু পরে ইলসে চাবিটা এনে স্বামীর হাতে দেয়, এই নাও।

হেরচক ইলসেকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাবি দিয়ে হ্যারির ফ্ল্যাটটা খোলে। বৈঠকখানা ঘরটা ছোট। সেই ঘরে হ্যারির টার্কি'স সিগারেটের গন্ধ যেন এখনো হাওয়ায় ভাসছে।

তারপর ওরা শোবার ঘরে এলো। বিছানায় নিভাঁজ চাদর পাতা। ঘরের সব কিছুই ঝকঝকে তকতকে। একটু ধুলোও কোথাও নেই। এমন কি বাথরুমে পর্যন্ত একটা ব্লেড পড়ে নেই, যা দেখে ক'দিন আগেও মনে হতে পারে যে, হ্যারি এখানে ছিল।

মার্টিন চারদিকে তাকিয়ে বলে, হ্যারির রুচি জ্ঞানের সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর ছিল।

—কি ভেবে আপনি একথা বললেন।

—ফ্ল্যাটের কোথাও এতটুকু ময়লা নেই।

মার্টিনের ভুল ভেঙে হেরচক বলে,ইলসে এই ফ্যাটের সমস্ত কিছু পরিষ্কার করেছে। আসলে হ্যারি কিন্তু এতটা গোছানো লোক ছিল না। আর পুরুষ মানুষরা তা হয়ও না।

এবার মার্টিন জানতে চায়, ঘরে তেমন কোন কাগজ পত্তর ছিল ?

কথা প্রসঙ্গে হেরচক জানায়, হ্যারির ব্রিফকেস ও কাগজপত্তর ফেলার ঝুড়িটা তার এক বন্ধু নিয়ে গেছে।

—বন্ধু নিয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—কে সে বন্ধু ?

—ঐ যে পরচুলা পরা লোকটা।

—ঠিক মনে আছে তো ?

—হ্যাঁ।

—আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, হ্যারিকে খুন করা হয়েছে।

—খুন ?

—হ্যাঁ।

সহসা হেরচক মার্টিনের উপর চড়াও হয়ে বলে, এসব অর্থহীন কথা বললে আমি আপনাকে এখানে কিছুতেই নিয়ে আসতাম না।

—আপনি আমায় অপমান করুণ আর যাই করুণ, আপনার সাক্ষী কিন্তু খুব কাজে লাগতো।

—আমার কোন কিছু বলার নেই, হেরচক এড়িয়ে যায়।

—নেই ?

—না, কারণ আমি কিছুই দেখিনি। আপনি এবার দয়া করে আসুন। বলেই সে হেরচক দরজার দিকে এগিয়ে চললো। অর্থাৎ তাকে এড়াতে পারলে যেন সে বাঁচে।

হেরচক মার্টিনকে বিদায় করার আগে বলে, এসব ব্যাপারে আমায় কিন্তু কিছুতেই জড়াবেন না।

—সেটা পরে দেখা যাবে।

—ও কাজ করবেন না।

—আপনি দয়া করে ব্যাপারটা একটু বুঝুন।

—আমার যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে।

—যায়নি। তাহলে আপনাকে এত করে বলতাম না।

—আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

—মিঃ হেরচক !

—বললাম তো ওর বেশী আমি কিছু জানি না।

—আপনি তো চান সত্য প্রকাশ হোক।

—অসত্য কিছু থাকলে তা তো প্রকাশ হবে। ওটা একটা নিছক দুর্ঘটনা তা তো আপনাকে আগেই বলেছি। তবু আপনি জেদ ধরছেন। ফলে ও ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।

—কিন্তু আমার আছে।

—তাতে আমি বাধা দিতে চাই না।

—মুখে বলছেন ঠিকই, কিন্তু সাহায্য তো করতে চাইছেন না।

—এবার আমায় বেরুতে হবে।

—অর্থাৎ আমায় যেতে বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে, চলি। আবার হয়তো দেখা হবে।

—না দেখা হলেই খুশী হবো।

—কিন্তু সেটা যে আমার অখুশী হবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হেরচক এ কথার কোন জবাব দিল না। গুম হয়ে রইলো।

—বাই ! সি ইউ।

এরপর মার্টিন নির্দিষ্ট হোটেলে ফিরে এলো। রিসেপসনের পাশ দিয়ে যাবার সময় হোটেলের কর্মরত একজন কর্মচারী বললো, স্যার, আপনার নামে একটা চিঠি আছে।

—চিঠি ? মার্টিন ঘুরে তাকায়।

—হ্যাঁ।

—কে দিয়ে গেছে ?

—তা দেখিনি।

—তবে চিঠিটা কোথায় পেলেন ?

—লেটার বক্সে পড়েছিল।

—কই দেখি ?

—এই নিন।

মার্টিন হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেয়, থ্যাঙ্ক ইউ !

মার্টিন চিঠিটা খোলে। ক্লাবিনের চিঠি। সে লিখেছে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানসূচি আপনার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা দরকার এবং আপনার সম্মানার্থে আগামী সপ্তাহে একটা ককটেল পার্টির আয়োজন করছি, আর আজকের অনুষ্ঠানে আপনি নিশ্চয়ই হাজির হচ্ছেন ? সেই মত আপনার হোটেলে আটটা পনেরো মিনিটে গাড়ি যাবে।

মার্টিন ক্লাবিনের চিঠি পড়ে কোন আগ্রহবোধ করলো না এবং তার নিজের ঘরে ফিরে বিছানায় দেহের ভার ছেড়ে দেয়।

॥ আট ॥

দু পেগ মদ খাবার পর রোলো মার্টিনের মেয়ে মানুষের কথা মনে পড়ে যায়। আবার তিন পেগের পর কোন এক সহজলভ্যা মেয়ের কথা ভেবে সেদিকে পা বাড়াতে চায়। কুলার আজ যদি তাকে তিন পেগ মদ না খাওয়াতো তাহলে সে হয়তো অ্যান্নার বাড়ির দিকে পা বাড়াতো না। তবে এর আগে সে কোথায় গেছিল সে প্রসঙ্গে আসা যাক্।

প্রথম কুলারের ফ্ল্যাটে যখন মার্টিন পেঁছিলো তখন পাঁচটা বাজে। ফ্ল্যাটের নিচেই একটা আইসক্রিমের দোকান এবং এটা আমেরিকার অঞ্চলে। ঢোকার মুখে সে একরাশ হাস্যরত পুরুষ মহিলাকে দেখলো। তারপর হাসিকে সে পিছনে ফেলে কুলারের ফ্ল্যাটের দিকে সে এগিয়ে যায়।

'হ্যারির বন্ধু' এই কথাটা যেন মার্টিনের সর্বত্র ভেতরে প্রবেশ করার একটা পাসপোর্ট। তারপর সে কুলারের ফ্ল্যাটের কলিং বেল পুশ করে।

একটু পরে কুলার এসে ফ্ল্যাটের দরজা খোলে এবং মার্টিনকে দেখে উষ্ণ আহবান জানিয়ে বলে, হ্যারি যখন আমার বন্ধু ছিল তখন আপনিও আমার একজন দোস্ত। তাছাড়া, আপনাকে আমি চিনি। ওর মুখে একটা হাসির রেশ।

—আপনি আমাকে চেনেন? মার্টিনের খানিকটা অবাক হবার পালা। তবে সে ভেতরে যথেষ্ট সাবধান।

—হ্যাঁ।

—নিশ্চয়ই হ্যারির কাছে আমার কথা শুনেছেন?

—উঁহুঁ, কুলার মাথা নাড়ে।

—তবে?

—আমি পশ্চিমী নভেলের খুব ভক্ত। তাহলেই বুঝতে পারছেন।

মার্টিন অন্য সময় এ প্রসঙ্গে হয়তো খুশী হতো, কিন্তু এখন তেমন আনন্দবোধ করলো না! এখন তার কাছে সমস্ত যেন জ্বালা জ্বালা ঠেকছে। আসলে সে এখন হ্যারির মৃত্যুটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

মার্টিন সরাসরি একবারে কাজের কথায় না এসে বললো, আপনি আমার নভেল পড়েছেন তারজন্য আমি আনন্দিত এবং ধন্য।

—না। না। ও কথা বলবেন না।

—সত্যি কথা বললে কিন্তু তাই দাঁড়ায়।

—আমাকে একজন সমঝদার পাঠক বলে ভাববেন না।

—এবার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

—বলুন।

—হ্যারির মৃত্যুর সময় আপনি তো এখানে ছিলেন ?

—উঃ, সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য ! কুলারের মুখখানা করুণ হয়ে ওঠে। আর ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, তখন আমি আবার হ্যারির কাছেই যাচ্ছিলাম।

—দুর্ঘটনার কারণটা কি ঘটেছিল ?

—হঠাৎ হ্যারি আমায় দেখতে পেয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হতে যায়, ঠিক তখন একটা গাড়ি দৈত্যের মত ছুটে এসে তাকে চিরতরের জন্য স্তব্দ করে দেয়। কুলারের চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে।

—তখন গাড়ির ড্রাইভার ব্রেক করেনি।

—করেছিল, কিন্তু তখন সব শেষ।

এরপর কুলার একটু স্বাভাবিক হয়ে বলে, এবার একটু পান করা যাক্। হ্যারির এই সব কথা ভাবলে আমায় বাধ্য হয়ে তখন মদের আশ্রয় নিতে হয়। নইলে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

—চলতে পারে, মার্টিন সায় জানায়।

একটু পরে মার্টিন ফের বলে, আচ্ছা মিঃ কুলার, ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে আর কেউ কি ছিল ?

কুলার সবে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। সে থেমে যায়। মদ খাওয়া তার হয় না।

কুলার মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, মিঃ মার্টিন, আপনি কোন লোকটার কথা বলছেন ?

—আমি শুনেছি, আর কেউ ছিল।

—আমি জানি না।

—জানেন না ?

—না। এ সব কথা আপনি কোত্থেকে শুনেছেন ! কথা শেষ করে কুলার মদের গ্লাসে চুমুক দেয়।

একটু থেমে কুলার ফের বলে, আপনি ইচ্ছে করলে পুলিশ রিপোর্ট থেকে সব কিছু জানতে পারেন।

—তা অবশ্য জানা যায়। তবু আমি আপনার কাছে শুনতে চাইছিলাম। মার্টিন মদের গ্লাসে চুমুক দেয়।

—তবে আপনাকে আমি বলছি, তখন আমি, কার্টস এবং ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না। আপনি সম্ভবত ডাক্তারের কথা বলছেন। কুলার মার্টিনের দিকে তাকায়।

এ কথায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে মার্টিন বলে, আমি হ্যারির পাশের ফ্ল্যাটের

ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, যে, ড্রাইভার ছাড়া আরো তিনজন লোক ছিল। এবং…।

মার্টিন কথাটা ইচ্ছে করে শেষ করে না। সে কথার মাঝে থেমে যায়। ভাবে, এরা সবাই হ্যারির ব্যাপারটা চেপে যেতে চাইছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে এবং সেটা তাকে যে করে হোক বার করতেই হবে।

—এবং কি?

—তার মধ্যে ডাক্তার ছিল না। লোকটি এসব জানলা দিয়ে দেখেছে, মার্টিন কুলারকে জানায়।

—জানলা দিয়ে দেখেছে?

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা নাড়ে এবং সন্দেহের দৃষ্টি নিয়ে কুলারকে দেখতে থাকে।

—দেখতে তার ভুলও হতে পারে।

— হতে যে পারে না তা বলছি না। তবে…।

—তবে কী? কুলার একটু ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে।

—হয়তো দেখতে তার ভুল হয়নি।

—আচ্ছা, এবার আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

—কি কথার?

—সে কি কোর্টে সাক্ষী দিয়েছিল?

—না।

—কেন?

—সে পুলিশের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চায়নি।

—আসলে ভালো করে দেখলে তবে তো সাক্ষী দেবে! আপনি ওর কাছে গেছেন, যা হোক মনগড়া আপনাকে কিছু একটা বলে দিয়েছে।

—মনগড়া? মার্টিন এটা ঠিক জানতে পারে না!

—হ্যাঁ, কুলার রাগতভাবে কথা বলে। আপনি এ সব ইউরোপীয়ান-গুলোকে কোনদিন পাক্কা নাগরিক করে তুলতে পারবেন না।

—এ কথা কেন বলছেন?

—ওর কোর্টে সাক্ষী দেওয়া একান্ত উচিত ছিল।

—অবশ্য এ ব্যাপারে আমিও আপনার সঙ্গে একমত।

—দুর্ঘটনার পর রিপোর্ট নানাভাবে হতে পারে! তার সবগুলোই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে।

তারপর কুলার মার্টিনের দিকে একটু ঝুঁকে বলে, ও আর কি দেখেছে? তার গলার স্বর একটু অস্বাভাবিক শোনায়।

—না, আর কিছু দেখেনি, মার্টিন কথা বলার মাঝে কুলারকে লক্ষ্য করছে। তবে সে বলেছে যে, হ্যারিকে যখন বাড়ির দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল

তখন সে আর বেঁচে নেই।

কুলার কথাগুলো চাপা দেবার জন্য বা প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললো, হ্যাঁ, প্রায় ঠিকই বলেছে।

তারপর কুলার মদের বোতলটা খুলে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনাকে আর একটু মদ দেবো?

—না, আর দরকার নেই।

—জানেন, হ্যারিকে আমি খুব ভালো বাসতাম, কুলার মদের বোতলটা টেবিলে রাখে। তাই দয়া করে ওর প্রসঙ্গে আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমার বড় কষ্ট হয়।

—আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাবো।

—কি কথা? কুলার মদের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখে।

—আপনি অ্যান্না স্মিডকে চেনেন?

—হ্যারির সেই প্রেমিকা?

—হ্যাঁ।

—তাকে আমি একবারের জন্য দেখেছিলাম।

—আচ্ছা, আচ্ছা।

—ওর কাগজ পত্তর আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম।

—বন্ধুর প্রেমিকার জন্য উচিত কর্তব্য পালন করেছেন? তবে এর কারণটা যদি বলেন তো খুশী হবো।

—আসলে অ্যান্না ছিল হাঙ্গেরীয়ান, আর ওর বাবা ছিল জার্মান। ওসব সময় রাশিয়ানদের ভয় করতো।

ইতিমধ্যে টেলিফোন বেজে ওঠে। 'সরি' বলে কুলার চেয়ার ছেড়ে উঠে ফোনটা ধরে এবং সামান্য কিছু কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখে।

কুলার আবার চেয়ারে ফিরে এলে মার্টিন বলে, পুলিশ হ্যারির ব্যাপারে যে বাজে ব্যাপারটা বলছে, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

—আমি মনে করি না যে, সে রকম কিছু থাকতে পারে। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে হ্যারি খুব সজাগ ছিল।

—কিন্তু পুলিশ যে বলছে, হ্যারি বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলেও থাকতে পারে, মার্টিন জানায়।

—এ প্রসঙ্গে মন্তব্য অবান্তর।

—চলি, মার্টিন এ কথার পর আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

—আবার আসবেন।

—ধন্যবাদ!

মার্টিন রাস্তায় বেরিয়ে এসে ভাবে, সবাই এত সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছে, ফলে

সে সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে না। যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তার উপর দুর্ঘটনার সময় সে এখানে ছিল না। এরা তাকে সাহায্য না করলে খড়ের গাদার মধ্যে পিন খোঁজার মত অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। তবু তাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। হ্যারির আততায়ীকে সে খুঁজে বার করবেই। নইলে সে মরমে মরে থাকবে। তার বিবেকের কাছেই বা সে কী জবাব দেবে! না, তার উত্তর দেবার কিছুই থাকবে না।

॥ নয় ॥

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে! বাড়িগুলোকে দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। মার্টিন একটা নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে। তার চারদিকে ধ্বংস স্তূপ। সে বেশ কিছুটা এগোতে একটা মিলিটারী থানা তার নজরে এলো! চারজনের একটা আন্তর্জাতিক মিলিটারী দল তখন জীপে উঠছে।

কুলারের দেওয়া তিন পেগ মদ খাওয়ার পর মার্টিনের একজন সহজলোভ্যা মেয়ের একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। আমষ্টারডাম এবং প্যারিসের মেয়েদের কথা তার মনে পড়ে।

তবু মার্টিন নিজেকে সংযত করে এবং ভিয়েনার একমাত্র পরিচিতা সেই অ্যান্না শ্মিডের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

রাস্তায় বিজ্ঞাপন দেখে মার্টিন বুঝতে পারে, আজ যোসেফস্টাডে কোন অভিনয় নেই। ফলে সে নিশ্চিত মনে অ্যান্নার ফ্লাটের দিকে এগোতো থাকে। বেরিয়ে না গেলে ওর সঙ্গে তার দেখা হবে।

মার্টিন অ্যান্নার ফ্লাটে হাজির হয়ে কলিং বেল বাজায়। এখনো তার মদের নেশা কাটেনি। তবে ঠাণ্ডায় মদটা ভালই লাগছে। তবে মাথাটা সামান্য ঝিমঝিম করছে। হয়তো ঠাণ্ডায় কিংবা মদের নেশায়।

মার্টিন আর একবার কলিং বেল পুষ করতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই অ্যান্না ফ্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে আসে।

মার্টিন অ্যান্নাকে দেখে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনার ফ্যাটের দরজা খোলা দেখে ভাবলাম আপনি আছেন। তাই চলে এলাম।

—তা কোথায় যাচ্ছিলেন! অ্যান্না কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে। এতো শহরের একেবারে শেষ প্রান্ত।

গল্প লিখিয়ে মার্টিন তার উপন্যাসে যেমন কথার মালা গাঁথে, তেমন সামান্যতম বিচলিতবোধ না করে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, কুলারের বাড়িতে একটু বেশী মাত্রায় ড্রিংক করে ফেলেছি। তাই এখন পথে পথে ঘুরছিলাম।

—ভেতরে আসুন অ্যান্না আহ্বান জানায়।

—ধন্যবাদ মার্টিন মাথাটা সামান্য নামায়।

অ্যান্না এবার ভদ্রতার সঙ্গে কিছুটা লজ্জিতভাবে বলে, এখন কিন্তু চা ছাড়া অন্য কিছু পানীয় খাওয়াতে পারছি না। তার প্রথমেই মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

—না, না, এর জন্য আপনি মোটেই বিব্রত বোধ করবেন না, এরপর টেবিলের উপর একটা ফেলা বইয়ের দিকে মার্টিনের দৃষ্টি গেল। সে অ্যান্নার দিকে তাকিয়ে একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললো। হট করে হাজির হয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি নাতো?

—উহুঁ, অ্যান্নার সংক্ষিপ্ত জবাব।

—আচ্ছা, আমি এখানে কিছুক্ষণের জন্য বসতে পারি? মার্টিন একটু কুণ্ঠার সঙ্গে জানতে চায়।

—পারেন বই কী! অ্যান্না এতটুকু দ্বিধা না করে সাথে সাথে জবাব দেয়। তারপর একটু চুপ করে সে আবার বলে। আপনার বেল বাজানো শুনে আজ বার বার হ্যারির কথা মনে পড়ছে। ও ঠিক এমন করে আমার কাছে আসতো তাই দয়া করে চুপ করে না থেকে কথা বলে যান।

বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাইরে স্বল্প চাঁদের আলো ফুটে উঠেছে। মৃদু বাতাস বইছে।

এ মুহূর্তে অ্যান্না ভাবছে, সে যেন হ্যারির উপস্থিতি টের পাচ্ছে তারপর সে জানে না কখন মার্টিনের দিকে এগিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে মার্টিন ঠাণ্ডার জন্য জানালার পর্দাটা ফেলতে গেছিল! হঠাৎ সে টের পায়। অ্যান্নার হাতটা তার হাতের মধ্যে চলে এসেছে।

জানলার পর্দা ফেলে মার্টিন অ্যান্নার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে। অ্যান্না, এ সময় হ্যারি কি করতো?

—ও যেন কিছুই ভ্রূক্ষেপ করতো না। তার পুরনো গানই তাকে প্রেরণা যোগাতো। অ্যান্না সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে।

এ কথার পর মার্টিন ভাবে, কি করে এ মুহূর্তে অ্যান্নাকে খুশী করা যায়। হ্যারির একটা পুরনো প্রিয় গান তার মনে পড়ে যায়। তার গানের গলা নেই। শিস দিয়ে সেই গান সে গাইতে থাকে।

গানের শিস শুনেই অ্যান্না প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে মার্টিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

তারপর মার্টিন একটু দুঃখের সঙ্গে বলে, আমরা হ্যারির কথা ভেবে আর কি করবো! ও তো আমাদের মায়া কাটিয়ে চিরতরের জন্য চলে গেছে। এলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। আর এসে এ কথা বলতে হলো—হ্যারি নেই।

অ্যান্না ওর জবাবে বললো, তা আমি জানি, কিন্তু আমিও তো মানুষ। আমার একটা অবলম্বন দরকার।

—পৃথিবীর নিয়ম অনুযায়ী তুমিও একদিন ভুলে যাবে।

—ভুলে যাবো?

—হ্যাঁ।

—আমি হ্যারিকে?

—হুঁ।

—এ কথা তুমি বলতে পারলে ?

—এটা তো জগতের নিয়ম। তার ব্যতিক্রম হবে কি করে !

—ব্যতিক্রম হ্যারির জন্য আমায় হতেই হবে।

—হলে ভালো, কিন্তু……, কথাটা মার্টিন ইচ্ছে করেই, শেষ করে না। সে কথার মাঝে থেমে যায়।

—কিন্তু কি ?

—একদিন তুমিও সব ভুলে গিয়ে প্রেমে পড়বে ?

—প্রেমে পড়বো ? আমি ? অ্যান্না সামান্য চেঁচিয়ে কথা বলে।

—আমার তো তাই মনে হয়। জানবে।

—তোমার কথা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না।

মার্টিন সামান্য হাসে, পরে আবার ঘর বাঁধার রঙীন নেশায় বিভোর হয়ে উঠবে।

—না, না, এসব আমি চাই না, অ্যান্না আপত্তি জানিয়ে বলে। বুঝতে পারলে আমি কেন এ কথা বলেছি।

মার্টিন এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে জানলার কাছ থেকে ফিরে এসে ডিভানে বসে। যখন সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল তখন ছিল সে হ্যারির বন্ধু এবং তার প্রেমিকাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, কিন্তু এখন অবস্থা অন্য রকম।

মার্টিনের মনে হয়, সে অ্যান্নার প্রেমে পড়েছে। তবু সে তার অতীতের কথা ভুলতে পারছে না। যাক, এখন সে ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গত দু'দিনের কথা অ্যান্নাকে শোনাতে থাকে।

তারপর মার্টিন বললো হেরচক এর মধ্যে থাকতে চায় না। ফলে তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি জালে জড়াতে পারছি না।

এরপর সব কথা শোনার পর অ্যান্না মন্তব্য করে, কার্টস এবং কুলার দু'জনেই মিথ্যে কথা বলেছে।

—সম্ভবত তারা তৃতীয় বন্ধুর অসুবিধে মেটাতে চাইছে না। তবে সে ধরা পড়লে এরাও হয়তো রেহাই পাবে না এবং পুলিশের কাছে তখন হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে পড়বে, আর ওরা তো আমায় ওদের বাড়ি থেকে তাড়াতে পারলে বাঁচে।

তারপর মার্টিন অসহায় ভাবে বলে, এখন আমি কি করবো। হেরচকের কাছে আবার যাবো ?

—তাই চলো।

—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে ?

—হ্যাঁ।

—গেলে সত্যি ভাল হবে।

—আমার ধারণা, হেরচক এবং তার স্ত্রী আমায় সরাসরি হয়তো 'না' বলতে পারবে না।

কথা শেষ করে দু'জনই রাস্তায় বেরিয়ে এসে হেরচকের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ এখনো পড়ে চলেছে। হাওয়ায় একটা কনকনে ঠাণ্ডা ভাব।

খানিকটা যাবার পর অ্যান্না ঘাড় ফিরিয়ে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, হেরচকের ফ্ল্যাটটা কি এখান থেকে খুব দূরে ?

—না, খুব একটা দূরে নয়, মার্টিন অ্যান্নার দিকে তাকায়। মার্টিন এবার রাস্তার অপর পারের দিকে তাকায়। ওখানে কিছু লোক জড় হয়ে আছে। তাই সে বলে, ব্যাপারটা কি দেখতে হচ্ছে।

একটু এগিয়ে মার্টিন চেঁচিয়ে বলে, আরে! এ যে দেখছি, হেরচকের বাড়ির তলায় লোকেরা জড় হয়ে আছে।

—ও, এটাই হেরচকের বাড়ি ?

—হ্যাঁ। লোকেরা আবার এখানে কেন ভিড় করেছে। তবে মার্টিন খারাপ কিছু ভাবতে পারছে না।

মার্টিন সহসা অ্যান্নাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কি মনে হয়, এটা কোন রাজনৈতিক দলের মিছিল ?

অ্যান্না সে কথার জবাব না দিয়ে পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি হেরচকের কথা আর কাকে বলেছো ?

—কয়েকজনকে বলেছি।

—তারা কারা ?

—তুমি আর কুলার ছাড়া কাউকে বলিনি।

—আমার মনে হয়······অ্যান্না কথা শেষ না করে মার্টিনকে তার দিকে ফিরিয়ে বলে। চলো, আমরা ফিরে যাই।

—ফিরে যাবো ?

—হ্যাঁ।

—একটা জরুরী কাজে এসেছি ফিরে গেলেই হলো। পাগল হয়েছো!

—তুমি যাবে না ?

—উহুঁ, মার্টিন সজোরে মাথা দোলায়। আরো যেখানে হেরচকের বাড়ির তলায় ভিড় দেখছি। তুমিই বলো, ব্যাপারটা না দেখে কখনো এভাবে চলে যাওয়া যায় ?

—তাহলে আমি ফিরে যাই।

—তুমি চলে যাবে ? মার্টিন অবাক হয়।

—হ্যাঁ।

কিন্তু একটু আগে তুমিই তো হেরচকের বাড়িতে আসতে চাইছিলে।

—তা আমি অস্বীকার করছি না।

—তাহলে চলে যেতে চাইছো কেন?

—ওখানে কেন লোকগুলো জড় হয়েছে?

—সেটাই তো আমি জানতে চাই।

—ভিড় আমার একভাবে ভালো লাগে।

—সে কী! অথচ তুমি তো একগাদা দর্শকের সামনে অভিনয় করো।

—সেটা আলাদা ব্যাপার।

তারপর অ্যান্নাকে আর পেড়াপেড়ি না করে মার্টিন একই রাশিরাশি বরফ মাড়িয়ে নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে যায়।

ভিড়টা রাজনৈতিক দলের নয়। এখানে কেউ বক্তৃতা দিচ্ছে না! মার্টিন ওখানে হাজির হতে অনেকে তার দিকে তাকায়।

জনতার মধ্যে থেকে মার্টিন একজনকে দেখে বলে উঠলেন আপনিও কি পুলিশের লোক?

—না।

—কিন্তু পুলিশ এখানে কি করছে?

—তারা তো আজ সারাদিন ধরে এ বাড়িতে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

—ও। তা আপনারা এখানে কার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন?

—লোকটাকে বাইরে বার করলে একবার দেখতে পাই।

—কাকে?

—হেরচককে।

হেরচকের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে মার্টিনের মনে পড়ে যায়, হ্যারির ব্যাপারে সে সাক্ষী দেয়নি। আর সেইজন্যই কি পুলিশ তার কাছে এসেছে?

তারপর মার্টিন লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তা হেরচক কি করেছে?

—তা আমরা কেউ জানি না।

—তবে পুলিশ এরকমভাবে আসছে যাচ্ছে কেন?

—হেরচক খুন হয়েছে, না আত্মহত্যা করেছে, সেইজন্য।

—হেরচক নেই? মার্টিন যেন একরাশ বিস্ময় এবং হতাশার মাঝে ডুবে গেল। আর ভাবতে থাকে, এই তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে হেরচক নিশ্চয়ই কিছু জানতো এবং তারা তা টের পেয়ে হেরচককে সরিয়ে দিয়েছে। তাহলে কি হ্যারির মৃত্যু রহস্য রাতের অন্ধকারের কালো স্তরের মাঝেই হারিয়ে যাবে। আর তার চেষ্টা সব বৃথাই যাবে?

ইতিমধ্যে একটা বাচ্চা ছেলে সেই লোকটার জামা ধরে টানতে থাকে, বাবা, ফ্রাঙ্ক ও কচ কাঁদছে।

ছেলেটার বাবা বললো, তুমি কি শুধু তাই দেখলে?

—না বাবা, ছেলেটা বললো। পুলিশ ফ্রাঙ্ক ও চককে আরো জিজ্ঞেস করছে, সেই বিদেশীটাকে দেখতে কেমন।

ছেলেটার কথায় বাবা হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে। তোমার ধারণা হয়তো ঠিক, আর পুলিশও এটাকে খুন বলে ধরে নেবে মনে হয়। নইলে হেরচক নিশ্চয়ই নিজের গলা ওভাবে কখনো কাটতে যাবে না।

এরপর ছেলেটা বাবার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মার্টিনের দিকে তাকায়! মার্টিনকে ভালো করে দেখে ফের বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, বাবা, ঐ লোকটাও তো বিদেশী।

ছেলের কথা শুনে লোকটা হাসে এবং মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার ছেলে বলছে, আপনি বিদেশী।

মার্টিন এর কোন জবাব দিল না। তবে এ ধরনের কথায় সে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

—পুলিশ নাকি আপনাকে খুঁজছে।

ও কথারও মার্টিন কোন উত্তর দিল না।

ইতিমধ্যে পুলিশ হেরচকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের পিছনে ফ্রাঙ্ক এবং হেরচকের স্ত্রী ইলসে।

ওদিকে অ্যান্না ফিরে যায়নি। সে মার্টিনের জন্য অপেক্ষা করছিল। একটু আগে যাবে বলেছিল ঠিকই, কিন্তু যায়নি।

মার্টিন অদূরে দাঁড়ানো অ্যান্নাকে দেখে তার কাছে যায় এবং গিয়ে বলে, একটা খুব বাজে খবর আছে।

—কি? অ্যান্না জানতে চায়।

—খুন হয়েছে? অ্যান্না চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ। মার্টিন ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট উত্তেজিত। তার মধ্যে একটা কি নেই কি নেই ভাব।

—চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই। হাওয়া ঠিক সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

—হ্যাঁ, তাই চলো।

তারপর তারা যত তাড়াতাড়ি বরফের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থাকে। চলতে চলতে অ্যান্না যেন কি বললো।

মার্টিন তা শুনতে পায় না এবং সে অ্যান্নাকে জিজ্ঞেস করে না।

মার্টিন তখন থেকে শুধু একটা কথাই ভেবে চলেছে, হেরচক যা বলেছে সব সত্যি? তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি কে?

এরপর কিছুটা এগোবার পর মার্টিন বললো, অ্যান্না, এবার তুমি বাড়ি

যাও। তার বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।

—হ্যাঁ, বাড়ির দিকেই তো যাচ্ছি। তুমি আমাকে এগিয়ে দেবে না? অ্যান্না জানতে চায়।

—না, মার্টিন মাথা নাড়ে।

—তোমার কোন জরুরী কাজ আছে?

—কাজ আছে ঠিকই, তবে তেমন কিছু জরুরী নয়।

—তাহলে আমার সঙ্গে চলো।

—তোমার ভালোর জনাই এখন আমায় এড়িয়ে চলা তোমার উচিত।

—তোমাকে এড়িয়ে চলবো?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন? অ্যান্না ঈষৎ চেঁচিয়ে কথা বলে, তাছাড়া, তোমাকে তো কেউ সন্দেহ করছে না।

কে বলেছে! গতকাল আমি হেরচকের বাড়ি গেছিলাম। পুলিশ সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর করতে শুরু করে দিয়েছে।

—তাহলে তুমি পুলিশের কাছে যাও না কেন? আমার তো মনে হয় তাহলেই ভালো হবে।

—কি ভালো হবে! মার্টিন হতাশায় ঘুরে বলে। তারপর নিজেই আবার বলে। ভালো হবার কিছু নেই। হ্যারি মারা যেতে সব শেষ হয়ে গেছে।

অ্যান্না হ্যারির নাম শুনে একটু গুম হয়ে রইলো। কোন জবাব দিল না। বরফের মত পরিবেশ ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে।

একটু পরে অ্যান্না নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে বলে· তাহলে তুমিও সন্দেহ মুক্ত হতে পারতে।

—আর সন্দেহ মুক্ত! বলেই মার্টিন বিরক্তি প্রকাশ করে বলে। ওদের মগজে কিছু নেই। আমি ওদের বিশ্বাস করি না। দেখছো না। হ্যারির কাঁধে ওরা কী ভাবে দোষ চাপিয়েছে!

একটু থেমে মার্টিন আবার বলে, তাছাড়া, আমি ক্যালামানকে মারতে গেছিলাম। সুতরাং ওখানে গেলে আমার কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছো·! ওরা কী আমায় ছেড়ে কথা বলবে?

তুমি বিদেশী তোমার উপর ওরা চড়াও হতে পারে না।

—সে কথা ওদের কে বোঝাবে!

—এটা কিন্তু খুবই অন্যায়।

—এই ন্যায়-অন্যায় কে বুঝবে!

—তাহলে তোমায় আর পুলিসের কাছে যেতে হবে না।

—না গেলে ওরা আমায় হয়তো আর ভিয়েনায় থাকতে·দেবে না তাড়াতে

বাধ্য করবে।

—করলেই হলো! অ্যান্না একটু রেগে যায়।

—দেখো আমি একজন বিদেশী, আর ওরা হলো পুলিশ। আমার চেয়ে ওদের ক্ষমতা অনেক বেশী।

—তোমার তো কাগজ পত্তর সব ঠিক আছে!

—তা থাকলেও …। আর

মার্টিন কথাটা শেষ করতে পারে না। তাকে বাধ্য হয়ে কথার মাঝে থেমে যেতে হয়।

মার্টিনকে থামিয়ে দিয়ে অ্যান্না বলে ওঠে, তাহলে তোমায় ওরা কিছু করতে পারবে না।

—তুমি ওদের চেনো না আর ক্যালমান তো আমায় রীতিমতন শাসিয়েছে। বলেছে যে, আমাকে পত্রপাঠ ভিয়েনা ছাড়া করবে। কথা বলার মধ্যে যেন ওর গোঁ ফুটে উঠেছে।

এ কথা বলার পর মার্টিন একটু চুপ করে থেকে ফের বলে, তবে না ঘাটালে কুলার ছাড়া কেউ আমায় ধরবে না।

—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস কুলার এ কাজ করবে না।

—কি ভেবে তুমি একথা বলছো?

—হঠাৎ আমার একথা মনে হল তাই বললাম।

—তোমার ধারণা ভুল হতেও পারে।

—তা পারে। এবার আমি যাবো।

—ও হ্যাঁ, অ্যান্না দু'পা সামনের দিকে এগিয়ে আবার মার্টিনের কাছে ফিরে আসে। তোমায় একটা কথা বলার ছিল।

—বলো, কি বলবে?

—হেরচক সামান্য জেনেই খুন হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা তুমি বলতে পারো।

—তাই তুমি সাবধান। তোমার কিন্তু বিপদ হতে পারে।

—তোমার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আচ্ছা, তুমি কি করে বলছো হেরচক খুন হয়েছে? আত্মহত্যাও তো করতে পারে?

—না তা করেনি।

—এতটা স্থির হয়ে তুমি কি করে বলছো?

—তা আমি বলতে পারবো না। আমার মন যা বলছে, তাই তোমায় বললাম। আমার কথাটা তুমি মনে রেখো।

—রাখবো, মার্টিন মাথা দোলায়।

—বাই। সি ইউ।

—বাই। সি ইউ।

তারপর মার্টিন ফেরার পথে অ্যান্নার শেষের কথাগুলো তার মনের মাঝে ভেসে বেড়াতে থাকে। ন'টা বেজে গেছে। রাস্তা প্রায় জনশূন্য। বরফের গুঁড়োগুলো একনাগাড়ে বৃষ্টিপাতের মত পড়ে চলেছে। এর মধ্যে রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে কোন শব্দ হলেই সে চকিতে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে! সব সময় ভাবছে, যেন তৃতীয় ব্যক্তি তাকে খুন করার জন্য তার পিছনে ছুটে আসছে!

যাক্, মার্টিন তো ভালোয় ভালোয় হোটেলে পেঁছিল। এরপর সে হোটেলে নির্দিষ্ট ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

মার্টিন বাধা পায় না। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

—মিঃ মার্টিন, মিঃ মার্টিন।

মার্টিন পিছন ফিরে তাকাতে মিঃ স্মিড বললো, কর্ণেল আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

—কর্ণেল? মার্টিন স্পষ্ট বুঝতে পারে, সে ঝামেলায় পড়েছে।

—হ্যাঁ।

—কিছুক্ষণ পরেই যাচ্ছি, মার্টিন স্মিডকে আর কিছু না বলে, দ্রুত হোটেল থেকে সরে পড়তে চেষ্টা করে।

মার্টিন তাতে সফল হয় না। হোটেল থেকে সে বেরুতে যাবে তখন সাদা পোশাক পরা একটা লোক তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। এতে মার্টিনের আর কিছু বুঝবার বাকী থাকে না।

হঠাৎ একটা গাড়ির দিকে মার্টিনের দৃষ্টি যায়। গাড়িটা কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটার রং খাঁকি।

সাদা পোশাক পরা লোকটা একটু ক্রুদ্ধভাবে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, ঐ গাড়িটায় গিয়ে বসুন।

মার্টিনের আর কিছু করার উপায় নেই। তবু সে রাগতভাবে ঐ গাড়িটায় গিয়ে বসে।

গাড়িটা স্টার্ট নিয়েই ভীষণ জোরে চলতে থাকে। তাতে মার্টিন ভয় পেয়ে যায়। সে প্রতিবাদ করে চেঁচিয়ে ওঠে, এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছেন কেন? যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

—আদেশ আছে, কথাটা ড্রাইভার বলে যেমন জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল ঠিক তেমন ভাবেই গাড়ি চালাতে থাকে। মার্টিন আর নিজেকে চেপে রাখতে পারছে না। সে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। আবার সে চেঁচিয়ে কথা বলে, এত জোরে গাড়ি চালাবার অর্থ কি?

কোন জবাব নেই। শুধু গাড়ি ছুটে চলেছে।

—আমাকেও কি হ্যারীর মত খুন করার চেষ্টা চলছে?

এবারও কোন উত্তর নেই।

এভাবে কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর মার্টিন নিজেকে আর কিছুতেই ঠিক রাখতে পারে না। সে চেঁচিয়ে ওঠে, আর কতদূর নিয়ে যাবেন?

ড্রাইভার এ কথা কানে তুললো না।

তারপর হঠাৎ মার্টিনের একটা কথা মনে হলো। তাকে হয়তে গ্রেফতার করা হয় নি, আর সে যে গ্রেফতার হয়েছে একথা বলাও হয় নি এবং গাড়িতে পুলিশ নেই। সম্ভবত একটা বিবৃতি নিয়েই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

যাক্ গাড়িটা এক সময় থামলো। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে বললো, ঐ সামনের বাড়িটায় আমাদের যেতে হবে। আসুন।

মার্টিন ড্রাইভারকে অনুসরণ করে নির্দিষ্ট বাড়িতে পৌঁছলো। বাড়িতে পা দিতে কতোগুলো আওয়াজ একসঙ্গে ভেসে আসে।

মার্টিন বাড়িতে প্রবেশ না করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে, এ আমায় কোথায় নিয়ে এসেছেন?

ড্রাইভার এর কোন কথার জবাব দেবার আগেই কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে যেন দরজাটা খুলে গেল।

এতক্ষণ মার্টিন অন্ধকারের মধ্যে ছিল। তাই ঘরের উজ্জ্বল আলোতে তার চোখ ঝাঁঝিয়ে যায়। ফলে তখন ক্লাবিন ওখানে থাকলেও সে তাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ক্লাবিনের গলার স্বরে তাকে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি।

—আসুন, আসুন, মিঃ ডেকস্টার, ক্লাবিন মার্টিনকে উষ্ণ আহ্বান জানায়। আমরা সবাই আপনার চিন্তা করছিলাম। তবে একেবারে না আসার চাইতে কিছু দেরী করে আসাও ভালো। সেই সময় একটা বেয়ারা ট্রে করে সবাইকে কফি দিচ্ছে।

মার্টিন বেয়ারার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে একজন মহিলাকে সে দেখতে পেল। তার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

এই মহিলার ডান দিকে দুজন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার যুবক। তারা আস্তে আস্তে মহিলার সঙ্গে কথা বলছে।

এবার মার্টিনের দৃষ্টি যায় সামনের দেওয়ালের দিকে। ওখানে টাঙানো রয়েছে একটা পারিবারিক ছবি। তবে ছবিটা বেশ বড়।

হঠাৎ ছবির দিক থেকে মার্টিন পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে দরজাটা বন্ধ।

মার্টিনকে কিছু ভাবতে না দিয়ে ক্লাবিন বলে, এক কাপ কফি খেয়ে সভার কাজ শুরু করলে কিন্তু বেশ হয়, আর আজ সভায় লোকও এসেছে অনেক।

হঠাৎ একজন এসে মার্টিনের হাতে এক কাপ কফি ধরিয়ে দেয়। আবার আর একজন এসে সেই কাপে চিনি গুলে দিতে থাকে। অথচ মার্টিন কফিতে আদৌ চিনি পছন্দ করে না।

ইতিমধ্যে একজন যুবক মার্টিনের দিকে এগিয়ে এসে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে

বলে, আপনার এই বইটায় যদি একটা সই করে দেন, তাহলে ভীষণ খুশী হবো।

হঠাৎ কালো সিল্কের শাড়ী পরা একজন মহিলা মার্টিনের কাছে এসে বললো, মিঃ ডেকস্টার, আপনার বই কিন্তু আমার একবারে ভালো লাগে না।

মার্টিন এর কোন জবাব দেয় না। শুধু ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, পরে উত্তরে কিছু বলবে।

—আমার মনে হয়, উপন্যাসের গল্পটা সব সময় উঁচু ধরনের হওয়া একান্ত উচিত।

—আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু মিসেস প্রশ্নোত্তরের সময় ও কথাগুলো বলবেন, তখন আমার পক্ষে জবাব দিতে কিছুটা সুবিধে হবে।

এবার মহিলা মার্টিনকে খুশী করার জন্য বললো, আমার মনে হয় মিঃ ডেকস্টার, আপনি গঠনমূলক সমালোচনাকে মূল্য দেন।!

ইতিমধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা বললো, মিঃ ডেকস্টার, আমি খুব একটা ইংরেজী উপন্যাস পড়িনি, কিন্তু আমি শুনেছি, আপনার উপন্যাস··· ।

মহিলাকে তার কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে ক্রাবিন মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বললো, মিঃ ডেকস্টার, আপনি কি একটু পান করে নেবেন? সে অনুরোধ জানায়।

একথা শেষ করে ক্রাবিন মার্টিনকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে যায়। ওখানে এসে মার্টিন দেখে, কিছু বয়স্ক লোক চেয়ারে বসে আছে। সবার মুখগুলো কি রকম যেন বিষণ্ণ।

তারপর মার্টিন সভা সম্বন্ধে আমায় খুব একটা বলতে পারেনি। আসলে হেরচকের মৃত্যু এখনো তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তবে মার্টিন যা বলেছে তা হলো, ক্রাবিন সভার কাজ সুন্দর ভাবে শুরু করলো। সমসাময়িক উপন্যাস সম্বন্ধে সে খুব উঁচু দরের বক্তৃতা দিল। উপন্যাসের আঙ্গিক, গতি, রীতি, গঠন ইত্যাদি সবই তার কথার মধ্যে ছিল, যা সত্যিকারের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য এবং সে শেষে বললো, এবার সভার প্রশ্ন ও তার আলোচনার আসর আরম্ভ হবে।

যথারীতি আলোচনা শুরু হলো। প্রথম প্রশ্নটা মার্টিন ধরতে পারেনি। ফলে সে অস্বস্তি বোধ করে।

তবে ক্রাবিন সজাগ। সে এর একটা সুন্দর উত্তর দিয়ে যেমন বক্তাকে ক্ষান্ত করলো, তেমন মার্টিনেরও ইজ্জৎ বাঁচলো। তাতে মার্টিন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

মাথায় বাদামী টুপী ও পশমের কোট পরা একজন মহিলা বললো, মিঃ ডেকস্টার, আপনি কি নতুন কোন উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন?

মার্টিন সায় জানিয়ে বলে, হ্যাঁ, একটা আরম্ভ করেছি।

—উপন্যাসটায় কি নাম দিয়েছেন ? সঙ্গে সঙ্গে মহিলা এর সঙ্গে আরো যোগ করে। অবশ্য বলতে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

—না, না, আপত্তি নেই।

—তাহলে নামটা বলুন।

—তৃতীয় পুরুষ।

—বাঃ, নামটা তো বেশ !

—ধন্যবাদ ! মার্টিন নামটা জানিয়ে যেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে।

আর একজনের জিজ্ঞাস্য, কার লেখা আপনাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে ?

মার্টিন তেমন কোন চিন্তা না করেই সহজভাবে উত্তর দেয়, গ্রে।

'গ্রে' নামটা উচ্চারণ করতে মার্টিন লক্ষ্য করলো, উপস্থিত সব শ্রোতাই এতে খুশী হলো। অন্তত তাদের উজ্জ্বল মুখগুলো দেখে তার এ কথা মনে হলো।

শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে একজন বয়স্ক অস্ট্রিয়ান প্রশ্ন করলো, আপনি কোন গ্রে'র কথা বলছেন ? আমি এ রকম নাম তো আদৌ শুনিনি। মনেও করেত পারছি না।

মার্টিন হাল্কা সুরেই উত্তর দেয়, কেন জন গ্রের নাম শোনেননি ?

মার্টিনের এই জবাব ইংরেজ শ্রোতাদের মধ্যে একটা হাসির আলোড়ন তুললো। দু'একজন খুব জোরে জোরেও হাসলো।

এরপর ক্রাবিন সেই বয়স্ক লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, মিঃ ডেকস্টার, আপনার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছেন।

—রসিকতা ?

—হ্যাঁ, ক্রাবিন মাথা নাড়ে।

—আমার সঙ্গে ? লোকটি নিজেকে দেখায়।

—হুঁ, ক্রাবিন যেন মিটি মিটি হাসছে।

—তা উনি আমার সঙ্গে কি ধরনের রসিকতা করেছেন ?

—উনি কবি গ্রের কথা বলেছেন।

আর একজন এবার জানতে চায়, মিঃ ডেকস্টার, জেমস জয়েস সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

—এতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন ? মার্টিন ভ্রূ কুঁচকে লোকটির দিকে তাকায়।

—মানে আমি বলতে চাইছিলাম……, লোকটি কিছুটা ইতস্ততঃ করে। তারপর বলে, আপনি কি তাকে শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে মনে করে থাকেন ?

—আচ্ছা, নামটা বললেন জেমস জয়েস, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আমি তো তার নামই শুনিনি, মার্টিন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলে। তা উনি কি লেখেন ?

মার্টিনের এ জবাবে শ্রোতারা যেন ঠিক খুশী হলো না। তবু আবার তার সাহসিকতার তারিফ না করেও পারলো না।

এরপর ঝড়ের বেগে মার্টিনের দিকে নানা প্রশ্ন আসতে থাকে. আর সেও খানিকটা দায়সারা গোছের জবাব দিতে থাকে।

এবার হঠাৎ একজন মহিলা মার্টিনকে প্রশ্ন করে, মিঃ ডেকস্টার, 'ভার্জিনিয়া উল্‌ফ'-এর মত অনুভূতি অন্য কোন লেখক তার বইতে ফোটাতে পারেনি। এটা আপনি জানেন তো ?

সারাদিন মার্টিনের মনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে। ফলে সে পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত। তাই তার মনে যা আসছে তাই সে বলে চলেছে।

একজন বয়স্ক লোক সহসা জানতে চায়, প্রয়াত জন গল্‌স ওয়ার্দি'র চাইতে বড় কোন লেখক এখন ইংল্যাণ্ডে আছে ?

এ কথায় শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে ক্রুদ্ধ হলো। সমস্বরে অনেকে প্রতিবাদ জানালো, বসুন মশাই। আর আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না।

এর মাঝে মার্টিনের কানে এলো, দ্যা মারিয়ে এবং লে ম্যানের নাম। আর কিছু শুনলো না।

তারপর মার্টিন বিমর্ষভাবে চেয়ারে বসে পড়ে। ওর চোখের সামনে ভাসতে থাকে, চারদিকের পড়ন্ত বরফ, স্টেচার, ফ্রাংক এবং কচের কাণ্ড ও হতাশ মুখ।

মার্টিনের হেরচকের জন্য দুঃখ হয়। ভাবে, ও যদি তাকে একের পর এক প্রশ্ন না করতো, তাহলে বোধ হয় এমন করে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো না। বেচারা !

তারপর সভা কি ভাবে শেষ হয়েছে তা মার্টিন সঠিকভাবে বর্ণনা করতে না পারলেও বুঝতে পারছি, সভার শেষে ক্রাবিন একটা সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছে এবং মার্টিনের বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর সেই দিয়ে থাকবে। এ ধরনের কথাই আমার মনে হলো।

এক সময় সভা শেষ হয়। একে একে সবাই সভাকক্ষ ত্যাগ করছে। তখন মার্টিনের হঠাৎ আয়নার দিকে নজর যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে অস্বস্তি বোধ করে। সে দেখতে পায়, একজন পুলিশ ঢুকছে।

ইতিমধ্যে ক্রাবিনের একজন প্রহরী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে। ওদের কথার মধ্যে দিয়ে মার্টিনের নামটা দু'একবার ভেসে এলো।

মার্টিন এখন কি করবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তার চিন্তাধারা যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তারপর সে তার সাহস এবং সাধারণ বুদ্ধি হারিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ায়।

মিলিটারী পুলিশ মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি কে ?

পাশ থেকে হঠাৎ একজন তরুণ বলে উঠলো, উনি হ'লেন বেনজামিন ডেকস্টার। নামকরা একজন লেখক।

মার্টিন এই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তরুণটিকে জিজ্ঞেস করে, বাথরুমটা কোথায় বলতে পারেন ?

মিলিটারী পুলিশ মার্টিনের কথায় কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে বলে, আমাদের কাছে খবর আছে রোলো মার্টিন এখানে এসেছেন।

—খুব ভুল করছেন, মিলিটারী পুলিশের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যুবকটি মার্টিনের দিকে তাকায়। দরজার বাইরের দু'নম্বর ঘরটা।

—ধন্যবাদ ! বলেই মার্টিন তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখে, অদূরে পেইন দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। আমার গাড়ির ড্রাইভার পেইনকে আমিই পাঠিয়েছিলাম মার্টিনকে চিনিয়ে দেবার জন্য।

মার্টিন পেইনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পাশের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে এগিয়ে যায়। ঘরটা অন্ধকার। যাতে সে বুঝতে পারে না যে, সে কোন পথ দিয়ে বেরুবে ! আর অন্ধকারটা রীতিমতো তার সঙ্গে শত্রুতা করে যেন আরো বেশী করে গাঢ় ভাবে চেপে বসেছে। এতে সে দারুণভাবে ভয় পেয়ে যায়।

মার্টিন কাঁপা গলায় বলে, ঘরে কেউ আছেন ?

কোন উত্তর নেই, আর মার্টিন এমন ভয় পেয়ে গেছে যে, সে ঢোকার পথটাও আর খুঁজে পাচ্ছে না।

সহসা ভেলকিবাজির মত কে যেন বাইরে থেকে বলে উঠলো, মিঃ ডেকস্টার ?

আর কোন কথা নেই।

তারপরই আবার সব চুপ চাপ। নিস্তব্ধতায় সব কিছু তলিয়ে যায়।

অলাদিনের আশ্চর্য কান্ড কারখানার মত আবার হঠাৎ ঘরের লাইটটা জ্বলে ওঠে। আর সেই আলোয় মার্টিন দেখতে পায়, পেইন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

পেইনের মুখখানা ভাবলেশহীন। তারপর তার ঠোঁটদুটো নড়ে ওঠে। বলে, আমরা অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি। কর্ণেল আপনার সঙ্গে দু' চারটে কথা বলতে চায়।

চারপাশে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যাতে মার্টিন এখন সবাইকে এক নাগাড়ে সন্দেহ করে চলেছে, কিন্তু ক্রাবিনের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। ও কি সত্যি তার একজন ভক্ত ? শুধু তাকে সভাপতি করার জন্যই ডেকেছিল ? না এর পেছনে অন্য কোন নোংরা উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে ?

॥ দশ ॥

যখন জানলাম, মার্টিন তার পরের দিন ইংলণ্ডে ফিরে যায়নি তখন থেকেই ওর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করলাম। খবর এল তাকে কার্টসের সঙ্গে দেখা গেছে। সে যোসেফস্টাডের থিয়েটারেও গেছিল। এমন কি সে উইংকলার ও কুলারের বাড়িতে গেছিল। সে খবরও আছে, শেষে খবর এলো। সে হ্যারির ফ্লাটে উঠেছে।

আরো জানা যায় মার্টিন কুলারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অ্যান্নার বাড়িতে গেছিল, কিন্তু আমার লোকেরা এরপর আর ওকে খুঁজে পায়নি।

সহসা আমার কাছে খবর এলো মার্টিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হয়, মার্টিন বুদ্ধি করেই আমার লোকদের এড়িয়ে চলেছে! তাই তখন বাধ্য হয়ে আমি ওর হোটেলে ওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি।

ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে চলেছে। মার্টিনের সঙ্গে একবার আমার দেখা করা খুব দরকার হয়ে পড়েছে।

পেইন মার্টিনকে আমার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে আমি মার্টিনকে বসতে বলে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম, খান। এটা অবশ্য পরের ঘটনা।

ইতিমধ্যে পেইন বিদায় নিয়েছে, কারণ সে জানে আমি এখন নানা কথা মার্টিনকে জিজ্ঞেস করবো; আর মার্টিন তার উপস্থিতিতে হয়তো কিছুটা বিব্রত বোধ করতে পারে।

কার্টস, কুলার এবং অ্যান্নার সম্বন্ধে কিছু জানার পর আমি ফের মার্টিনকে জিজ্ঞেস করি, হ্যারির সম্বন্ধে নতুন কোন তথ্য জানতে পারলেন? কথাটা বলে আমি ওর দিকে তাকাই।

মার্টিন মাথা নাড়ে, হ্যাঁ, আর……।

—আর কি? আমার কৌতূহল বাড়ে!

—একটা অপ্রিয় কথা বলবো।

—অপ্রিয় কথা? বলুন?

আমাদের চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে, যা আপনারা দেখেও দেখছেন না।

—আমরা দেখেও দেখছি না?

—না। এ কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

—কোন ব্যাপারে বলছেন?

—হ্যারির ব্যাপারে।

—হ্যারির আবার কি ব্যাপার?

—হ্যারি দুর্ঘটনায় মারা যায়নি।

—হ্যারিরটা দুর্ঘটনা নয় ?

—না।

—তবে কি ?

—হ্যারি খুন হয়েছে।

—খুন হয়েছে ?

—হঁ্যা।

এ কথায় আমি রীতিমত অবাক হলাম। বললাম আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু সে যে খুন হয়েছে বলে আমার ধারণা ছিল না। অবশ্য ধারণা তো মানুষের অনেক কিছু থাকে না। তবু ঘটনাগুলো ঘটে যায় এবং তা মানুষকে মেনে নিতেও হয়।

তারপর মার্টিন আমায় নানা কথা জানায় এবং শেষে বললো, এর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল।

—প্রত্যক্ষদর্শী ছিল ? আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

—হঁ্যা মার্টিন কিছুটা উত্তেজিত।

—সে কে আমি জানতে চাই। আর ছিল কেন বলেছেন ? এখন কি সে বেঁচে নেই ?

—না সে বেঁচে নেই ?

—বেঁচে নেই ? ভাবি, এর মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে আছে ?

—না এবং সেই প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে আমি অনেক কথা শুনেছি।

—শুনেছেন ? আমি মার্টিনের দিকে তাকাই। আমার মনে হয়, ও হয়তো আমায় মিথ্যা বলবে না।

হঁ্যা, মার্টিন অশান্তভাবে মাথা নাড়ে।

—সে কি বলেছে ?

—তার কাছ থেকে ব্যাপারটা শুনে আমার কাছে রীতিমতন রহস্যজনক বলে মনে হয়েছে।

—রহস্যজনক ? আমি কথাটা বলে মার্টিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। আমার চোখের পলক পড়ছে না।

—হঁ্যা, মার্টিন তার কথায় বেশ জোর দিয়ে বলে।

—বলুন সে কি বলছে ?

—বুঝতে পারছিনা, সে কেন তৃতীয় ব্যক্তির উপর এত জোর দিচ্ছিল।

—তৃতীয় ব্যক্তি ? কথাটা বলতে গিয়ে আমার চোখ কুঁচকে যায়।

—হঁ্যা।

—তার নাম বলেছে ?

—না।

—জানতে পারলেন না ?

—পারলে তো রহস্যের সমাধান হয়েই যেত।

—তা অবশ্য ঠিক।

—তবে এ কথা ঠিক সেই প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের অনুসন্ধানে কোন রকম সাহায্য করতে চায়নি। তাছাড়া, ···।

—তাছাড়া কি? আমার উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

—আপনার লোকও তার কাছে যায়নি।

আমি একথার জবাব দিই না। গুম হয়ে বসে থাকি। মাঝে মাঝে এরকম অনেক কথা আমাদের শুনতে হয়।

তবে আমি এখন ইচ্ছে করে মার্টিনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলি না, যাতে, সে কোন কারণে আমার উপর রেগে যায়। আমি এখন পুরোপুরি স্বার্থপর হয়ে উঠেছি। তার কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে নানা কথা আদায় করে নিতে হবে।

—আর সবাই মিথ্যে কথা বলেছে মার্টিন জানায়।

—অ্যাঁ! আমি সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মার্টিনের দিকে তাকাই।

—বলছি, আর সবাই মিথ্যে কথা বলেছে।

—মিথ্যে বলেছে, আমি কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করি।

—হ্যাঁ!

মার্টিনের কথায় আমার সব চিন্তাধারা গোলমাল পাকিয়ে যাচ্ছে। এটা তো একটা নিছক দুর্ঘটনা, আর সাক্ষ্য প্রমাণ সব আছে। অথচ ও এটাকে একটা খুন বলে চালাতে চাইছে। এর পেছনে কি কোন স্বার্থ আছে? শুধু কি হ্যারির প্রতি ভালবাসা?

হঠাৎ আমার হেরচকের কথা মনে পড়ে যায়। তারপর আমি একটু ঝুঁকে মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলি, আপনার সেই প্রত্যক্ষদর্শী কি হেরচক? কথাটা বলে ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি।

মার্টিনের সংক্ষিপ্ত জবাব, হ্যাঁ।

আমি কিছুটা বিস্ময় বোধ করলেও বলি, আপনি সেই লোক যার সঙ্গে কথা বলার পর হেরচক নিহত হয়।

— তা আমার জানা নেই।

—তবে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, অস্ট্রিয়ান পুলিশ আপনাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে।

যেন মার্টিন ভয় পায় নি। সেইভাবে বললো, আমাকে?

—হ্যাঁ এবং আরো খবর আছে।

—কি খবর আছে?

—ক্লাঙক এবং কচও জানিয়েছে, আপনি হেরচকের সঙ্গে কথা বলার পর সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

—কারণ ?

—তা আমি জানিনা।

—তাকে আমি এমন কিছু জিজ্ঞেস করিনি যাতে তার ঐ রকম অবস্থা হতে পারে। মার্টিনের স্পষ্ট বক্তব্য।

—যাক্, আমি এখন জানতে চাই, হেরচকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আর কে জানতো ?

—আমি অ্যান্না আর কুলারকে বলেছি।

—শুধু ওদেরকে ?

—হ্যাঁ।

—আর কাউকে এ কথা বলেছেন ?

—না।

—ঠিক মনে করে বলছেন তো ?

—হ্যাঁ। তবে এখন আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

—কি কথা ?

—এমনও হতে পারে, আমি কুলারের ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর কুলার হেরচকের মুখ বন্ধ করার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে খবর দিতে পারে।

—এটা কি শুধু আপনার ধারণা ?

—হ্যাঁ।

—কুলার তার কথায় কি এধরনের কিছু আভাস দিয়েছিল ? আমি জানতে চাই।

—ঠিক মনে করার মত তখন কিছু ঘটেনি।

—হয়তো কুলার এধরনের কিছু করেনি, কারণ আপনি যখন কুলারকে হেরচকের কথা বলতে গেছেন তার আগেই সে নিহত হয়েছে। এটা আপনি মনে রাখুন।

—তার আগেই ?

হ্যাঁ।

—আপনার অনুমান যদি……।

—কিছু খবর অন্তত আমাদের ঠিক থাকে।

মার্টিন কিছু না বলে ঘাড় নাড়ে।

—আর আপনি যে রাতে হেরচকের বাড়ি গেছিলেন, সেই রাতেই ও খুন হয়েছে।

আমি একটু থেমে মার্টিনকে আবার বলি, আপনার সঙ্গে কথা বলে হেরচক বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। আচ্ছা, আপনি তো হোটেলে রাত সাড়ে ন'টায় ফিরেছিলেন, তাই না ?

—হ্যাঁ, ঐ রকম সময় ফিরেছিলাম।

—তার আগে আপনি কি করছিলেন ?

—তার আগে ? মার্টিন ভাবতে থাকে।

—হ্যাঁ।

—সারাদিনের ঘটনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে এলোমেলো পায়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। তখন আমার কিছু ঠিক ছিল না।

—ঘুরে বেড়াবার কি কোন প্রমাণ আছে ?

—প্রমাণ ? ঘুরে বেড়াবার ?

—হ্যাঁ।

—না, আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই।

—তখন আপনি ট্যাক্সি চড়েছিলেন ?

—উহুঁ।

—অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাইছেন।

—তার মানে ? মার্টিন অপমানিতবোধ করে।

—আপনি 'হ্যাঁ' বললে, আমি ট্যাক্সির নাম্বারটা জিজ্ঞেস করতাম। এই আর কি !

—না চড়লেও বলতে হবে 'হ্যাঁ' চড়েছি।

আমি মার্টিনকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য এ কথাগুলো জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর ও যখন রাস্তায় ঘুরছিল তখন ওর পিছনে আমার লোক ছিল এবং ওযে হেরচককে খুন করেনি, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবুও কিন্তু ও একেবারে নির্দোষ নয়।

এ ব্যাপারে আমার একটা উপমা মনে পড়ে, একজনের হাতে ছুরি থাকলেও অনেক সময় খুন করে কিন্তু আর একজন। এসব আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে।

হঠাৎ মার্টিন বলে, একটা সিগারেট খেতে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই।

মার্টিন সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললো, আপনি কি করে জানলেন যে, আমি কুলারের বাড়ি গেছিলাম।

—জেনেছি, আমি মিটমিট হাসতে থাকি।

—কি ভাবে, সেটা আমি জানতে চাই।

—অস্ট্রিয়ান পুলিশের কাছ থেকে জেনেছি।

—অস্ট্রিয়ান পুলিশ ? মার্টিন সিগারেটে টান দিতে যাচ্ছিল। সে টান দিতে পারে না। থেমে যায়।

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। তারা আমায় আদৌ চেনে না।

এবার আমি একটু হেসে বলি, আপনি কুলারের বাড়ি থেকে চলে যাবার

পরই ওই আমায় টেলিফোন করেছিল।

—কুলার? আপনাকে?

—হ্যাঁ।

এ কথা শুনে মার্টিন বিড় বিড় করে ওঠে, তাহলে কুলারকে কি অপরাধীর দলে ফেলা চলে না?

কথাটা শেষ করে মার্টিন উত্তেজিতভাবে বলে, হ্যারির ব্যাপারে কুলারও মিথ্যে কথা বলেছে।

এর উত্তরটা আমিই দেই। বলি, কুলার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্যই আমায় ফোন করেছিল।

—আপনি তাহলে কুলারকে সন্দেহ করছেন?

—হ্যাঁ, সন্দেহের তালিকা থেকে তাকে বাদ দিতে পারি না।

আমার এ কথা শোনার পর মার্টিন জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তবুও বিশ্বাস করতে পারি না যে, কুলার এ ব্যাপারে জড়িত! আমি কুলারকে যতটা চিনি, তার সেই সততার জন্য আমি যে কোন লোকের সঙ্গে বাজী লড়তে পারি।

মার্টিনের এ ধরনের কথার ভাবে উপর থেকে আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়, কারণ কুলারকে আমি ভালো রকম চিনি।

কুলার একজন টায়ার ব্যবসায়ী। ইতিমধ্যে সে পঁচিশ হাজার ডলার জমিয়েছে। ব্যবসাও মন্দ চলে না।

আমি কুলার সম্বন্ধে এ তথ্য জানাতে, মার্টিন আমায় জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা এ ধরনের কোনো ব্যাপারের মধ্যে কি কিছু সন্দেহজনক ছিল, যাতে হ্যারি জড়িত?

—না, না, হ্যারি ও সবের মধ্যে ছিল না তারপর আমি বলি, তবে হ্যারির মৃত্যুর ব্যাপারে এখন অনেক কথা আপনাকে বলতে চাই। আমি মার্টিনকে জানাই।

—তা হলে কি? থেমে গেলেন কেন? বলুন।

—না, কিছু না। আপনি বলুন।

—বলতে আমার আপত্তি নেই। হয়তো আপনি আঘাত পেতে পারেন। তাই……।

—তবু আপনি বলুন। আমি সব শুনতে চাই এবং আজ আমি সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত।

—তাহলে শুনুন, আমি বলি। যুদ্ধের সময় এবং তারপরে মানুষ নানারকম কারবার করতে থাকে। অস্ট্রিয়ান পেনিসিলিন শুধু মাত্র মিলিটারী হাসপাতালগুলো পেত। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে দেওয়া হতো না। তারা প্রয়োজনবোধে চড়া দামে তা বাইরে থেকে কিনতো!

আমি একটু থেমে আবার বলি, পেনিসিলিন বণ্টন ব্যবস্থায় যারা কাজ করতো, তারা কিন্তু নিজেদের অপরাধী বলে ভাবতো না।

—কেন ভাবতো না ?

—তারা বলতো, যারা আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে, তারাই হলো আসল অপরাধী।

—তারপর, মার্টিন আরো জানতে চায়। এ সব তথ্য তার আদৌ জানা ছিল না।

—এতে পেনিসিলিনের লাভ মন্দের দিকে ছিল, কিন্তু অর্থের লোভ বড় সাংঘাতিক। আরো লাভ চাই, আরো টাকা চাই, তাই তারা তরল পেনিসিলিনের সঙ্গে রঙীন জল, আর গুঁড়ো পেনিসিলিনের সঙ্গে বালি মেশাতে লাগলো। এবং তাতে তাদের লাভ হু হু করে বেড়ে যেতে লাগলো, কিন্তু যারা এগুলো ব্যবহার করতো, তারা মোটেই উপকৃত হতো না। উল্টে তাদের ক্ষতিই হতে লাগলো।

—তাইতো হওয়া স্বাভাবিক।

—যেমন যুদ্ধে হাত পা কেটে যাওয়া রোগী কিংবা যৌন ব্যাধিগ্রস্থ মানুষের চরম ক্ষতি হতে লাগলো।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছি। সিগারেটে একটা টান দিয়ে বলি, শিশু হাসপাতালের কথা আমি আর বলতে চাই না।

—কেন ? বলুন।

—বেশ। আপনার অনুরোধ ঠেলতে পারছি না ! উঃ, সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য ! আমার মুখ সহসা করুণ হয়ে ওঠে।

—কেন ? কি হয়েছিল ?

—শিশুদের ম্যানিনজাইটিসের জন্য কিছু পেনিসিলিনের দরকার হয়ে পড়েছিল। চোরাবাজার থেকে তা দেওয়ার পর অনেকে মারা গেছে এবং আজও বহু শিশু মানসিক রোগে ভুগছে। এদের অনেককে এখনো মানসিক হাসপাতালে দেখা যাবে।

এসব শোনার পর মার্টিন একটু অধৈর্য হয়ে বলে, এর সঙ্গে হ্যারির কি যোগ আছে ?

—আছে। শুধু একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। বলে আমি মিলিটারী ফাইল খুলে পড়তে থাকি। প্রথমদিকে হ্যারিকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় দেখা যেতে লাগলো। বিশেষ কয়েকজন লোকের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বেড়ে যেতে থাকে এবং দিনে দিনে হ্যারির টাকার অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগলো।

একটু থেমে আবার জানালাম, তারপর হ্যারি কিছুটা অসাবধান হয়ে পড়েছিল। যদিও সে আঁচ করতে পারেনি যে, আমরা তাকে সন্দেহ করছি। তাহলে সে হয়তো সাবধান হয়ে যেত।

আমি সিগারেটে একটা টান দিয়ে ফের বলি, ওদের এই সব কীর্তিকলাপ জানার জন্য আমাদের একজন এজেণ্টকে মিলিটারী হাসপাতালে পিয়নের কাজে লাগিয়ে দিলাম।

আমি মার্টিনের দিকে তাকিয়ে আরো জানাই, এসব চোরাকারবারে সে যে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ রাখতো একদিন তার সন্ধান পেলাম।

লোকটার নাম হারবিল।

তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাজ কি ?

—লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি নিচের দিকে। কোন কথা বলছে না।

—তোমার নাম কি বলো, বলে আমি ধমক দি।

—আজ্ঞে আমার নাম হারবিল।

—তুমি এদের সঙ্গে কতদিন আছো ?

—বেশীদিন নয়।

—তবু কতদিন।

—মাস তিন চারেক হবে।

—মিথ্যে বলছো।

—স্যার, ছ'মাসের বেশী কিছুতেই হবে না।

—তোমার কিন্তু বাঁচবার কোন আশা নেই।

—হুজুর! আমায় বাঁচান! বলে হারবিল আমার পা জড়িয়ে ধরে। এমন কাজ আমি আর কোনোদিন করবো না।

—জানো, তোমাদের জন্য কত শিশু মারা গেছে, নয়তো পঙ্গু হয়েছে ? আইনের চোখে কিছুতেই রেহাই পাবে না। খুব বড় রকমের সাজা তোমার হয়ে যাবে। তা থেকে কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না। যদি……। আমি কথার মাঝে ইচ্ছে করে থেমে যাই, কারণ ওকে দিয়ে এখন আমার কথা বার করাতে হবে।

—যদি কি ? হারবিল প্রশ্ন করে।

—যদি তুমি আমাদের হয়ে কাজ করো।

—তা কি করে সম্ভব ?

—কেন ?

—তাহলে ওরা আমায় বিশ্বাসঘাতক ভেবে জানে মেরে দেবে।

—আবার আমাদের হয়ে কাজ না করলে আমরা কি তোমায় ছেড়ে দেবে ভেবেছো! এখন কোনটা করবে বেছে নাও।

তারপর অনেক চাপ এবং বোঝাবার পরে হারবিল আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজী হয়ে যায়। তারপর ওর সাহায্যে জানতে পারলাম, কার্টস এ ব্যাপারে জড়িত এবং তার এখানে একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

—তাহলে কার্টসকে আপনারা ধরলেন না কেন ? মার্টিন জানতে চায়।

আরো বিশেষ করে যখন অপরাধী।

আমি সে কথার জবাবে বললাম, না, কার্টসকে আমরা ইচ্ছে করে ধরিনি।

—কেন ?

—ধরলে পুরো দলটা সজাগ হয়ে যাবে, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য, পুরো দলটাকে ভেঙে দেওয়া।

তারপর আমি ফাইল থেকে দুটো ফটো—স্টাট কপি বার করে বলি, এই ছবিদুটো দেখলেই বুঝতে পারবেন এই দলের নেতা কে।

কথা শেষ করে আমি চিঠি দুটো মার্টিনের দিকে এগিয়ে দিই, এই নিন।

মার্টিন চিঠি দুটো পড়ে স্তম্ভিত। তার এতদিনের বন্ধুত্ব যেন আর রইলো না। হ্যারির সঙ্গে সেই রঙীন স্মৃতি জড়ানো দিনগুলি যেন সহসা তাকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে থাকে। ফলে সে একটা বেদনা অনুভব করে।

একটু পরে আমি মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, হ্যারির এইসব কীর্তিকাহিনী শুনে একেবারে ও বেশ ভেঙে পড়েছে।

এরপর মার্টিনকে চাঙ্গা করার জন্য ওর দিকে এক পেগ মদ এগিয়ে দিয়ে বললাম, পান করুন মিঃ মার্টিন।

মার্টিন বাধ্য ছেলের মতো আস্তে আস্তে মদের গ্লাসে ঠোঁট ডোবাতে থাকে এবং মদ পান করার পর ও আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে যেন সান্ত্বনার ভাষা খুঁজতে থাকে।

এক সময় মার্টিন স্বাভাবিক হয়ে বলে, আচ্ছা, এমনওতো হতে পারে যে, আপনারা যেমন হারবিলকে বাধ্য করিয়েছিলেন, তেমন কোন গোপন চক্র তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হ্যারিকে দিয়েও কাজ করিয়ে যাচ্ছিল। নইলে……।

আমি মার্টিনের কথার অর্থ বুঝতে পারি। অর্থাৎ মার্টিন তার প্রাণের বন্ধু হ্যারিকে এখনো যেন প্রকৃত দোষী বলে ভাবতে পারছে না। আসলে হ্যারি যে এখনো তার হৃদয়ের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে।

আমি মার্টিনের কথাটা লুফে নিয়ে বললাম, হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

—আপনারা হ্যারিকে ধরতে যাবেন তা হয়তো কেউ আঁচ করে থাকবে, আর সম্ভবত সেই কারণেই হ্যারিকে চিরতরের জন্য এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারপর মার্টিন চেয়ার ছেড়ে উঠে অসহায়ভাবে আরো বলে, আমি আর এখানে থেকে কি করবো ইংলণ্ডে ফিরে যাই।

—না, আপনি যাবেন না।

—যাবো না ?

—না।

—কেন ?

গেলে অস্ট্রিয়ান পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করবে।

—সন্দেহ করবে আমাকে ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কুলার তাদের সব জানাবে।

—কুলার ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝতে পারছি না।

—নিরাপদে কে না থাকতে চায় ! আর আমাদের হাতে কুলারের বিপক্ষে যাবার মত কিছুই নেই।

—তাহলে তৃতীয় পুরুষ কে ?

—আমারও সেই একই জিজ্ঞাসা এবং তাকে ধরা না পর্যন্ত আমারও স্বস্তি নেই।

॥ এগারো ॥

মার্টিন আমার এখান থেকে চলে যাবার পর মনের জ্বালা দূর করার জন্য সে একটা নৈশ ক্লাবে প্রবেশ করে। তার নাম ক্লাব ওরিয়েন্টাল।

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘর। দেয়ালে টাঙানো আর পাঁচটা ক্লাবের মত মেয়েদের অর্ধ উলঙ্গ ছবি। কাউন্টারের কাছে কিছু আমেরিকান প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে।

মার্টিন উন্মাদের মত পেগের পর পেগ মদ খেয়ে চলেছে। ও এখন ইচ্ছে করলে কোন মেয়ের সঙ্গ পেতে পারতো যদি একটু আগে আসতে পারতো, কিন্তু তার ভাগ্য মন্দ। একটু আগে ক্যাবারে নাচিয়েরা চলে গেছে!

মার্টিন ক্লাবের পয়সা মিটিয়ে কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। ক্লাব ওরিয়েন্টালের সঙ্গেই আর একটা ক্লাব আছে। তার নাম ম্যাকসিন। সেখান থেকে জ্যাজের বাজনা ভেসে আসছে।

ক্লাব ম্যাকসিনকে পিছনে ফেলে মার্টিন এগিয়ে যায়। পথে পড়লো আর একটা ক্লাব। নাম চেজ ভিক্টর। সেখানে একটা ককটেল পার্টি চলছে। তা থেকে নারী পুরুষের মিলিত কলরব বরফ পড়া রাতের নিস্তব্ধতাকে যেন বিদ্রূপ করে চলেছে।

ওদিকে নেশায় আচ্ছন্ন মার্টিন যেন দিশেহারা। এ মুহূর্তে তার নিজেকে বড় অসহায়বোধ হচ্ছে। এই নিঃসঙ্গতা তাকে ডুবিয়ে মারার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

এই নির্জনতা ঝেড়ে ফেলে মার্টিন এখন অনেক কিছু ভাবতে চাইলো, কিন্তু তার সমস্ত কিছু তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

—না, না, মার্টিন কোনো ভাবনাকে জট পাকাতে দেবে না।

তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তখন তার মনে পড়ে, আমস্টারডাম এবং ডাবলিনের সেই মেয়ে দুটোর কথা।

মার্টিন ভাবতে থাকে, এরা তাকে কখনো ঠকায়নি। এরা যেমন তার তৃষ্ণা দূর করেছে, তেমন এদের সঙ্গে অতলে ডুব দিয়ে মুঠো মুঠো আনন্দ পেয়েছে। আবেগে তাকে ভরিয়ে দিয়েছে। সেই সুখ সে যেন আকণ্ঠ ভরে পান করেছে।

কিন্তু এখন মার্টিন যেন কেমন উদাস হয়ে পড়েছে। ভাবে এই আবেগ অনেক সময় কাল হয়ে দাঁড়ায়। নইলে হ্যারি তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়েও তার সঙ্গে এমন করে শত্রুতা করলো কি করে! তবু তার মন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে।

ট্রাম চলা অনেকক্ষণ আগে বন্ধ হয়ে গেছে। দূরে পাতলা কুয়াশা। রেশমের মত এক নাগারে বরফ পড়ে চলেছে। তবু মার্টিন এইসব উপেক্ষা করে অ্যান্নার ফ্ল্যাটের দিকে এগিয়ে চললো।

মার্টিনের এখন ইচ্ছে করছে সব কিছু তছনছ করে দিতে। তার মনে এখন প্রচণ্ড বিক্ষোভ। সেই তাপে সে অ্যান্নাকে পুড়িয়ে মারবে।

এতদিন সে ভালো ছিল, কিন্তু ভালো থেকে সে কি পেয়েছে? কিছুই না। শুধু বঞ্চনা, আর বঞ্চনা। সেই আগুনে সে আর পুড়তে চায় না। তবু এই বরফ পড়া অসাড় রাস্তাটা তাকে যেন নৈরাশ্যের মাঝে টেনে নিয়ে যায়।

এখন রাত তিনটে বাজে। মার্টিন অ্যান্নার ফ্ল্যাটে এসে কলিং বেল পুশ করে। তবে আস্তে। জোরে বাজায় না। লোকে তাহলে তাকে অভদ্র ভাববে। এত রাত্রে সামান্য শব্দ জোরে হয়ে বাজবে। তাছাড়া, অ্যান্নাও বিরক্তবোধ করবে। করারই কথা।

তবু মার্টিন না এসে পারেনি, একবার ভেবেছে চলে যায়। তবু একটা কিসের আকর্ষণে সে এখানে চলে এসেছে। কোন সাড়া শব্দ নেই। মার্টিন দ্বিতীয়বার কলিং বেল বাজায়! তারও অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

—কে? ভেতর থেকে কিছুটা বিরক্তি মেশানো স্বর ভেসে আসে।

—আমি মার্টিন।

—তুমি এত রাতে?

—হঠাৎই চলে এলাম।

অ্যান্না দরজা খুলে মার্টিনের দিকে তাকায়। তার চাউনির মধ্যে বিস্ময় প্রকাশ পাচ্ছে।

এখন মার্টিন নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। সে খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে অ্যান্নার দিকে তাকিয়ে ভাবলো। সে ওকে সব কিছু বলতে চায়। নইলে তার দুঃখের বোঝা কিছুতেই হাল্কা হবে না। আর হ্যারিও আন্নাকে একান্ত কাছে পেয়ে সর্বকিছু ভুলে থাকতে চেয়েছে। যা এ মুহূর্তে সেও চায়।

তবু নিজের ভারসাম্য হারিয়ে মার্টিন উত্তেজিত ভাবে জানায়, অ্যান্না, আমি সব কিছু জেনেছি।

অ্যান্না এ কথার জবাব না দিয়ে আস্তে বলে, আগে বসো, তারপর তোমার কথা সব শুনছি। এই রাত দুপুরে চিৎকার করে বাড়ির লোকদের জাগিয়ে তুলো না। এই চেয়ারটায় তুমি একটু শান্ত হয়ে বসোতো!

—হ্যাঁ বসছি, বলে মার্টিন চেয়ারে বসে।

এরপর অ্যান্না মার্টিনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বললো, পুলিশ কি তোমার পিছনে ধাওয়া করেছে?

—পুলিশ? মার্টিনের চোখ বড় হয়।

—হ্যাঁ।

—আমার পিছনে? কই, নাতো। তবে একেবার যে করেনি তাও আবার বলতে পারছি না।

—তুমি তো হেরচককে গুলি করোনি?

—হঠাৎ এ কথা আমায় জিজ্ঞেস করছো?

—করেছো কি না তাই বলো।

—না করিনি। যাক্, তুমি এত মদ খেয়েছো কেন?

মার্টিন এবার চিৎকার করে বলে, বেশ করেছি!

অ্যান্না অস্বস্তিবোধ করলেও এ মুহূর্তে কিছু বলতে পারছে না। আর বলবে কাকে? ও নেশায় এখন বুঁদ হয়ে রয়েছে। তবে জ্ঞান যে একেবারে নেই তা নয়।

তারপর মার্টিন নিজেকে সংযত করে বললো, ব্রিটিশ পুলিশ বিশ্বাস করেছে যে, আমি হেরচককে খুন করিনি।

—এটা একটা আশার কথা।

—তবে হ্যারির ব্যাপারে আমি অনেক কিছু জেনেছি।

—তুমি জেনেছো?

—হ্যাঁ।

—বললাম না অনেক কিছু।

—বলো, বলো, কি জেনেছো?

—ও একটা বিচ্ছিরি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল।

—বিচ্ছিরি ব্যাপারে? অ্যান্না মুখ কুঁচকে বলে।

—ও আমাদের দুজনকেই ঠকিয়েছে। আমি এটা ওর কাছে কিছুতেই আশা করিনি, আমি ওকে অন্য চোখে দেখতাম।

—ছিঃ, ছিঃ, আমার এখন লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

অ্যান্না চেয়ারটা মার্টিনের কাছে এগিয়ে এনে উত্তেজিত ভাবে বলে, আমায় সব খুলে বলো। আমি সব জানতে চাই।

মার্টিনের কাছ থেকে সব কিছু শোনার পর অ্যান্না দুঃখ করে বলে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি?

কথা শেষ করেই অ্যান্নার চোখ মুখের ভাব পাল্টে যায়। ভাবে, মার্টিন তাকে মিথ্যে বলছে না তো? নইলে হ্যারির কখনো এত অধঃপতন হতে পারে না।

পরমুহূর্তে অ্যান্না আবার দমে যায়। ভাবে, মার্টিন হ্যারির সম্বন্ধে মিথ্যে বলবে না। এটুকু বিশ্বাস তার আছে। তবে এ সময় সে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে। সে বিশ্বাস কাকে করবে? যে হ্যারি তার মন প্রাণ সমস্ত কিছু জুড়ে ছিল, সে কি না ও সব করে বেড়াতো! অ্যান্না

নিজের মনেই বিড় বিড় করতে থাকে, না, না, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

তাই অ্যান্না বলে, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারি? সে বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলে।

—আমি তোমাকে মিথ্যে বলছি? মার্টিন বেশ খানিকটা ঝুঁকে অ্যান্নার দিকে তাকায়। এ কথা তুমি ভাবলে?

—না, না, আমি তোমাকে শুধু জিজ্ঞেস করছি। আসলে আমি তো এটা জানতে পারছি না।

—আমিও পারছি না, মার্টিনের যেন ভেঙে পড়া গলা। ও হতাশভাবে আরো বলে, ওর কি এমন দরকার পড়লো যাতে ও রাস্তা বেছে নিল!

—আমিও তো সেই একই কথা ভাবছি, অ্যান্নার মুষড়ে পড়া গলা। এ ছাড়া, ওর কি অন্য কোন পথ ছিল না?

—এটা আমার চেয়ে তুমি ভালো বলতে পারবে,' মার্টিন জানায়। কারণ তুমি ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছো।

—এখন বুঝতে পারছি, ও আমার সঙ্গে বেইমানি করেছে। আমার ভালোবাসার মর্যাদা ও দেয়নি। ঠক, প্রতারক কোথাকার! ওর কথা শুনেও আমার ঘেন্না হচ্ছে। একটা বিজাতীয় ক্রোধে অ্যান্নার চোখ মুখ অন্য রকম দেখাতে থাকে।

—প্রতারণা শুধু তোমার সঙ্গেই করেনি। করেছে আমায় সঙ্গেও। মার্টিনের মুখ দিয়ে একটা চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভাবছি, হ্যারির মধ্যে এ পরিবর্তন কি করে হলো?

—আমি কিন্তু ভাবতে পারছি না। ওর কথা তুমি আর আমার সামনে বলো না। ও রকম মানুষ মারা গেছে তাতে আমি খুশী হয়েছি।

—না, না, এ কথা অ্যান্না, তুমি অন্তত বলো না।

—বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

তুমি একটু শান্ত হও অ্যান্না। বুঝতে পারছি তুমি দারুণ দুঃখ পেয়েছো? এর জের থাকবেও বেশ কিছুদিন।

—তবু ও কথা না বলে আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। তবে ও যদি জেলে পচে মরতো, তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না।

—জানি, তুমি এখনো হ্যারিকে ভালোবাসো, মার্টিন অতি দুঃখের মাঝেও একটু হাসে। তুমি আমার একটা কথার জবাব দেবে?

—কি কথার?

—যে হ্যারি টাকার জন্য এ কাজ করলো। সে বোধ হয় আমাদের চেনা ছিল না। পরিচিত হলে কিছুতেই এ কাজ করতে পারতো না।

—এক এক সময় আমারও তাই মনে হয়, আমাদের মত বোকাদের নিয়ে হ্যারি কিছুটা সময় ঠাট্টা করে গেছে।

—করতেও পারে। সে থাকলে এর জবাব আমি তার কাছে চাইতাম। যাক্, ও যখন নেই তখন এ পরিস্থিতি আমাদের মেনে নিতে হবে।

—মেনে নেবে ?

—এ ছাড়া, পথ কি !

—আমি কিছুতেই পারছি না।

—কিন্তু আমাদের পারতে যে হবেই। এ ছাড়া, আমাদের সামনে অন্য কোন উপায় নেই।

—তুমি ভাবতে পারো সেই বাচ্চাগুলোর কথা, যারা ভেজাল পেনিসিলিনের জন্য মরে গেছে, নয়তো আজ উন্মাদ।

—মার্টিন, এখন এ সব ভুলে যাও।

—ভুলতে পারছি কই !

—তবু আমাদের সব কিছু ভুলে যেতে হবে।

—অ্যান্না। মার্টিনের গলা চিড়ে ওর নামটা যেন বেরিয়ে আসে।

—হ্যাঁ মার্টিন।

—আমি ওর নামটা এখন মনে করতে চাই না।

—চাও না ?

—না। আমি……।

—আমি কি ? বলো ? থামলে কেন ?

—আমি তোমায় এখন ভালোবাসি।

—ভালোবাসো ? আমায় ? মার্টিন নিজেকে দেখিয়ে বলে। ও কথা শুনে সে খুবই অবাক হয়েছে।

—হ্যাঁ মার্টিন।

—আমিও তোমায় একটা কথা জানাতে চাই।

—কি কথা ?

—অ্যান্না, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

—ঠিক বলছো ?

—হ্যাঁ ঠিকই বলছি। আমি মদ খেয়ে একটু মেয়েদের প্রেমে পড়লেও কখনো ভেজাল ওষুধ খাইয়ে মানুষকে মেরে ফেলি না। তাই তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

—কিন্তু আমি তো তোমাকে একেবারে চিনি না।

—তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করছি না।

অ্যান্নার মনে সহসা দ্বিধা দ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছে। ভাবে, একবার নিবিড়-ভাবে প্রেম করে ঠকেছে। দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করতে চায় না। তবে এ কথা সে অস্বীকার করতে পারে না যে, মার্টিনকে তার ভালো লেগেছে। বন্ধুর জন্য ওর আন্তরিকতায় সে মুগ্ধ। ওর ভেতরে যে একটা দরদী মন

আছে, তা তার জানতে বাকী নেই। নইলে মৃত বন্ধুর জন্য কে এত করে!

মার্টিন অ্যান্নাকে বলে, তুমি কি হ্যারিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারো না?

—কি করে পারি?

—জানতাম, তুমি পারোনি, নইলে ও কথা আমায় জিজ্ঞেস করতে না।

—বলো হ্যারিকে কি করে ভুলি?

—যাক্, হেরচকের মামলাটা মিটলেই আমি ভিয়েনা ছেড়ে চলে যাবো, মার্টিন একটু অভিমান করে বলে।

—তুমি চলে যাবে?

—হ্যাঁ, মার্টিনের স্পষ্ট জবাব।

—কেন? অ্যান্নার গলায় হতাশা।

—এখানে থেকে আমি কি করবো! তাছাড়া, কে হ্যারিকে খুন করলো জানারও আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

একটু থেমে মার্টিন আবার বলে, যে হ্যারিকে খুন করেছে, সে ঠিক কাজই করেছে।

তারপর মার্টিনের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, নইলে এই পরিস্থিতিতে আমিই হয়তো হ্যারিকে খুন করতাম।

—তুমি? অ্যান্না চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি।

—তা তুমি কখনোই করতে পারতে না!

—ঠিক পারতাম।

—এটা তুমি রেগে গিয়ে বলছো। একটু শান্ত হও।

—আমি শান্তই আছি। আমার এত চট করে রাগ হয় না। শেষে হ্যারি কি না……। ছিঃ, ছিঃ। ওর জন্য আমি কত গর্ববোধ করতাম। কত লোককে ওর কথা বলে বেড়াতাম!

এরপর মার্টিন একটু থেমে আবার বলে, আর তুমি কি না অমন একটা জঘন্য খুনীকে এখনো ভালোবাসো।

—হ্যাঁ, আমি ওকে আজো ভালোবাসি। ওর ব্যাপারে তুমি একটু বেশী জেনেছো বলে তাতে আমার ভালোবাসায় বিন্দুমাত্র চিড় খাবে না। তবে এ কথা ঠিক, হ্যারির ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে সব কিছু জানার পর আমিও স্তম্ভিত।

তুমি যে ভাবে কথা বলছো তাতে আমার ঘেন্না করছে। আমার মাথায় এখন অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, আর তুমি তখন থেকে একটানা বকর বকর করে চলেছো।

—আমি তোমাকে এখানে আসতে বলিনি, অ্যান্নার পাল্টা জবাব। তুমি যেচে এখানে এসেছো।

—তুমি কিন্তু আমায় রাগিয়ে দিচ্ছো।

এ কথায় অ্যান্না হেসে ফেলে, একে এলে রাত তিনটের সময়। তারপর বলছো, রেগে গেছো। এখন আমি কি করলে তুমি খুশী হও বলতো?

—আমি তোমাকে এ ভাবে কখনো হাসতে দেখিনি, মার্টিন সে কথার জবাব না দিয়ে বলে। তুমি এমন করে আর একবার হাসো তো।

দু'বার হাসার মত কোন ব্যাপার ঘটেনি। এবার মার্টিন অ্যান্নার হাতে হাত রেখে বলে, আমি খুব ক্লান্ত। সারাদিন ধরে অনেক ধকল গেছে। উঃ আর পারি না।

—জানালার কাছ থেকে সরে এসো।

—কেন?

—ওখানে কোন পর্দা নেই।

—এত রাতে বাইরে থেকে দেখার মত কেউ নেই।

সহসা চাঁদটা ভেসে যায়। ফলে ঘরটা কিছুটা অন্ধকার হয়ে ওঠে।

মার্টিন আস্তে বলে, অ্যান্না, তুমি এখনো হ্যারিকে ভালোবাসো, তাই না? ও অ্যান্নার হাতে চাপ দেয়।

—হ্যাঁ, অ্যান্না মাথা নাড়ে।

—সম্ভবত আমিও ভালোবাসি, কিন্তু কেন জানি না, আচ্ছা, আজ উঠি, মার্টিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

তারপর মার্টিন অ্যান্নার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে রাস্তায় চলে আসে। তাড়াতাড়ি হাঁটছে সে। হঠাৎ তার মনে হয় কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে।

হ্যাঁ, মার্টিনের ধারণাই ঠিক। সে ঘুরে পিছন ফিরে তাকাতে একটা রোগা লোককে অন্ধকার দেয়ালের দিকে লেপ্টে যেতে দেখলো। মার্টিন ভাবে, এই কি তৃতীয় ব্যক্তি, যাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

এবার মার্টিন লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে, কে ওখানে? জবাব দাও? সে চেঁচিয়ে কথা বলে।

এর উত্তরে একটা জানলার পর্দা তোলার আওয়াজ হলো।

সম্ভবত কারুর ঘুমের ব্যাঘাত হলো। তারপর হঠাৎ ঘরের আলো রাস্তায় ছিটিয়ে পড়লো!

কিন্তু মার্টিন লোকটাকে আর খুঁজে পেল না। কোথায় সেই মানুষ। সেই আলোয় সে শুধু নিজেকে দেখতে পেল।

তার পরমুহূর্তে মার্টিন ভাবে, তাহলে সেই লোকটা কোথায় গেল? একে সে একটু আগে দেখেছে। ভোজ বাজীর মতো কোথাও তো কর্পূরের মত উবে যেতে পারে না, কারণ তাকে সে স্বচক্ষে দেখেছে।

এরপর একরাশ বিস্ময় নিয়ে মার্টিন সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

॥ বারো ॥

তার পরেরদিন সকালে মার্টিন আমার অফিসে এসে হাজির। আমি তো অবাক, কারণ ও যে এভাবে হঠাৎ এসে হাজির হবে। তা ঠিক ভাবতে পারিনি।

আমি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে মার্টিনের দিকে তাকাই, গুড মরনিং? বসুন।

—গুড মরনিং, মার্টিন আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে।

—হঠাৎ কি মনে করে।

—একটা কথা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই।

—কি কথা?

—কর্ণেল আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন?

—ভূত? আমি মার্টিনের ব্যাপারে আরো কৌতূহলী হয়ে উঠি।

—হ্যাঁ আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?

—না।

—আমার মনে হয় মাতালেরা ইঁদুর কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা জিনিষ দেখলেও ভূতের ভয় পায়। আপনি বোধহয় ঐ ধরনের কিছু বলছেন।

এরপর বুঝতে পারি মার্টিন আমায় কোন ভূতের গল্প শোনাতে আসেনি, আর সে কথা প্রসঙ্গে অ্যান্না স্মিডের কথা তুললো! তার ব্যাপারে সে দারুণ চিন্তিত। অন্তত তার কথায় তাই মনে হলো।

তারপর মার্টিন বললো, কাল শেষ রাতে একটা লোক আমায় অনুসরণ করেছিল, কিন্তু পরে আমি তার কোন হদিস পাইনি। অথচ আমি ওর পিছু নিয়েছিলান। এরপর লোকটা যেন কোথায় মিলিয়ে গেল, আর তখন আমার মনে হয়েছে, মৃত হ্যারি লাইম যেন আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—করুন।

—তখন কি আপনি মদ খেয়ে হাঁটছিলেন?

—কেন বলুন তো?

—আগে আমার কথার জবাব দিন। পরে বলছি।

—হ্যাঁ, তখন আমি মদ খেয়েছিলাম।

—তাহলে যা ভেবেছি ঠিক তাই।

—আপনি কি ভেবেছেন?

—ও সব মদের খেয়ালে.. …।

—কিন্তু তখন আমার এমন অবস্থা ছিল না যে এতটা ভুল করবো, আর মদ তো আমি নতুন খাচ্ছি না।

—যাইহোক তারপর কি করলেন ?

—কিছু দূরে একটা রেস্তোঁরা পেয়ে এক পেগ মদ খেলাম, কারণ তখন আমার স্নায়ু ঝিমিয়ে পড়েছিল।

—আশাকরি তখনই ভূতটা নিশ্চয়ই আপনার মধ্যে আবার ফিরে এসেছিল, আমি মার্টিনের দিকে তাকাই।

—না, তা আসেনি! আমি ঐ রাতেই আবার অ্যান্নার ফ্লাটে ফিরে গেছিলাম। মার্টিন জানায়।

বাজে ভূতের গল্প বলতে আমায় আসেনি! এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল। যা আমি পরে জানতে পেরেছি, কারণ অ্যান্না স্মিডের বিপদের জন্য সে আমার কাছে ওরকম ভাবে ছুটে এসেছিল।

মার্টিনের কথা শেষ হলে আমার মনে হলো, একটা লোক তাকে ঠিকই অনুসরণ করেছিল, কিন্তু সেই লোকটাকে মার্টিন হ্যারির ভূত বলে ভুল করেছে। আসলে ঐ লোকটা মার্টিনকে অ্যান্নার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দলের লোকেদের সাবধান করে দিয়েছে।

সেই রাতে ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটতে থাকে। আপনাদের মনে আছে, কার্টস রাশিয়ার অঞ্চলে বাস করে। তার টাকা আছে, ফলে সে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি!

ভিয়েনা মিলিটারী পুলিশের ব্যবস্থাগুলো যেন অদ্ভুত ধরনের। এক অঞ্চলের লোকেদের পক্ষে অন্য অঞ্চলের লোকেদের তাড়াতাড়ি ধরা একটু মুশ-কিলের ব্যাপার। প্রত্যেক অঞ্চলের খুঁটিনাটি শাসন ব্যবস্থা অন্য অঞ্চলের লোকেদের মেনে চলতে হয়।

রাত চারটে। তখন মার্টিন অ্যান্নার ফ্ল্যাটে হাজির হয়। অ্যান্নার ফ্ল্যাটের দরজা খোলা।

ইতিমধ্যে মার্টিন অনেকটা উপরে উঠে এসেছে, সে আর একটু উপরে উঠতে গিয়ে বাধা পায়। ফলে তাকে সিঁড়ির মাঝে থমকে দাঁড়াতে হয়। সে একটু হাঁপাচ্ছে।

মার্টিন ঘাড় ফিরিয়ে নিচের দিকে তাকায়। কে যেন তাকে ডাকছে। সে একটু আগে এটাই ভাবছিল।

—মিঃ মার্টিন, ও মিঃ মার্টিন।

মার্টিন নিচের দিকে তাকিয়ে বললো, আমায় কিছু বলছেন ?

—হ্যাঁ।

—বলুন।

—আন্তর্জাতিক টহলদারী পুলিশ অ্যান্নাকে তুলে নিয়ে গেছে।

—অ্যান্নাকে ?

—হ্যাঁ।

—কি সব আজে বাজে বকছেন !

—আজে বাজে নয় ঠিকই বলছি। আমার কথা মিথ্যে হলে আপনি উপরে গিয়েই টের পেয়ে যাবেন।

—আসলে এখন রাশিয়ার উপর নিরাপত্তার ভার। রাশিয়ার কাছে খবর ছিল অ্যান্না তাদেরই নাগরিক।

—অ্যান্না রাশিয়ান নাগরিক ?

—হ্যাঁ তারা তাই বলেছে ! তার এখানকার কাগজপত্তর সব মিথ্যে।

—মিথ্যে ? মার্টিন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

—হ্যাঁ নাগরিকত্ব ভাঁড়িয়ে সে এখানে বসবাস করছে।

—না, না, এসব বাজে কথা।

এবার ঘটনায় আসা যাক্—

যখন চারজন আন্তর্জাতিক মিলিটারী পুলিশ বাহিনী পাহারা দিচ্ছিল তখন রাশিয়ানটা জীপের ড্রাইভারকে অ্যান্নার ফ্যাটের দিকে যাবার নির্দেশ দিল।

অ্যান্নার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করার আগে আমেরিকানটা জার্মানী ভাষায় রাশিয়ানটাকে জিজ্ঞাসা করলো ব্যাপারটা কি ?

ফ্রান্সের সৈনিকটা কিছু নিশ্চুপ। এ ব্যাপারে কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করে না।

রাশিয়ানটা বলতে গেলে জার্মানভাষা কিছুই বোঝে না। সে কতগুলো কাগজ পত্তর আমেরিকানটার দিকে এগিয়ে দিল।

আমেরিকানটা সেই কাগজ পত্তর দেখে আর আপত্তি করে না। তারা অ্যান্নার ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়ায়।

ব্রিটিশ সৈন্যটা কিন্তু উপরে উঠলো না। হাওয়া বেগতিক দেখে সে আমায় ফোনে সব জানায়। অবশ্য তার আগে আমি চিন্তিত ছিলাম।

সেজন্য কিছুক্ষণ পরে যখন আমি মার্টিনের ফোন পেলাম তখন আমি বুঝতে পারছিলাম; ও আমায় কিছু বলতে চায়। ও কিছু বলার আগেই আমি ওকে সব কিছু জানিয়ে দিলাম, কিন্তু এ খবরটা শুনে ও চুপ করে গেল, তা ওর পরের ঘটনা শুনে বুঝতে পারি। যাই হোক পরের ঘটনায় আসি।

আমেরিকানটা রাশিয়ানটাকে বলল অন্য দেশের নাগরিককে তোমার গ্রেপ্তার করার কোন অধিকার নেই।

তবে আমেরিকানটা দমবার পাত্র নয়। সে অনেকক্ষণ ধরে অ্যান্নার কাগজ-পত্তর পরীক্ষা করতে থাকে।

তখন আমেরিকানটা রাশিয়ানটাকে বললো, ওর কাগজপত্তর ওকে ফেরৎ

দিয়ে দাও।

তাতে রাশিয়ানটা ভ্রুক্ষেপ করে না। ফলে আমেরিকানটা ওর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে।

তা দেখে ব্রিটিশ মিলিটারীটা বললো, আমরা কাগজগুলো হেড কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করি!

যা হোক আমি যখন অ্যান্নার ফ্ল্যাটে আসছিলাম তখনই পথেই ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। দেখি ওদের গাড়িতে অ্যান্না।

তখন আমি ওদের গাড়িটা কাছে আসতে নির্দেশ দিই। তারপর গাড়িটা কাছে আসতে রাশিয়ানটাকে বলি, ব্যাপার কি?

রাশিয়ানটা কতগুলো কাগজ এগিয়ে দিতে তাতে আমি এক ঝলক তাকিয়ে বলি, অ্যান্নার বিরুদ্ধে কোন্ অপরাধমূলক কার্য কলাপের প্রমাণ নেই। থাক্, ওর বিরুদ্ধে আমি তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠাবো। আপাতত ওকে এখন ছেড়ে দিও।

॥ তের ॥

যখন মার্টিন সকালে আমার অফিসে এসব ঘটনাগুলো বলছিল তখন আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। প্রথমত আমি ভূতের গল্প বিশ্বাস করিনি।

দ্বিতীয়ত হ্যারি লাইমের মতো দেখতে লোকটাকে মার্টিন মদের ঝোঁকে একবারে ভুল দেখেছে তাও আবার মানতে পারছিনা!

যাক্ আমি ড্রয়ার থেকে ভিয়েনার ম্যাপ বার করলাম।

তারপর মার্টিনকে এক পেগ হুইস্কী দিয়ে চুপ করিয়ে রেখে রিসিভারটা তুলে নিলাম। আমার একটা ফোন করা দরকার!

আমার সেকসানের একজন জুনিয়ার অফিসারকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, হারবিলকে পাওয়া গেছে?

—না স্যার।

সে আরো জানায়, গত সপ্তাহে হারবিল তার পরিবারকে দেখতে অন্য একটা অঞ্চলে গেছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, অনুসন্ধানের ব্যাপারে যার উপর দায়িত্ব পড়ে তাকেই এ কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত। যাতে ভবিষ্যতে ব্যর্থতার জন্য অন্যকে দোষারোপ করতে হয় না। এখন দেখছি, হারবিলের ব্যাপারে আমার সব কিছু চিন্তা করা উচিত ছিল। তার অন্য কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করা দরকার ছিল, কিন্তু এখন দেখছি, অন্যের উপর নির্ভর করে চরম বোকামির পরিচয় দিয়েছি।

ফোনে জুনিয়ার অফিসারকে বললাম, চেষ্টা চালিয়ে যাও। একটুতেই হাল ছেড়ে দিও না। কোন খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় জানিও।

একটু পরে জুনিয়ার অফিসার আমায় ফোন করে ক্ষমা চেয়ে বললো, স্যার, ও তো খুন হয়ে গেছে।

—খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—তুমি বলছো কি?

—স্যার, ঘটনাটা কিন্তু তাই।

এখন দেখছি, প্রথমে মার্টিন আমায় ঠিকই বলেছিল। অথচ তখন ওকে আমি মদ মাতাল কত কি বলেছি। সত্যি, আমার বোকামির যেন শেষ নেই।

শেষে জুনিয়ার অফিসারকে হারবিলের ব্যাপারে বিস্তারিত খবর জানতে বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

এবার আমি মার্টিনের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম, সেই লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেই জায়গাটা কোথায় তা আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা দোলায়।

—চলুন যাওয়া যাক্।

—কিন্তু অ্যান্নার ব্যাপারটা কি হবে? ওকে তো ফের ওরা নাজেহাল করতে পারে তার কি ব্যবস্থা নেবেন?

—অ্যান্নার ফ্ল্যাটের বাইরে আমার পুলিশ পাহারা রয়েছে। তাই ও ব্যাপারে আর চিন্তা না করলেও চলবে।

—চলুন, একবার ওখানে যাওয়া যাক।

—হ্যাঁ চলুন।

এরপর আমরা নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। রোদের তাপ খুব একটা বেশী নয়। আকাশে মেঘ আর সূর্যের লুকোচুরি খেলা চলছে। রাস্তার দু'দিকে বরফগুলো অবহেলা ভরে পড়ে রয়েছে। পথচারীদের পরনে ভারী পোশাক।

আমি ইচ্ছে করেই গাড়ি সঙ্গে নেইনি। পরনে আমার সাদা পোশাক। আর চলেছি আমরা ট্রামে করে।

ট্রাম থেকে নেমে বেশ খানিকটা হাঁটার পর মার্টিন আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললো, কর্ণেল এখানে।

আমি নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে তাকাই। সামনে একটা পুরনো পাঁচিল। পাঁচিলের গায়ে শেওলা জমেছে। আগাছায় ভরা। বুনো ঘাসগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার আমি ভালো করে সেই পাঁচিলের দিকে তাকাই। একটু এগিয়েও গেলাম। কাছে যেতে কিছুটা চমকে উঠলাম। ওখানে যে ওটা থাকতে পারে তা আদৌ ভাবতে পারিনি। পাঁচিলের গায়ে একটা ছোট দরজা দেখতে পেলাম।

হঠাৎ আমার কি মনে হতে দরজাটা ধরে একটান মারলাম। টান মারতেই যে দরজাটা ওভাবে খুলে যাবে তাও ভাবতে পারিনি। দরজাটা খুলে যেতে আমি এবং মার্টিন দু'জনেই ভেতরের দিকে তাকালাম। দেখলাম। কতকগুলো সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে।

সিঁড়ি দেখে মার্টিন বলে, এসব যে কাণ্ড ঘটবে তা কে আগে জানতো!

আমিও মাথা দুলিয়ে মার্টিনের কথায় সমর্থন জানিয়ে বলে, সত্যি, এটা কারুর জানার কথা নয়। ওখানে একটা দরজার কথা অনেকেই ভাবতে পারে না।

—আমার মনে হয় লোকটাকে আমি ঠিক দেখেছি।

—এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মার্টিন একটু চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, কর্ণেল এ সিঁড়িগুলো কথায় চলে গেছে?

আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, আমার যতদূর মনে হচ্ছে এ

সিঁড়িগুলো যুদ্ধের সময় তৈরি হয়েছিল।

—গত যুদ্ধের সময়? মার্টিন বিস্ময় প্রকাশ করে।

—হ্যাঁ।

—সে তো অনেক দিন আগের ব্যাপার দেখছি। আর এগুলো কোথায় গিয়ে মিশেছে বলে মনে হচ্ছে?

—সুরঙ্গের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। ভিয়েনার নিচে এই সুরঙ্গগুলো একটার সঙ্গে একটা যুক্ত এবং এগুলো শহরের প্রধান ড্রেনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। এ রকম দরজা বলতে গেলে সারা ভিয়েনায় ছড়িয়ে রয়েছে। আসলে এগুলো তৈরি হয়েছিল বোম্বিং-এর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য।

একটু থেমে আমি আরো বলি, এই সুরঙ্গগুলোকে পাহারা দেবার জন্য অস্ট্রিয়ানদের বিশেষ পুলিশ বাহিনী আছে,

আর এর যে কোনো একটা দরজা দিয়ে ঢুকে ভিয়েনার যে কোন অঞ্চলে ওঠা যায়।

মার্টিন বিস্ময়ে হতবাক, বলেন কি?

আমি মাথা নাড়ি। তারপর বলি, এই হচ্ছে সেই রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে আপনার বন্ধু হ্যারি অন্তর্ধান হয়েছে।

—হ্যারি? মার্টিন ভীষণভাবে চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—বলছেন কি? মার্টিন কথাটা মোটেই বিশ্বাস করতে পারে না। আর পারবেই বা কি করে! যেখানে হ্যারিকে কবর দেওয়া হয়েছে কয়েকদিন আগে।

—আমি ঠিকই বলছি, আমি জোরের সঙ্গে কথাটা জানাই। আপাতত সমস্ত প্রমাণ ঐদিকেই ইঙ্গিত করছে।

—কিন্তু···, তবু মার্টিন কথাটা আদৌ মানতে পারছে না।

—কিন্তু কি?

—একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

—কোন কথাটা?

—তাহলে সেদিন ওরা কাকে কবর দিল?

—আমি এখনো তা জানি না। তবে এখানে আসার আগে একটা কাজ করার নির্দেশ দিয়ে এসেছি।

—কোন কাজ? মার্টিন জানতে চায়। কথাটা বলেই সে আবার সঙ্গে সঙ্গে বলে, অবশ্য বলতে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

—না, না, আপত্তির কিছু নেই।

—তাহলে বলুন।

—কবরটা তুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে এসেছি।

—কবরটা ? মার্টিন আঁতকে ওঠে।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কবরটা যদি ওরা সরিয়ে ফেলে ?

—এখনো ফেলেনি। সে খবর আমার কাছে আছে। আর আমার লোক এতক্ষণে হয়তো কবরটা তুলে ফেলেছে।

তুললেই আসল সত্যটা জানা যাবে।

একটু থেমে আমি আবার বলি, শুধু হেরচকই নিহত হয়নি। আরো একজন খুন হয়েছে

—আরো একজন ?

—হ্যাঁ।

—সে কে ?

—এখন তা বলতে পারছি না।

—না বলতে চান না ?

—জানি না। জানলে বলতাম এবং আমি বাজী ধরে বলতে পারি, হ্যারি এই সুরঙ্গের কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে।

—হ্যারি এর মধ্যে রয়েছে ?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

তারপর আমি মার্টিনের দিকে তাকিয়ে ফের বলি, হ্যারির মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সবই সাজানো ছিল।

—আমার মাথায় কিছুই আসছে না।

—খুবই স্বাভাবিক।

মার্টিন এসব পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না। বলে, অথচ দুর্ঘটনার পর হেরচকতো হ্যারির মুখ দেখে চিনেছিল এবং বলেছিল, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

মার্টিন চিন্তিত মুখে আবার বলে, সত্যি, ব্যাপারটার মধ্যে যে এত রহস্য লুকিয়ে আছে তা কে জানতো ?

মার্টিন নিজের মনে আবার বলে, একবার হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হতো।

—তা ঠিকই।

—তবে হ্যারিকে পাচ্ছি কোথায় !

—তা পাওয়া যাবে হয়তো। তবে আপনি একমাত্র লোক যে, হ্যারি আপনার সঙ্গে কথা বলতে কোন আপত্তি করবে না। যদিও এটা আপনার পক্ষে একটা বিপদজনক ব্যাপার।

—বিপদজনক ব্যাপার কেন বলছেন ? মার্টিন অবাক না হয়ে কিছুতেই পারে না। হ্যারি তো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

—বিপদজনক বলছি এই কারণে যে, ইতিমধ্যে আপনি ওর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছেন।

—তা অবশ্য ঠিকই। তবু হ্যারি হ্যারিই। ও আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

—না করতে পারলেই ভালো।

—করবে না। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—আপনার বিশ্বাস অটুট থাকুক। সেটাই আমি চাই।

—তারপর মার্টিন বলে, আমি ওকে এক পলকের জন্য দেখেছিলাম। তাই ভাবছি, ও সত্যি হ্যারি ছিল কি না! একটু থেমে মার্টিন আবার বলে, কর্ণেল, এবার বলুন, আমি কি ভাবে এগবো।

—আমার মনে হয়, হ্যারি এ অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না। কর্নেল জানায়।—কেন বলুন তো?

—গেলে ওর অসুবিধে হবে।—কি ধরনের অসুবিধে হতে পারে বলে আপনার ধারণা? নিরাপত্তার অভাব হতে পারে?

—হ্যাঁ, তা হতে পারে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, একমাত্র আপনিই হ্যারিকে সুরঙ্গের বাইরে আসতে বলতে পারেন।

--আমি বললে ও কথাটা রাখবে?

—এটা একটা ভাববার প্রশ্ন বটে। হয়তো রাখলেও রাখতে পারে। যদি এখনো ও আপনাকে বন্ধু হিসেবে মনে করে।

—বাঃ, করবে না! আমি যে ওর ছোটবেলাকার বন্ধু। এর আগে এক সঙ্গে কুড়িটা বছর আমরা একত্রে কাটিয়েছি।

তারপর মার্টিন একটা কথা ভেবে বলে, তবে তার আগে আমি একবার কার্টসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কার্টসের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—তবে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাবধান করে রাখতে চাই।

—কেন বলুন তো?

—আমার অঞ্চল থেকে গেলে আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি কিন্তু পুরোপুরি নিতে পারবো না।

—না। অসুবিধে থাকবে। আর আপনার বন্ধু হ্যারিও কিন্তু চাইবে না যে, আপনি আমার অঞ্চল ছেড়ে রাশিয়ান অঞ্চলে যান। কর্ণেল জানায়।

এ কথা শুনে মার্টিন থমকে যায়। তবুও তারপর মুহূর্তে সে দৃঢ় কন্ঠে বলে, আমি পুরো ব্যাপারটা ভালো ভাবে বুঝে নিতে চাই। তাই আমার কার্টসের সঙ্গে দেখা হওয়া খুবই প্রয়োজন।

॥ চোদ্দ ॥

আজ রবিবার। দুপুরবেলা, বাতাস একবারে নেই। মেঘলা আকাশ। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বরফও পড়ছে না। রাস্তায় লোক চলাচলও কম। মার্টিন রাশিয়ান অঞ্চলে প্রবেশ করতে একটা নোটিশ বোর্ডের দিকে নজর পড়ে। বোর্ডে লেখা রয়েছে রাশিয়ান অঞ্চল।

তারপর মার্টিন হট করে কার্টসের বাড়ির দিকে রওনা হয় এবং এক সময় হাজির হয়। ইচ্ছে করেই টেলিফোনে তার উপস্থিতির খবর জানিয়ে এখানে আসেনি।

কলিং বেলের আওয়াজ হতে কার্টস এসে দরজা খোলে এবং মার্টিনকে দেখে অবাক হয়ে যায়, আপনি ?

মার্টিনের মনে হয়, কার্টস যেন কারুর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই তার উপস্থিতিটা সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না।

কার্টসকে দেখে মার্টিনের অন্য রকম মনে হলো। অবশ্য তার একটা সঙ্গত কারণও আছে। কার্টসের মাথায় চুল থাকা সত্ত্বেও সে পরচুলা ব্যবহার করে, কিন্তু এখন মার্টিন তার মাথায় সেই পরচুলা দেখতে পায় না। ফলে সে কিছুটা অবাক হয়ে যায়।

কার্টস মার্টিনের দিকে তাকিয়ে অসন্তুষ্টভাবে বলে, এখানে আসার আগে ফোন করে আসা উচিত ছিল।

—তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

—আমি তো একটু পরেই বেরিয়ে যেতাম।

—একটু পরের কথা বলছেন, এখন তো নয়, মার্টিন কার্টসের কথায় আমল না দিয়ে বলে। এখন আমি কি একটু ভেতরে আসতে পারি ?

—আসুন, কার্টস একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্টিনকে তার ঘরে আহ্বান জানায়।

—ধন্যবাদ! মার্টিন কার্টসের ঘরে প্রবেশ করে।

মার্টিন কার্টসের ঘরে ঢুকে দেখে, আলমারির একটা পাল্লা খোলা। তার ভেতর থেকে কার্টসের ওভার কোট, বর্ষাতি, কয়েকটা টুপী এবং পরচুলা দেখা যাচ্ছে।

মার্টিন কার্টসের দিকে তাকিয়ে পরিহাস করে হেসে বলে, তাহলে আপনার মাথায় চুল উঠেছে ?

মার্টিন এ কথা বলেই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখতে পায়, কার্টসের ভয় ও ঘৃণায় মুখের রং পাল্টাতে শুরু করেছে।

তারপর মার্টিন আয়নার দিক থেকে মুখ ফেরাতে কার্টস তার দিকে

তাকিয়ে সামান্য হেসে বলে, পরচুলটা মাঝে মাঝে খুলে রাখি। তবে ওটা পরলে মাথা বেশ গরম থাকে।

—কার মাথা? মার্টিন ব্যাঙ্গের সুরে বলে। দুর্ঘটনার সময় পরচুলা পরে থাকলে অতি সহজে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়।

কার্টস এ কথার কোন জবাব দেয় না। গম্ভীর হয়ে থাকে।

কার্টস চুপ করে থাকতে মার্টিন ফের বলে, যাই হোক, আমি হ্যারির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—হ্যারি? কার্টস চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ। আমি ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

—কথা?

—হ্যাঁ।

—ওর সঙ্গে?

—হুঁ।

—আপনি পাগল হয়ে গেছেন নাকি?

—পাগল? আমি?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

—যাক্। আমার একটু তাড়াহুড়ো আছে। তাই আমি আপনার কথার আর প্রতিবাদ করছি না।

—শুনে খুশী হলাম।

—এবার আমায় একটু খুশী করুন।

—খুশী করবো আপনাকে আমি?

—হ্যাঁ।

—কিভাবে?

—দয়া করে এই পাগলের দু'চারটে কথা আপনি শুনুন তাহলেই হবে।

—বলুন কি বলতে চান?

—যদি হ্যারি বা হ্যারির প্রেতাত্মার সঙ্গে আপনার দেখা হয় তাহলে আমার কথাটা জানিয়ে দেবেন। যাক্, এখন আমি আসি। আমি দু' প্রাটারের ভাঙা গীর্জার কাছে যে বটগাছটা আছে, ওখানে থাকবো।

একটু থেমে মার্টিন আবার বলে, ও হ্যাঁ, মনে রাখবেন, আমি হ্যারির একজন বিশ্বস্ত বন্ধু।

এমন সময় ভেতরের একটা ঘর থেকে কিসের যেন একটা আওয়াজ ভেসে আসে। মার্টিন সেই শব্দ অনুসরণ করে একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সে একটানে দরজাটা খুলে ফেলে। এটা একটা রান্নাঘর এবং তার ভেতরে একটা চেয়ারে ডাঃ উইংকলার বসে আছে।

মার্টিন ডাক্তারকে দেখে অবাক হয়ে যায়। তার কাছে গিয়ে বলে, আপনি

এখানে ? কি ব্যাপার ?

—মানে, ডাক্তার একটু ইতস্তত করতে থাকে।

—মানেটা কি ? মার্টিনের যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে। তারপর মার্টিন রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কার্টসের কাছে এসে বলে, ডাক্তারকে আমার পাগলামোর কথা বলবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি কোন ওষুধও দিতে পারেন। হ্যাঁ, আবার বলে যাই, প্রাটারের ভাঙা গীর্জার কাছে যে বটগাছটা আছে, সেখানে আমি ঘন্টা দুয়েকের জন্য অপেক্ষা করবো।

কথা শেষ করে মার্টিন ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

প্রাটার। ভাঙা গীর্জা,অদিদষ্ট বটগাছ।

এখানে মার্টিন প্রায় ঘণ্টা খানেক হল এসেছে। হ্যারির কোন দেখা নেই এবং সে বুঝতে পারছে না, ও আদৌ তার সঙ্গে দেখা করবে কি না।

মার্টিন চারদিকে তাকায়। পাহাড়ী এলাকা। সামনে দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে। জলে তেমন ঢেউ নেই। আকাশ সেই আগের মত ঘোলাটে। বরফ না পড়লেও বেশ একটা ঠাণ্ডা ভাব রয়েছে। হাওয়ায় হিমের পরশ।

মার্টিন সহসা চমকে ওঠে। সে যেন নিজের কান দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছে না, কিন্তু অবিশ্বাসই বা সে কতক্ষণ করবে ! ঐতো শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

সেই পরিচিত শব্দ। হিমেল হাওয়ায় তা যেন আরো রহস্যের সৃষ্টি করেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা যেন মার্টিনকে জানিয়ে দিচ্ছে, তুমি ভুল মোটেই শুনছো না, আর তুমি যে কালা সে অপবাদ নিশ্চয়ই কেউ তোমায় এতদিন দেয়নি।

হ্যারির সেই পরিচিত গানের শিস, ফলে সে উত্তেজিত। সে চারদিকে তাকাতে থাকে আর ভাবে, নিশ্চয়ই হ্যারি আশে পাশে কোথাও আছে। এ শিস হ্যারির না হয়ে কিছুতেই যায় না, আর কুড়ি বছরের একান্ত চেনা জানা অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর গলার আওয়াজ চিনতে সে এত ভুল করবে ? কখনোই নয়।

কে যেন সহসা মার্টিনের নাম ধরে ডাকে, রোলো মার্টিন ! মার্টিন চমকে পিছন ফিরে তাকায়, হ্যারি !

—হ্যালো মার্টিন ! হ্যারি হাসে। কেমন আছো ?

—হ্যারি, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, মার্টিনের এখনো উত্তেজিত ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি।

—নিশ্চয়ই, তা তো থাকবেই, হ্যারির মুখের হাসি এখনো অম্লান। আরো যেখানে তোমাকে আমি আসতে লিখেছি।

তারপর হ্যারি মার্টিনের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে আরো বলে, সত্যি মার্টিন, তোমায় অনেকদিন পরে দেখে আমার কিন্তু বেশ লাগছে।

—কেন, আমি তো তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলাম, মার্টিনের গলার স্বরে অভিমানের রেশ।

হ্যারি কিন্তু পরিহাসটাকে উপভোগ করে বলে, লোককে কেমন ফাঁকি দিয়েছি বলো !

—তোমার প্রেমিককে ফাঁকি দিয়ে তুমি কিন্তু মোটেই ভালো কাজ করোনি; মার্টিন আহত গলায় বলে।

—তুমি অ্যান্নার কথা বলছো ?

—হ্যাঁ। সে কিন্তু কাঁদছিল।

—সত্যি, মেয়েটা ভালো। আমি তাকে ভালোবাসি।

এবার মার্টিন অন্য প্রসঙ্গে এলো। বললো, তোমার সম্বন্ধে পুলিশ যা বলছে, তা কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করতে পারিনি। আচ্ছা হ্যারি, কি ব্যাপার বলতো ?

হ্যারি প্রথমটা মার্টিনের কথার জবাব দেয় না ! এরপর আস্তে বলে, তোমাকে আমি সব কথা সব সময় জানাই। কোন ব্যাপারই লুকোই না। তাই এখন তোমায় সব খুলে বলবো।

—বলো, মার্টিন জানতে চায়।

কথা শেষ করে হ্যারি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার মনের মাঝে ঘাত প্রতিঘাত চলছে। শুভ-অশুভ লড়াই।

তারপর মার্টিন নীরবতা ভঙ্গ করে বলে, শিশু হাসপাতালটা দেখেছো ? দেখলেই বুঝতে পারতে বাচ্চাগুলোর কি হাল হয়েছে !

—মার্টিন, অতি নাটকীয়তা ভালো নয়, হ্যারি নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলেছে। সে কিছুটা স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছে।

—তা জানি।

—একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতো !

—কেন ? নিচে কি আছে ?

—দেখই না।

মার্টিন নিচের দিকে তাকায়। সেখানে লোকজন চলাচল করছে। উপর থেকে তাদের যেন বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

হ্যারি বলে, নিচের ঐ বিন্দুগুলো থেকে যদি দু'চারটে থেমে যায় তাহলে এই সমাজের কিই বা ক্ষতি হবে !

কথা শেষ করে হ্যারি মাথা দোলায়। কিছুই না।

—হ্যারি, তুমি বলছো কি ! মার্টিন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে গলা চড়ায়। তোমার মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে গেছে নাকি !

—না বন্ধু, একটা বিন্দু থেমে গেলে যদি তোমার পকেটে কুড়ি হাজার পাউণ্ড আসে, তাহলে কেমন হয় ?

মার্টিন অধৈর্য হয়ে ওঠে, তুমি টায়ারের ব্যবসায় থাকলে না কেন ?

—ওতে যে লাভ কম হয়।

—তুমি তো তাতে মনের শান্তি পেতে।

—শান্তি ?

—হ্যাঁ।

—কুলারের মতন, হ্যারি মাথা নাড়ে। না, না। এত ছোট কাজের মধ্যে আমি নেই, আর তুমি দেখে নিও মার্টিন, পুলিশ আমায় ধরতে পারবে না। আমি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবো! পুলিশ আমার কিছু করতে পারবে না।

—কিন্তু সেটা কি একটা বাঁচা ?

মার্টিন বুকে একটা যন্ত্রনা অনুভব করে আর ভাবে, তার সেই প্রাণের বন্ধু হ্যারি, আজ এত নিচে নেমে গেছে। ভাবতেও তার রীতিমতন অবাক লাগছে, আর ওর নিচতার কথা চিন্তা করে হঠাৎ সে ভাবে, হ্যারিকে এখান থেকে ধাক্কা মারলে সে ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে চিরতরের জন্য স্থির হয়ে যাবে। বাঁচার কোন সম্ভবনাই থাকবে না।

যাক্, মার্টিন নিজের চিন্তা থেকে বিরত হয়ে জানায়, হ্যারি, তুমি জানো, পুলিশ তোমার কবর খুঁড়ে দেখেছে ?

—শুনেছি।

—তবু তুমি নির্বিকার ?

হ্যারি হাসে, কিছু বলে না।

—এবার আমার একটা কথার জবাব দেবে ?

—কোন কথার ?

—বলো, তুমি দেবে কি না ?

—দেবার হলে আমি নিশ্চয়ই দেবো।

—ঐ কবরে কে আছে ?

—হারবিল, হ্যারি সহজভাবে উত্তর দেয়।

—হারবিল ?

—হ্যাঁ।

তারপর মার্টিনের মুখে আর কোন কথা যোগায় না। সে যেন কেমন বোকা হয়ে যায়, আর ভাবে, মানুষ কি এমন পরিস্থিতিতে পড়লে এমনভাবে পাল্টে যেতে পারে, তা তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুতেই আসছে না।

মার্টিন মনে মনে বলে ওঠে, টাকাটাই কি সব ? আর বিবেক ? আর শুভ চিন্তা ? এসব কি শুধুই কতগুলো গাল ভরা কথা, যা নাটক বা উপন্যাসে লিখে মন কাড়া যায় ?

অবশেষে মার্টিন রাগতভাবে বলে, এখন তোমায় আমার কি করতে ইচ্ছে করে জানো ?

—কি ?

—বলবো ?

—বলো।

—তোমাকে এই পাহাড়ের উপর থেকে ঠেলে যদি নিচে ফেলেদি।'

—না বন্ধু, তা তুমি পারবে না, হ্যারি হেসে বলে, সে বিশ্বাস আমার আছে। কারণ এর আগে আমার বহু ছোটবড় অপরাধ জেনেও তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করোনি। আমাকে ক্ষমার চোখে দেখেছো। তাই তোমাকে আমি সে কোন পরিস্থিতিতেই বিশ্বাস করতে পারি। ফলে তোমার ডাকে আমি সাড়া না দিয়ে কিছুতেই থাকতে পারিনি।

হ্যারি একটু থেমে আবার বলে, অথচ এখানে আসার আগে কার্টস আমায় বারণ করেছিল, তা সত্ত্বেও আমি এসেছি। আসলে আমি যে তোমায় এখনো ভালবাসি।

—ভালোবাসো?

—হ্যাঁ।

—তা কার্টস আমায় কি বলেছে জানো?

—উহুঁ।

—তোমায় মেরে ফেলতে।

—মেরে ফেলতে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু হ্যারি, গায়ের জোরে তুমি আমার সঙ্গে আদৌ পারবে না, মার্টিন জানায়।

—সব সময় কি গায়ের জোর দরকার হয়?

—তা অবশ্য হয় না, ঠিকই।

—তাছাড়া, আমার সঙ্গে রিভলবার আছে।

—তা তো থাকবেই।

—থাকবে কেন বলছো?

—নইলে তোমায় মানাবে কেন।

—তোমার এ কথার অর্থ আমি বুঝলাম না।

—খুবই সহজ।

—তুমি বলো, তোমার সেই সহজ কথাটা শুনি।

—একদিন তুমি যে হাতে ছুরি কাঁচি ধরতে শিখেছিলে, আর আজ সে হাতে তোমার পিস্তল। সত্যি, ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! মার্টিন গম্ভীর মুখে কথাটা বলে।

—ও সব তত্ত্ব কথা। ছাড়ো!

—তা নয়তো কি!

—তা তো বলবেই। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

—রাখো তোমার ধর্মের কাহিনী।

—তা তো তুমি বলবেই।

—জানো, তুমি নিচে পড়ে গেলে তোমার ভাঙাচোরা দেহগুলোর চিহ্ন কেউ খুঁজে পাবে না।

—ও সব ডাক্তারী শাস্ত্রের কথা। তা তুমি জানবে বই কি!

তারপর হ্যারি নিজেকে স্বাভাবিক করে বলে, মার্টিন কি বোকার মত আমরা দু'জনে করছি। বাদ দাও। চলো, এবার ফেরা যাক্।

—ফিরবে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কোথায়?

—তার আগে তুমি বলো, তুমি কার্টস আর ডাক্তারের পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবে না তো?

—সেটা পরের কথা।

—জানো, কার্টস তোমায় ও কথা বলেনি। আমি ওকথা বলে তোমায় সঙ্গে একটু ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা?

—হ্যাঁ। বিশ্বাস করতে পারো। আমি একটুও বানিয়ে বলছি না।

বলেই হ্যারি কোথায় যেন হাওয়ার মাঝে মিলিয়ে গেল।

—হ্যারি! হ্যারি! হ্যারি! মার্টিন চেঁচিয়ে হ্যারিকে ডাকতে থাকে। তার ডাক পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে এক সময় চুপ করে যায়। তুমি আমায় বিশ্বাস করো না?

কিন্তু মার্টিনের এ কথা কি হ্যারি শুনতে পেয়েছিল?

॥ পনেরো ॥

মার্টিন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কর্ণেল, রোববার সন্ধ্যেয় অ্যান্না ঘোশেফস্টাডে অভিনয় করছিল। সেদিন ও অ্যান্নার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষায় ছিল। থিয়েটার শেষ হতে ও অ্যান্নার ঘরে প্রবেশ করে বললো, তোমায় একটা খবর জানাতে এসেছি।

—কি খবর? অ্যান্না জানতে চায়।

—খবরটা শুনলে তুমি চমকে উঠবে।

—চমকে উঠবো?

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা নাড়ে।

—তা খবরটা কি?

—তার আগে তুমি বলো, আমার কথা বিশ্বাস করবে?

—বিশ্বাস না করার কি আছে!

—হ্যারি..., মার্টিন কথাটা শেষ করতে পারে না।

—হ্যারি কি? বলো? থামলে কেন?

—হ্যারি বেঁচে আছে।

—হ্যারি বেঁচে আছে? অ্যান্না মার্টিনের কথাটা পুনরুক্তি করে ঈষৎ চেঁচিয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, মার্টিন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে।

—না, না, তুমি মিথ্যে বলছো!

—মিথ্যে?

—হ্যাঁ।

—আমি? তোমাকে?

—হ্যাঁ, এ কথা না বলে আমি পারছি না।

—অ্যান্না, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো। তোমায় আমি মিথ্যে বলছি না, আর মিথ্যে বলে আমার লাভ কি!

—তা তুমি জানো।

—এরপর আমার কিছুই বলার নেই?

—তারপর অ্যান্না আর কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

মার্টিন ভেবেছিল, অ্যান্না এই কথাটা শুনলে খুশী হবে এবং তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলবে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, হ্যারির কোন ব্যাপারে অ্যান্না খুশী হোক তা সে আদৌ চায় না।

অ্যান্না এখন মেকাপ করার আয়নার সামনে বসে কথাটা শুনলো। কথার

উত্তর দেবার বদলে এখন তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকে। এতে তার মেকাপ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অ্যান্নার এই দুঃখ ভরা মুখ মার্টিন কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। এখন সে ভাবে, এর চেয়ে অ্যান্না খুশী হলে সে সন্তুষ্ট হতো।

তবু এ সময় মার্টিনের অ্যান্নাকে সুন্দরী লাগে এবং ওর প্রতি ভালোবাসাটা তীব্র হয়ে ওঠে। এরপর তার হ্যারির সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে তা সে একে একে সব জানায়।

মার্টিন লক্ষ্য করেছে, তার কথাগুলো অ্যান্না খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শোনেনি !

মার্টিনের কথা শেষ হতে অ্যান্না হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে বলে, এর চেয়ে হ্যারি মরে গেলেই অনেক ভালো ছিল।

মার্টিন অ্যান্নার কথায় সায় জানিয়ে বলে, তুমি ঠিকই বলেছো। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা ! ও আমাদের ভালোবাসার কোন দাম দিল না। ওর কথাটা আফসোসের মত শোনায়।

—সে কথা আমি আর ভাবি না। ও মারা গেলে এখন অনেক বিপদের হাত থেকে রেহাই পেত।

তখন আমি মার্টিনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি সেই হতভাগ্য বাচ্চাগুলোর ছবি অ্যান্নাকে দেখিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ, মার্টিন মাথা নাড়ে। আমি চেয়েছিলাম, সব শেষ হয়ে যাক্। অ্যান্না আবার নতুনভাবে বাচুক !

মার্টিন ছবিগুলো অ্যান্নার টেবিলে রাখে। যাতে ওগুলো ওর চোখে পড়ে।

অ্যান্না ছবিগুলো দেখার পর মার্টিন বললো, হ্যারিকে এ অঞ্চলে আনতে না পারলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না।

—হুঁ, এর বেশী অ্যান্না কিছু বলে না।

—সুতরাং তোমার সাহায্য দরকার।

—সাহায্য আমার ?

—হ্যাঁ।

—এটা তুমি কি বলছো !

—আমি ঠিকই বলছি।

মার্টিন গুম হয়ে থাকে। কোন উত্তর দেয় না।

—কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তুমি তার একজন প্রকৃত বন্ধু। অ্যান্না শ্লেষের সঙ্গে কথাটা বলে।

—বন্ধু ছিলাম।

—ছিলে ?

—হ্যাঁ। এখন নয়!

—তাহলে তুমি তো এখন তাকে ধরিয়ে দিতে চাইবেই।

—হ্যাঁ, চাইছি।

তারপর মার্টিন রেগে ওঠে। বলে, সে আমার ভালোবাসার কোন মূল্য দিয়েছে? সে আমাকে ঠকিয়েছে। হ্যাঁ, এ কথা আজ বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

এরপর অ্যান্না যেন কি বলতে যাচ্ছিল। তা তার বলা হয় না। সে বাধা পায়। ফলে থেমে যায়।

মার্টিন আবার বলে, সে তোমায় নিঃস্ব করেছে।

—তবু হ্যারিকে ধরতে তোমায় আমি কখনোই সাহায্য করবো না।

—করবে না।

—না। তবে···।

—তবে কি?

—আমি আর হ্যারিকে দেখতে চাই না। এমন কি তার গলার আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে চাই না।

—সত্যি, তুমি একজন উঁচু দরের অভিনেত্রী।

—হঠাৎ এ কথা?

—বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি।

—কিসের জন্য?

—সার্থক তোমার অভিনয়। হ্যারির প্রেমে এখনো আবার হাবুডুবু খাচ্ছো। সুন্দর অভিনয়।

—আমি অভিনয় করছি?

—তা নয়তো কি।

—কথাটার মানেটা একটু বুঝিয়ে বলবে?

—কিন্তু আমার কথাটা তো জলের মত পরিষ্কার।

—তবু তার মানেটা আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই।

—হ্যারির সঙ্গে দেখা করতে চাইছো না। এমন কি তার গলার স্বর পর্যন্ত শুনতে চাই না। অথচ তাকে তোমার ধরিয়ে দিতে বাধছে।

মার্টিন চিবিয়ে চিবিয়ে আরো বলে, সত্যি, তোমাদের নমস্কার। সার্থক সৃষ্টি ভগবানের। তোমাদের কোনটা 'হ্যাঁ', আর কোনটা 'না', তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। হাসতেও যেমন তোমাদের সময় লাগে না, তেমন কাঁদতেও।

—তুমি আমাকে যতই বোঝাও, কিংবা আঘাত করো, তবু তুমি আমায় পথ থেকে টলাতে পারবে না।

—বাঃ, চমৎকার!

—এবং শুনে রাখো, আমি এমন কোন কাজ করবো না যাতে হ্যারির কোন ক্ষতি হয়।

—সুন্দর! সুন্দর! হাততালি পাবার মত ডায়লগ। মার্টিন জানে না কেন একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে এবং সে একই-ভাবে অ্যান্নার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি কি এখনো হ্যারিকে চাও। কথাটা না বলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

—আমি তাকে চাই না ঠিকই, কিন্তু··· ।

—কিন্তু কি?

—আমার রক্তের কোষে ও যেন একাকার হয়ে মিশে রয়েছে এবং আমি এখনো যখন কোন পুরুষের স্বপ্ন দেখি তখন সে পুরুষ হ্যারিই। অন্য কেউ নয়।

মার্টিন ভাবে, এরপর এখানে বসে থেকে নিজেকে অপমানিত করার কোন মানে হয় না। তাই সে অ্যান্নার কাছ থেকে যাবার কথা না বলেই সিঁড়ি ভেঙে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকে।

তারপর মার্টিন আমার কাছে ফিরে এসে বলে, কর্ণেল, এবার আমায় কি করতে হবে বলুন?

আমি বললাম, এবার শেষ দৃশ্যের অভিনয় হবে।

মার্টিন বলে, সেটা কি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে?

—আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।

—ও হ্যাঁ ভালো কথা। কফিন থেকে মৃতদেহ তোলা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—ওটা কার?

—হারবিলের।

—তবে হ্যারির কথাই ঠিক।

—আর এখন আমরা ডাক্তার এবং কুলারকে গ্রেফতার করতে পারি, আমি জানাই।

—তাহলে খুবই ভালো হয়!

—তবে কার্টস এবং ড্রাইভার এখন আমাদের আওতার বাইরে।

—কেন?

—রাশিয়ানদের কাছে অনুমতি চাইতে হবে। কার্টস এবং হ্যারিকে গ্রেফতারের জন্য এটা দরকার।

একটু থেমে আমি আবার বলি, আপনি একটা কাজ করতে পারবেন? খুব ভালো হয়!

—কি কাজ?

—আপনি গিয়ে কুলারকে সাবধান করে আসুন।

—কুলারকে? আমি?

—হ্যাঁ।

—তাতে কি কাজটা ভালো হবে?

—হবে, আমি মাথা নেড়ে সায় জানাই।

—যদি এর বিপরীত ফল হয়?

—মানে বলছেন, কুলারের মনে সন্দেহ জাগবে। সে যদি পালিয়ে যায় এই তো?

—হ্যাঁ।

—আমি চাই, কুলার পালিয়ে যাক্, কিন্তু তাতে বড় শিকারীটা জালে পড়বে।

—কেন?

—আপনার উপর তখন হ্যারির বিশ্বাস জন্মাবে এবং ঘণ্টা তিনেক পরে আপনি হ্যারিকে খবর পাঠাবেন যে, পুলিশ আপনাকে খুঁজছে। এ সময় আপনার লুকিয়ে থাকা অবশ্য কর্তব্য। নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে।

এবার আমি মার্টিনের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করি, তা প্রস্তাবে আপনি রাজী আছেন তো?

আমি ইচ্ছে করে সেই বাচ্চার ছবিগুলো আমার ডেস্কের উপর ছড়িয়ে রেখেছি। অসুস্থ এবং বিকৃত বাচ্চার ছবি। মার্টিন ছবিগুলোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী।

—ধন্যবাদ।

—আমি খুনীর সঙ্গে কখনো আপোষ করবো না।

—এই তো চাই!

॥ ষোল ॥

পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গুলো ঠিক ভাবে চলছে। আমরা ডাক্তারের গ্রেফতার পিছিয়ে দিয়েছি, কারণ কুলারকে সাবধান করে দেওয়া দরকার ছিল।

কুলারের সঙ্গে কথাবার্তায় মার্টিন বেশ আনন্দ পেয়েছে। কুলার মার্টিনকে স্বাগত জানিয়ে বললো, আসুন মিঃ মার্টিন, আপনাকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে।

—ধন্যবাদ !

—আশা করি কর্ণেলের সঙ্গে আপনার ব্যাপারটা বিনা ঝামেলায় চুকে গেছে।

মার্টিন সবিনয় জানায়, কিছুটা ঝামেলা হয়েছে।

এ কথায় কুলার একটু চমকে গেল, কিন্তু দমে না গিয়ে বলে, হেরচকের ব্যাপারে আমি কর্ণেলকে কিছু জানিয়েছি বলে আপনি কিছু মনে করেননি তো ?

—এতে আমার মনে করার কি আছে !

—শুনে তো খুশী হলাম, আর আপনি তো নির্দোষ।

—কি করে জানলেন ?

—তা আমি, জানি।

—জেনে থাকলে খুবই ভালো কথা।

—সুতরাং আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

আর একটা কথা কি জানেন, সুস্থ নাগরিক হিসেবে কর্ণেলকেও সব জানানো কর্তব্য।

এবার মার্টিন ব্যাঙ্গের সুরে বললো, যেমন আপনি হ্যারির বেলায় পুলিশের কাছে মিথ্যে বলে সুস্থ নাগরিকের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কুলার মার্টিনের কথাটা এড়িয়ে বললো, সত্যি কর্ণেলের ব্যাপারে আপনি দারুণ রেগে গেছেন।

মার্টিন সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, পুলিশ কিন্তু সেই কবরটা খুঁড়ে ফেলেছে, আর তারা ডাক্তার এবং আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করবে।

কুলার এর কোনো উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে।

—আর আপনি হ্যারিকেও সাবধান করে দেবেন।

একটু পরে কুলার নিজেকে স্বাভাবিক করে নেয় এবং হ্যারির প্রসঙ্গ না তুলে বলে, গ্রেফতার ? ঠিক বুঝলাম না।

—ঠিকই বুঝেছেন। বলে মার্টিন এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। কুলারের ভালো মানুষী সে আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তার গায়ে জ্বলা ধরে যাচ্ছে।

ওদিকে প্রাথমিক কাজ শেষ। শুধু জাল পাতাটা যা বাকী। ভিয়েনার

ম্যাপটা দেখে আমার মনে হলো, হ্যারির বেরুবার সেটাই হলো সবচেয়ে ভালো রাস্তা, কারণ ঐ দরজার পঞ্চাশ গজ দূরে একটি রেস্তোরাঁ, আর কোন দরজার কাছাকাছি ও সব নেই! হ্যারি যখন বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য অন্য দরজা থেকে বেরিয়ে পঞ্চাশ গজ রাস্তা পার হয়ে ক্লাব থেকে বন্ধুকে নিয়ে আবার সেই পথেই চলে যাবে। তবে হ্যারি সম্ভবত জানেনা, ওর বন্ধুকে নিয়ে ঐ ভাবে পালানোর ব্যাপারটা আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। শুধু হ্যারি জানে, সুরঙ্গ পাহারা দেবার জন্য একটা দল রাত বারোটায় চলে যায়। আর দ্বিতীয় দল আসে রাত দুটোয়। সুতরাং হ্যারি বারোটা থেকে দুটোর মাঝে একটা সময় ঠিক করে বন্ধুকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে।

তাই মার্টিন আমার নির্দেশ অনুযায়ী, রাত বারোটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত সেই রেস্তোরাঁয় হ্যারির জন্য অপেক্ষা করছে। তবে যাবার আগে মার্টিনের আত্মরক্ষার জন্য আমি তাকে একটা রিভলবার দিয়েছি।

সেই নির্দিষ্ট দরজার অদূরে আমার লোকেরা সাদা পোষাকে গা ঢাকা দিয়ে আছে, আর সুরঙ্গ টহলদারীর একটা বিরাট দল প্রস্তুত হয়ে রয়েছে এবং আমার নির্দেশ পেলেই শহরের সমস্ত ম্যানহোল বন্ধ করে দেবে, আর ওরা শহরের প্রান্ত থেকে টহল দিতে দিতে এদিকে এগিয়ে আসবে, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম, নিচে নামবার আগেই হ্যারি ধরা পড়ুক। এতে যেমন একদিক দিয়ে ঝামেলা বাঁচে, তেমন অন্যদিকে মার্টিন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে।

বাতাস সহসা জোরে বইতে শুরু করলো। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্য কাপের পর কাপ কফি আনিয়ে মার্টিন হাতের তালু গরম রাখছে। কারণ কাপের চারপাশটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ভেতরে গরম হবার মতো কোন ব্যবস্থা নেই।

রেস্তোরাঁয় এখন অনেকে বসে পান করছে। মার্টিনের অদূরে আমার প্রেরিত একজন লোক বসে আছে, আর সেই লোকটিকে আমি মাঝে মাঝে পাল্টে দিচ্ছি, যাতে কেউ কোনো রকম সন্দেহ করতে না পারে। করলেই ব্যাপারটা একেবারে মাটি।

প্রায় একঘণ্টা পার হয়ে গেল। তবুও হ্যারির কোনো দেখা নেই।

মার্টিন হ্যারির দেখা পাবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমারও প্রায় সেই রকম অবস্থা।

আমি বেশ কিছুটা দূরে ফোন ধরে বসে আছি। আমার কাছে সুরঙ্গ টহলদারীর একটা পুলিশ দলকে রেখেছি, কারণ আমার প্রয়োজন হতে পারে।

মার্টিনের তুলনায় এসময় আমরা ভাগ্যবান, কারণ বেচারা ওখানে শীতে কাঁপছে, আর আমরা গরম পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে আছি। সত্যি, ঠাণ্ডাটাও পড়েছে বটে!

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। আমি ব্যস্ত ভাবে রিসিভার তুলতে মার্টিনের গলা পেলাম, কর্ণেল, আমি ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ দারুণ ঠাণ্ডা' পড়েছে আমি বলি।

—প্রায় সোওয়া একটা বাজে।

—সত্যি, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে!

—আর কি অপেক্ষা করার দরকার আছে?

—দরকার আছে বই কি!

—উ।

—আপনাকে আমার টেলিফোন করা মোটেই উচিত হয়নি। আপনি যেমন প্রকাশ্যে বসে আছেন, তেমন বসে থাকুন।

—এই রেস্তোরাঁর আমি অনেক কাপ কফি চেখেছি।

—আরো খান।

—এতে আমার গা গোলাচ্ছে।

—দেখুন মিঃ মার্টিন, হ্যারি যদি আসে তবে সে আর খুব একটা দেরি করবে না, আমি মার্টিনকে আশ্বস্ত করে বলি।

—আর এসেছে!

—অন্তত আর মিনিট পনেরো কুড়ি অপেক্ষা করুন।

—ঠিক আছে, করছি।

—আর ভুলেও আমায় টেলিফোন করবেন, একটু আগের মত এবারও চাপা গলায় কথা বলি!

—সঙ্গে সঙ্গে মার্টিনের গলা পাই, হায় ভগবান! ঐ তো হ্যারি। কথা শেষ হবার আগেই মার্টিনের টেলিফোন স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি সাথে সাথে ফোন নামিয়ে রেখে সহকারীকে নির্দেশ দেই, ম্যানহোলগুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে।

তারপর টহলদারী পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলি, এবার আমরা নিচে নামবো।

ঘটনা যা ঘটেছিল তা হলো, হ্যারি যখন রেস্তোরাঁয় ঢোকে তখন মার্টিন ফোন করছিল। জানি না তখন হ্যারি কতটা শুনেছে। যাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং যার ভিয়েনায় পরিচিত কেউ নেই, তাকে ফোন করতে দেখে হ্যারি সাবধান হয়ে পড়ে। তাই মার্টিন রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই হ্যারি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ে, আর ঠিক সেই সময় রেস্তোরাঁয় আমার লোক ছিল না।

লোক না থাকার কারণ হলো, একজন পাল্টে দ্বিতীয় জন তখন পথ বেয়ে রেস্তোরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল আর হ্যারি তার গা ঘেঁষে সেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তখন মার্টিন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আমার লোককে দেখতে পেল। মার্টিন যদি চিৎকার করতো তাহলে ওখান থেকে আমার লোক অতি সহজেই হ্যারিকে গুলি করতে পারতো. কিন্তু ঘটনা তা ঘটলো না। ফলে কাহিনী এগিয়ে চললো।

মার্টিন যখন চিৎকার করে বললো, ঐ তো হ্যারি।

হ্যারি তখন দরজা দিয়ে সুরঙ্গে প্রবেশ করছে।

যাক্ এখন আমরা সুরঙ্গে নেমে এসেছি। হাতে টর্চ। আর ভাবছি, আমাদের পায়ের নিচে যে এমন একটা আশ্চর্য রূপ রয়েছে। তা এতদিন জানতাম না।

এর বিভিন্ন দিক দিয়ে জল পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। সব সুরঙ্গগুলো কোমর পর্যন্ত জলে ভর্তি। ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার। সুরঙ্গের আসল পথটা প্রায় টেমসের অর্দ্ধেক।

ভেতরে জলের স্রোত রয়েছে। ফলে আমাদের পা ফেলতে বেশ অসুবিধে হচ্ছে। সুরঙ্গগুলো যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে অনেক কাদা জমেছে। সেই কাদায় পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারছি যে, হ্যারি কোন পথে এগিয়ে চলেছে।

আমার প্রহরীর বাঁ হাতে টর্চ এবং ডান হাতে রিভলবার। সে মার্টিনকে চাপা গলায় বললো, আপনি আমার পিছনে আসুন।

মার্টিন জানায়, পিছনে গেলে অসুবিধে হবে না?

—না। লোকটি মাথা নাড়ে।

—ওকে আপনি চিনতে পারবেন?

—হ্যাঁ, আর পিছনে যে বলছি এই কারণে যে, ও আপ-নাকে গুলি চালাতে পারে। ওটা একটা শয়তান।

—তাহলে আপনিই বা সামনে থাকবেন কেন? মার্টিন পাল্টা জবাব দেয়।

—এটা আমার একটা চাকরির অঙ্গ, বলে প্রহরী কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে চললো।

জলে পা প্রায় সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। এই সময় আমার প্রহরী বলে ওঠে-শয়তানটার বাঁচার কিন্তু কোন আশাই দেখছি না।

মার্টিন এর কোন উত্তর দেয় না।

প্রত্যেকটা ম্যানহোলে পাহারা রয়েছে, আর রাশিয়ান অঞ্চলের সমস্ত সুরঙ্গের পথটা আমরা ঘিরে ফেলেছি এবং আমরা সুরঙ্গ পথের ছোট ছোট গলি পথ ধরে আসল পথটার দিকে এগিয়ে চলেছি।

এবার আমার প্রহরী পকেট থেকে বাঁশী বার করে বাজাতে থাকে। ফলে চার পাশ থেকে অনেকগুলো বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসে।

প্রহরী বলে চললো, আমার বন্ধুরা অর্থাৎ সুরঙ্গ টহলদারী পুলিশেরা সবাই নেমে পড়েছে। তারা এই জায়গাটা নিজেদের পাড়ার গলির মতনই চেনে।

সামনের দিকে কি আছে তা দেখবার জন্য আমার প্রহরী টর্চ তুললো। আর ঠিক তখনই একটা গুলির শব্দ শোনা গেল।

প্রহরীর হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল এবং সে চীৎকার করে একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করলো।

আমি চিন্তিতভাবে প্রহরীর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কোথায় লেগেছে?

প্রহরী আমার হাত ছাড়িয়ে বললো, না, তেমন কিছু নয়। হয়তো হাতটা একটু ছড়ে গেছে, আর আমার সঙ্গে আরো একটা টর্চ আছে। এটা ধরুন। আমি ততক্ষণে হাতটা একটু বেঁধেনি, কিন্তু স্যার, দয়া করে টর্চটা জ্বালবেন না। শয়তানটা সম্ভবত কাছের একটা গলিতে লুকিয়ে আছে।

চারদিক চাপা থাকায় অনেকক্ষণ ধরে গুলির শব্দটা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তারপর সেই শব্দ মিলিয়ে যাবার পর কে যেন সামনে থেকে বাঁশী বাজিয়ে উঠলো। তাকে প্রহরীরা একইভাবে বাঁশী বাজিয়ে উত্তর দিল।

মার্টিন এবার প্রহরীকে জিজ্ঞেস করে, আপনার নামটা কিন্তু আমার এখনো জানা হয়নি।

—বেট্স, বলেই প্রহরী অন্ধকারে একটা দুঃখের হাসি হাসলো।

আজ কিন্তু আমার এখানে আসার কথা ছিল না। শুধু স্পেশ্যাল ডিউটি বলেই এখানে আসতে হলো।

মার্টিন এবার বললো, আমি এখন সামনে থাকবো। হ্যারি আমায় গুলি করবে বলে মনে হয় না। আর আমি এখন হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—কিন্তু স্যার, আমি দুঃখিত।

—কেন?

—আপনার যাতে কোন রকম ক্ষতি না হয় আমার উপর সেরকম নির্দেশ দেওয়া আছে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলেই মার্টিন বেট্সকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

তারপর মার্টিন চীৎকার করে ডাকে হ্যারি! হ্যারি!

কথাটা শুধু প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—হ্যারি, হ্যারি,······!।

মার্টিন আবার বলে হ্যারি লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি বলছি তুমি বেরিয়ে এসো।

হঠাৎ একটা খুব কাছ থেকে গলার আওয়াজ আমাদের চমকে দেয়। হ্যারির গলা শুনতে পাওয়া যায়। যাতে হ্যারি বলছে, বন্ধু, তুমি আমায় কি

করতে বলছো ?

—হ্যারি, মাথার উপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।

—আমার সঙ্গে টর্চ নেই আমি কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ পেছন থেকে বেট্‌স বলে উঠলো, স্যার, খুব সাবধান। এ কথা শোনার পর মার্টিন তার সঙ্গীদের বললো, আপনারা দেওয়ালে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়ান। তবে এ কথা ঠিক হ্যারি আমায় কখনোই গুলি করতে পারে না।

এরপর মার্টিন আবার হ্যারির উদ্দেশ্যে বলে উঠলো, হ্যারি, তোমার সাহায্যের জন্য টর্চ জ্বালছি। তুমি এবার বেরিয়ে এসো। তোমার আর কোনো পথ নেই। ধরা তোমায় পড়তেই হবে।

মার্টিন টর্চ জ্বালতে হ্যারি প্রায় কুড়ি গজ দূর থেকে বেরিয়ে এলো, আর বলাই বাহুল্য সেটা একটা গলি ছিল।

মার্টিন হ্যারিকে আসতে দেখে বললো, হ্যারি, হাত মাথার উপর রাখো।

হ্যারি মাথার উপর হাত রাখার ভান করেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায়, কিন্তু মার্টিনের কপাল ভালো। গুলিটা তার মাথার উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গিয়ে সুরঙ্গের দেওয়ালে প্রচণ্ড আঘাত করে।

সাথে সাথে বেট্‌স চীৎকার করে ওঠে, আর ঠিক তখনই একটা সার্চ লাইটের আলো সমস্ত সুরঙ্গ পথটা আলোকিত হয়ে ওঠে এবং সেই আলোয় মার্টিন, বেট্‌স, হ্যারি এবং আমাদের পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

এবার সুরঙ্গের টহলদারী দল আসল দৃশ্যে পেঁছে গেল।

বেট্‌স কিছুটা উপুড় হয়ে পড়েছে। তার দেহ আধ কোমর জলের মধ্যে রয়েছে। তার মুখ যন্ত্রনা ক্লিষ্ট।

মার্টিন এবার ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

হ্যারি মার্টিনের কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে।

আর এখন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, মার্টিনের গুলি লাগার ভয়ে আমরা হ্যারিকে গুলি করতে পারছি না।

সেই উজ্জ্বল আলোয় হ্যারির চোখ ঝাঁঝিয়ে গেল। ফলে আমরা রিভলবার তুলে আস্তে আস্তে হ্যারির দিকে এগোতে থাকি।

চোখ ঝাঁঝিয়ে যাওয়ায় হ্যারি জলে পড়া খরগোসের মতো বার কয়েক এদিক ওদিক করলো। তারপর সে বড় পথটার গভীর জলে কোন উপায় না দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমরা সার্চ লাইট ঘোরাবার অনেক আগেই হ্যারি জলের তলায় ডুব দিল, আর জলের স্রোত থাকায় তাকে সামনের দিকে নিয়ে চললো এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সে সার্চলাইটের আওতার বাইরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

মার্টিন এখন সার্চলাইটের পড়ন্ত আলোর শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে এবং তার

হাতে রিভলবার।

হঠাৎ আমার মনে হল সামনের দিকে কি যেন একটা নড়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে বলে উঠলাম, মিঃ মার্টিন! সাবধান আপনার বাঁ দিকে গুলি করুন।

শুনেই মার্টিন আর দেরি না করে গুলি চালালো এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বুক চিরে একটা যন্ত্রনার শব্দ ভেসে উঠলো, সাবাস! সাবাস!

আমি সামনের দিকে এগোতে গিয়ে বাধা পেলাম। ফলে আমি আর এগোতে পারি না। দেখি বেটসের দেহ জলে ভাসছে। তাতে প্রাণ নেই।

পরে বোঝা গেল, হ্যারি মার্টিনকে লক্ষ্য করে যে গুলি করেছিল তা মার্টিনের গায়ে লাগেনি। লেগেছে বেটসের গায়ে। যা ওকে চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিয়েছে।

বেটসের পাশে তখনো তার হলুদ রঙের গোল্ড ফ্ল্যাগের সিগারেটের প্যাকেটটা ভাসছে। ওর জন্য আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর আর পাড়ায় ফেরা হলো না।

যাক্, এবার আমি সামনের দিকে তাকাই। তখন দেখি, মার্টিনও অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গেছে! ফলে আমি মার্টিনের নাম ধরে ডাকি, মার্টিন! মার্টিন!

কিন্তু আমার আওয়াজ জলের প্রচন্ড শব্দে কিছুক্ষণের মধ্যেই হারিয়ে যায়, আর ঠিক তখনই আমি গুলির শব্দ পেলাম।

যাক্, পরে মার্টিন আমায় বলেছিল, আমি অন্ধকারে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছিলাম, কিন্তু টর্চ জ্বালতে সাহস হচ্ছিল না, কারণ তাহলে হ্যারি গুলি করার সুযোগ পেত। হ্যারি সম্ভবত আমার গুলিতে আহত হয়েছে এবং ঘটনাটা ঘটেছিল কোন একটা গলির মুখে। সেখান থেকে হ্যারি হামাগুড়ি দিয়ে ম্যানহোল থেকে নেমে আসা লোহার সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে গিয়ে থাকবে।

ম্যানহোলের ঢাকনা প্রায় ত্রিশ ফুট উপরে। ওখানে পৌঁছতে পারলেও ঢাকনা খোলার মত শক্তি তার থাকবে না, আর সে যদি ঢাকনা তোলেও তাহলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর হ্যারি সম্ভবত এসব জানতো। তবে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

তারপর মার্টিন আবার বলে, আহত হয়ে পশুরা যেমন অন্ধকারের মাঝে গিয়ে মরে, তেমন আবার মানুষরা আলোতে আসার জন্য ছটফট করতে থাকে।

এবার হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে উপরে ওঠার জন্য। তখন তার যন্ত্রনাটা অসম্ভব বেড়ে গেছে। আর সে উঠতে পারলো না এবং আমি জানি না কেন, তখন ও শিস দিয়ে সেই পরিচিত গানটার সুর গাইছিল।

মার্টিন একটু থেমে আবার বলে, সে কি তখন অন্যের দৃষ্টি কাড়ার জন্য

ঐ গানটার সুর ভাঁজছিল ? না কি তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল ?

যাই হোক্, শিসের শব্দে আমি এগিয়ে গেলাম ! এক সময় দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর আমি হ্যারির নাম ধরে ডাকি, হ্যারি, হ্যারি।

ঠিক সেই সময় হ্যারির শিস্‌টা থেমে গেল।

আমার তখনো ভয় হচ্ছিল যে, হ্যারি আমায় গুলি চালাতে পারে।

আরো কিছুদূর এগিয়ে যেতে আমি রীতিমত চমকে উলাম। আমার পায়ের তলায় হ্যারির একটা হাত পড়েছে।

সেই মুহূর্তে সরে এসে টর্চ জ্বালালাম। দেখি হ্যারি পড়ে রয়েছে। তার হাতে বন্দুক নেই। সম্ভবত আহত হবার পর তার হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেছে।

প্রথমে মনে হলো, হ্যারির দেহে বুঝি আর প্রাণ নেই, কিন্তু ওর যন্ত্রনার আওয়াজে আমার সে ভুল ভাঙলো।

আমি তার কানের কাছে মুখ এনে ডাকি, হ্যারি।

আমার ডাক শুনে হ্যারি খুব কষ্ট করে চোখ মেললো। তারপর হ্যারি অস্পষ্টভাবে আমায় কি যেন একটা বলার চেষ্টা করলো।

তা আমি বুঝতে পারি না। ফলে আমি ওর কাছে ঝুঁকে পড়ি।

এবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম, বোকা কোথাকার !

ব্যস হ্যারির শেষ কথা। আমি আজও জানি না, সেদিন হ্যারি কেন ও কথা তুলেছিল।

আজ আমার মনে পড়েছে, আমি জীবনে ঠিকমত গুলি করে একটা খরগোসও মারতে পারিনি, আর আমি কিনা গুলি চালিয়ে প্রাণের বন্ধু হ্যারি-কে মেরে ফেললাম। এর চেয়ে আমার আফসোসের আর কি থাকতে পারে ! তবে এ কথা ঠিক হ্যারি বিপদে চালিত হয়েছিল। কিন্তু ও ছিল আমার একান্ত প্রিয় বন্ধু। আমার অনেক ভালোবাসা জুড়ে ও মিশে রয়েছে এবং ও থাকবেও চিরদিন।

তাই আমার জীবনে ওর একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। আজ সেখ হ্যারি নেই, আর তাকে কিনা আমিই মারলাম ! সত্যি ভগবানের কি বিচিত্র লীলা !

কথা শেষ করে মার্টিনের মুখ দিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে। তারপর আমি মার্টিনের দিকে তাকিয়ে বলি, মিঃ মার্টিন, এগুলো আমাদের ভুলে থাকতে হবে।

কিন্তু মার্টিন সঙ্গে সঙ্গে জানায়, না কর্ণেল, তা অন্তত আমি পারবো না।

॥ সতেরো ॥

বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। আকাশের মেঘলাভাব একেবারে কেটে গেছে। সোনালী আলোয় চারদিক ঝলমল করছে।

কবর দেওয়া এখন খুব সহজ। ইলেকট্রিক ড্রিল দিয়ে আর কবর খুঁড়তে হবে না। চারদিকের আবহাওয়া জানিয়ে দিচ্ছে, এখন বসন্তকাল।

হ্যারি লাইমকে দ্বিতীয়বার কবর দিতে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। হ্যারির এই কবর দেওয়াতে আমি খুশী, তবু ওর জন্য দু'জনকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

এবারেরর কবর দেওয়ার দলটা কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট। কার্টস নেই। ডাক্তারও অনুপস্থিত। কেবল সেই মেয়েটি দ্রুত রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। তখন একটা ট্রাম গুঁড়ো বরফ ঠেলে এগিয়ে চলেছে।

আমি মার্টিনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে কি পৌঁছে দেবো?

এ কথা শোনার পর মার্টিন আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কর্ণেল ধন্যবাদ! আমি ট্রামে যাবো।

—শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন, আমি বলি, আর আমি বোকা প্রমানিত হয়েছি।

তা শুনে মার্টিন ব্যথিত কন্ঠে বলে উঠলো, না, না, আমি জিতিনি। বরং আমি সব হারিয়েছি।

তারপর মার্টিন আর একটা কথাও না বলে বড় বড় পা ফেলে সেই মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়।

আমি অদূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, ওরা পাশাপাশি হাঁটছে। অথচ আমার মনে হচ্ছে, কেউ কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলছে না। একটা বোবা দুঃখ যেন ওদের ঘিরে ধরেছে।

সত্যি, কেউ বলতে পারে না কখন কার দ্বারা কি ভাবে আঘাত আসে।

॥ এক ॥

কুয়ানটুং প্রদেশের দিগন্ত-বিস্তৃত ধান-ক্ষেতের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন ফাদার ও'বেনিয়ন। তাঁর গন্তব্যস্থল ছ'শো মাইল দূরের একটি রেক্টরী। রেক্টরীর অধ্যক্ষ মনসিনর ফিজগিবন বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় ছুটি নিয়ে স্বদেশ যাচ্ছেন। তাঁরই জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন ফাদার ও'বেনিয়ন। মনসিনর ফিজগিবন নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন, ও'বেনিয়ন যেন অবিলম্বে সান-লি-ওয়ানের রেক্টরীতে এসে তাঁর কাছ থেকে কার্যভার বুঝে নেন। ওপরওয়ালার কাছ থেকে এই নির্দেশ আসবার দেড় মাস পরে ফাদার ও'বেনিয়ন রওনা হন ফাদার ফিজগিবন-এর কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নেবার জন্যে। রেক্টরীতে সবকিছু বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতেই দেড় মাস সময় লেগে গেছে তাঁর।

যানবাহনের অভাবে গাধায় চেপে রওনা হয়েছেন ফাদার ও'বেনিয়ন। গাধাটি তাঁর খুব পেয়ারের। আদর করে তিনি ওর নাম রেখেছেন টমাস। বেচারা টমাসের অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল। বিরাট-দেহী এক সওয়ারকে পিঠে নিয়ে সে আর হাঁটতে পারছে না। দানা-পানির অভাবে এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে টমাসের মেজাজ রীতিমত খাট্টা হয়ে পড়েছে। সে মাঝে মাঝেই চেষ্টা করছে পার্শ্ববর্তী ধানের ক্ষেতে ঢুকে ধান গাছের কচি পাতাগুলো ভক্ষণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে। কিন্তু সওয়ারের তাড়নায় এই সদিচ্ছটাকে কার্যে পরিণত করতে পারছে না সে। ফলে লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে সওয়ারকে পিঠ থেকে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে বেচারা। কিন্তু ফাদার ও'বেনিয়ন তার পিঠে এমনভাবে চেপে বসেছেন যে, তাঁকে ফেলে

দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না টমাসের পক্ষে। বেচারাকে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগোতে হচ্ছে।

ফাদার ও'বেনিয়নের পরনে পাদ্রীর আলখাল্লা আর সুতীর নীল রঙের পায়জামা। পায়ের জুতোজোড়া মোটা কালো কাপড়ে তৈরী। জুতো জোড়াকে শনের দড়ি দিয়ে পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। ফাদার চলে যাচ্ছেন বলে ওখানকার একজন কনভার্টেড স্ত্রীলোকের মেয়ে ওই জুতোজোড়া তৈরি করে ফাদারকে উপহার দিয়েছে। মেয়েটির নাম শিউ-লান। মায়ের সঙ্গে প্রায়ই সে গীর্জায় আসতো। ভারী সুন্দর চেহারা মেয়েটির। ফাদার ও'বেনিয়ন তাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন।

বিদায়ের দিন ও'বেনিয়ন যখন গাধায় চড়বার উপক্রম করছেন সেই সময় শিউ-লান এসেছিলো তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে।

"আপনি তো স্বর্গের পথে চলেছেন ফাদার।" শিউ-লান বলেছিলো—"কিন্তু আপনার ওই কোদালের মত পা দুটি দেখলে স্বর্গের দেবদূতরা হাসাহাসি করবে।"

ফাদারের পা দুটি অস্বাভাবিক রকমে বড়ো। তিনি নিজেও এটা জানেন। কিন্তু কেউ যে তাঁকে তাঁর পায়ের কথা বলে ঠাট্টা করবে, বিশেষ করে শিউ-লানের মতো একটি তরুণী—এটা তিনি ভাবতেও পারেন নি। কিন্তু ওই প্রগল্‌ভা মেয়েটির কথার উত্তরে তিনি কি বলবেন তাও বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি তাই মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে শিউ-লানের মুখের পানে তাকালেন। শিউ-লানের সুন্দর মুখখানা তখন হাসিতে উজ্জ্বল। তার সেই হাসিভরা সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথাই তিনি বলতে পারলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, এ তিনি কি করছেন। মেয়েদের সুন্দর মুখের পানে ওভাবে তাকিয়ে থাকাটা তো পাপ। তিনি তাই চোখ

ফিরিয়ে নিয়ে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান—"আমাকে মার্জনা করুন ভগবান।"

এই সময় গাধার-পো হঠাৎ বিকট অ্যা—হো—অ্যা—হো রবে চীৎকার জুড়ে দিয়ে ছিলো।

"তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, তাই না?" গাধার লাগাম ধরে ফাদার বললেন—"দাঁড়াও, তোমাকে এখনই খেতে দিচ্ছি। আমারও খিদে পেয়েছে। দুজনেই খেয়ে নিই কিছু। তারপর রওনা হওয়া যাবে, বুঝলে!"

একটু পরেই রওনা হলেন ফাদার। শিউ-লানের উদ্দেশে বললেন—"বিদায় শিউ-লান। এবার তুমি বাড়ি যাও।"

ও'বেনিয়ন চলেছেন গর্দভারূঢ় হয়ে। সারাদিন চলবার পর সন্ধ্যার পরে কোনো না কোনো গাছ তলায় শুয়ে রাত কাটিয়ে আবার পরদিন ভোর থেকে চলতে থাকেন। এমনি ভাবেই চলেছে দিনের পর দিন।

সেদিনও এমনি ভাবেই চলেছেন ফাদার। গরমে কপাল আর মুখ দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরছে। হাতের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছে গাধাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন—"আর বেশী দিন তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, টমাস। আগামী কাল দুপুরের আগেই আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবো। ওখানে গিয়ে পেট ভরে খেতে দেবো তোমাকে। খড় তো দেবোই সঙ্গে দানাও দেবো অনেক।

টমাস কিন্তু ফাদারের বচনে বিশেষ খুশী হয়েছে বলে মনে হলো না। খিদেয় তেষ্টায় তার তখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। সে তাই উচ্চ রবে চীৎকার করে প্রতিবাদ করলো। গর্দভ কণ্ঠ-নিসৃত সেই সুললিত স্বরলহরী শুনে ফাদার ও'বেনিয়ন বুঝতে পারলেন যে, সে আর তাঁকে বহন করতে পারছে না। তিনি তাই টমাসের পিঠ

থেকে নেমে তার গায়ে চাপড় দিয়ে আদর করতে করতে বললেন—"তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি টমাস। আর বেশী সময় তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আজকের দিনটা একটু কষ্ট করো। আগামীকাল বিকেল থেকে আর কোনো কষ্ট থাকবে না।"

কিন্তু চোরা যেমন ধর্মের কাহিনী শোনে না, তেমনি গাধাটাও ফাদারের হিতসাধনী বাক্যে কান দিলো না। সে এক লাফে ফাদারের হাত থেকে লাগামের দড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে পাশের ধান ক্ষেতে ঢুকে পড়লো। টমাসের এই রকম বে-আক্কেল দেখে ফাদার তাকে ধরবার জন্যে ছুটলেন। গাধাও ছুট্‌লো তাঁকে আসতে দেখে। এর পরেই শুরু হলো গাধায় আর মানুষে ছুটাছুটি। অবশেষে অনেক চেষ্টার ফলে গাধাকে বাগে আনতে পারলেন ফাদার। গাধার-পো ইতিমধ্যে বেশ কিছু কচি ধানের পাতা খেয়ে শরীরে বল সঞ্চয় করে নিয়েছে। সে তাই আর কোনো রকম অবাধ্যতা প্রকাশ করলো না। ফাদার ও'বেনিয়ন আবার রওনা হলেন তার পিঠে চড়ে।

অবশেষে ফাদার ও'বেনিয়নের দীর্ঘ পথ-যাত্রার অবসান হলো। পরদিন দুপুরের আগেই তিনি আর তাঁর বাহন সান-লি-ওয়ান এর রেক্টরীর কম্পাউণ্ডের ভেতরে প্রবেশ করলেন। ফাদার ও'বেনিয়নের অবস্থা তখন রীতিমত কাহিল। টমাসের অবস্থাও তথৈবচ। ফাদার তখন গেটের দরোয়ানকে ডেকে টমাসকে দানা-পানি দিতে বললেন।

টমাসকে দরোয়ানের জিম্মায় রেখে ও'বেনিয়ন সামনের দিকে এগোলেন মনসিনরের সঙ্গে দেখা করতে।

দোতলায় উঠতেই দেখা হয়ে গেল প্রবীন ধর্মযাজক মনসিনর ফিজগিবনের সঙ্গে। তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি। তবে এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ। ও'বেনিয়নকে দেখতে পেয়ে মনসিনর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে

তাকালেন তাঁর দিকে। ভাবখানা এমন, যেন ফাদার ও'বেনিয়ন ভীষণ একটা অপরাধের কাজ করে ফেলেছেন। ফাদার ও'বেনিয়ন তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন হাসিমুখে।

"আপনি কি বলবেন আমি জানি মনসিনর। কিন্তু..."

"থামো!" গর্জে উঠলেন ফাদার ফিজগিবন। তাঁর মতো একজন বৃদ্ধ ধর্মযাজকের মুখ দিয়ে যে ওই রকম গর্জন বের হতে পারে, এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার। এ যেন সেই—'অতটুকু যন্ত্র হতে অত শব্দ হয়, দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়' অবস্থা। তাঁর গর্জন শুনে দরোয়ান বিস্মিত হয়ে দোতলার দিকে তাকালো। যে চীনা রান্না ঘরে রান্না করছিলো, সেও ছুটে এলো দরজার সামনে। টমাস বেচারা তখনও দানাপানি পায়নি। কিন্তু মনসিনরের চীৎকার শুনে সে বেচারাও কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে। সে তখন বোকা পাঁঠার মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

"আমি বলছিলাম," ফাদার ও'বেনিয়ন কৈফিয়তের সুরে বলতে চেষ্টা করলেন—"যানবাহন যোগাড় করতে না পেরে..."

"তোমাকে চুপ করে থাকতে বলা হয়েছে, আমার সে আদেশ কি তুমি শুনতে পাওনি?"

ফাদার ফিজগিবনের ক্রুদ্ধকণ্ঠ হতে আবার ধ্বনিত হলো হুঙ্কার।

"শুনতে আমি নিশ্চয়ই পেয়েছি," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"কিন্তু আমার কথাটা আগে বলতে দেবেন তো?"

"না। তোমার কাছ থেকে আমি কোনো কথা শুনতে চাইনে।" মনসিনর ফিজগিবন তাঁর হাত দুটি বুকের ওপরে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। "এবার আমি তোমাকে যা বলছি সেই কথাগুলো শোনো।"

"বলুন স্যার।" ও'বেনিয়ন শান্তকণ্ঠে বললেন।

মনসিনর ফিজগিবন তাঁর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করছিলেন।

"এতদিন তুমি কি করছিলে ? কোন্ চুলোয় ছিলে তুমি ? (where the devil have you been ?) তোমার জন্যে আমি ছমাস ধরে অপেক্ষা করছি। তোমাকে আমি চিঠি লিখেছিলাম ছমাস আগে। সব কথাই খুলে বলা হয়েছিলো সে চিঠিতে। দশ বছরের লীভ পাওনা আছে আমার। আমি তাই রিটায়ারমেন্ট-এর অনুমতি প্রার্থনা করে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম আয়ার্ল্যাণ্ডে। অনুমতি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে আমি এখানে চলে আসবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তোমাকে আমি মার্চের তেরো তারিখের মধ্যে এখানে উপস্থিত হতে লিখেছিলাম, কিন্তু তুমি এসে হাজির হলে এক মাস বাদে। তুমি কি বলতে চাও যে, এখানেই আমি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করবো ?"

"না, স্যার, এমন কথা আমি কখনই বলবো না।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"কিন্তু স্যার, আপনি তো বোঝেন—"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই টমাসের কণ্ঠ হতে গর্দভ-রাগিনী ধ্বনিত হয়ে উঠলো—'অ্যাঁ-হি-অ্যাঁ-হি' রবে।

"তোমার কথা তোমার ওই গাধাটাই বলে দিয়েছে।" ফাদার ফিজগিবন বললেন—"তুমি আর তোমার গাধা দুটোই সমান। যাই হোক, আমার এখন কথা বলার সময় নেই। আমি এখনই এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। তুমি নিশ্চয়ই জানো, কমিউনিস্টরা উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে। আমি তাদের হাতে ধরা পড়তে রাজী নই। রেক্টরীর গাড়িটা গেটের পেছনে রয়েছে। আমি এখনই ওই গাড়ি করে রওনা হবো। তবে গাড়িটা চলবে কিনা তা একমাত্র ভগবানই জানেন। গাড়িটা হো-সানই চালু রাখতো। কিন্তু সে চলে যাবার পর ওটাকে নিয়ে মহা বিপদে পড়ে গেছি আমরা।"

"হো-সান চলে গেছে!" ফাদার ও'বেনিয়ন বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—"যাকে আপনি—"

"পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছি।" কথাটা সম্পূর্ণ করলেন ফাদার ফিজগিবন। "তুমি তো জানো ও'বেনিয়ন, তাকে আমি কতখানি স্নেহ করতাম। নিজের ছেলের মতো তাকে আমি মানুষ করতে চেয়েছিলাম। এবং তাকে শিক্ষাও দিয়েছিলাম সেইভাবেই।"

"আমি তা জানি, মনসিনর।" ও'বেনিয়ন বললেন—"আর সেই তো বিস্মিত হয়েছি কথাটা শুনে।"

"বিস্মিত হবার কিছু নেই, ও'বেনিয়ন, "ফাদার ফিজগিবন বললেন—"তার মগজের মধ্যে শয়তান এসে বাসা বেঁধেছে। শেষ দিকে সে যখন বাইবেল ক্লাসে বসতো তখন কথায় কথায় সে কার্ল মার্কস কোট করতো। সময় সময় মাও সে-তুঙের বাণীও আমাকে শোনাতো সে।"

"এতক্ষণে বুঝলাম," ও'বেনিয়ন বললেন—"সে তাহলে ওদের খপ্পড়ে পড়েছে। কিন্তু আমি যে ক্ষিদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, এখনই কিন্তু না খেলে আর চলছে না।"

"খাওয়া এখন থাক," মনসিনর বললেন,—"আগে আমাকে গাড়িতে তুলে দাও। আমি চলে যাবার পর প্রাণ ভরে খাওয়া-দাওয়া করো।"

"আপনি চলে গেলে এখানকার চার্জ কার কাছ থেকে বুঝে নেবো স্যার?"

"তার জন্যে কোনো অসুবিধে হবে না।" মনসিনর বললেন—"আমি সব কিছু লিখে রেখে দিয়েছি। আমার ডেস্ক-এর ওপরে সে সব পাবে তুমি।"

ও'বেনিয়নকে অন্যমনস্ক দেখে মনসিনর বললেন—"আমার কথাটা শুনতে পেয়েছো কি?"

"শুনতে পেয়েছি বৈকি!" ও'বেনিয়ন বললেন—"কিন্তু—"

"না, আর কোনো কিন্তু নয়। আমি এখনই বয়কে আমার জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিতে বলছি। আমি আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে চাই নে।"

দরজার দিকে পা বাড়ালেন মনসিনর ফিজগিবন। তারপর কি মনে করে একটু থেমে মুখ ঘুরিয়ে বললেন—"গাড়িটা মাস দুই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। ওটাকে চালু করতে বেগ পেতে হবে হয়তো।"

এই কথা বলেই মনসিনর ফিজগিবন ওখান থেকে চলে গেলেন। ও'বেনিনও নিচে নেমে গেলেন মনসিনর ফিজগিবনকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে।

নিচে নামতেই লাও-টিংয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাঁর। লাও টিং অনেক দিন চাকরি করছে রেক্টরীতে। রেক্টরীর গাড়িটাও সে-ই চালায়। ও'বেনিয়নকে দেখে সে চীনা ভাষায় বললে—"আপনি কখন এলেন, ফাদার?"

ও'বেনিয়নও চীনা ভাষায় তার প্রত্যুত্তর দিলেন—"এইমাত্র আমি এসেছি।"

এই সময় ওপর থেকে মনসিনর ফিজগিবনের বচন শোনা গেল:

"গাড়িটা বের ক'রো লাও-টিং, আমি এখনই আসছি।"

কর্তার নির্দেশ শুনে লাও-টিং গাড়ি বের করতে গেল। ও'বেনিয়নও গেলেন তার সঙ্গে। গাড়ির কাছে গিয়ে লাও-টিং বললে—"গাড়িটার অবস্থা দেখেছেন ফাদার!"

গাড়ির অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলেন ও'বেনিয়ন। হুড্‌টা শত ছিন্ন, গদীগুলো ছেঁড়া, এঞ্জিনের অবস্থাও গুরুতর।

"এ গাড়ি চলবে কি?" জিজ্ঞেস করলেন ও'বেনিয়ন।

"দেখি চেষ্টা করে," লাও-টিং বললে, "পেট্রল তো নেই, গ্যাসোলিনের সঙ্গে তেল মিশিয়ে চালাতে হবে।"

"কি তেল? কেরোসিন?"

"কেরোসিন কোথায় পাবো?" লাও-টিং বললে—"কেরোসিনের বদলে আমরা এখন সয়াবীনের তেল ব্যবহার করি।"

"সয়াবীনের তেল তো রীতিমত ভারী, ওতে কি কাজ হবে?"

"এ মতলবটি কার মস্তিস্কপ্রসূত?"

"মতলবটি আমিই বের করেছিলাম।" লাও-টিং বললে—"আপনি না আসায় মনসিনর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। আপনার ওপরে রাগ করে তিনি নিজেই ড্রাইভ করতে চেষ্টা করেছিলেন একদিন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও গাড়িটাকে চালাতে পারেননি। আমি তখন বুদ্ধি করে গ্যাসোলিনের সঙ্গে সয়াবীনের তেল মিশিয়ে চালাতে পেরেছিলাম।"

লাও-টিং আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে উঠে এঞ্জিনটি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করতে শুরু করলো। কিন্তু শত চেষ্টা করেও এঞ্জিনকে চালু করতে পারলো না সে। ফাদার ও'বেনিয়ন তখন এগিয়ে এসে বললেন—"তোমার দ্বারা কিছু হবে না, লাও-টিং। তুমি নামো, আমি দেখছি কি করা যায়। হ্যাঁ, ভালো কথা, টুল-বক্সটা কোথায় আছে বলো তো?"

"ওটা দরোয়ানের ঘরে আছে।"

"তুমি টুল-বক্সটা নিয়ে এসো। এঞ্জিনটা একবার পরীক্ষা করা দরকার।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাও-টিং টুল-বক্সটা নিয়ে এলো। ফাদার ও'বেনিয়ন সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। প্রথমেই তিনি এঞ্জিনের ঢাকনা খুলে কলকব্জাগুলো পরীক্ষা করলেন। তারপর তেলের ট্যাঙ্ক খুলে তেলের অবস্থা লক্ষ্য করলেন। তেলের অবস্থা দেখে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। গ্যাসোলিনের সঙ্গে এত বেশী সয়াবীনের ভারী তেল মেশানো হয়েছে যে, ওটা একেবারে চট্‌চটে হয়ে গেছে।

ফাদার ও'বেনিয়ন তখন লাও-টিংয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তেলের যা অবস্থা দেখছি তাতে একে পাতলা করতে না পারলে কোনোই কাজ হবে না। এখানে অ্যালকোহল আছে কি?"

"আছে বোধ হয়, স্টোরে গিয়ে দেখতে হবে।"

"ঠিক আছে, তুমি স্টোর থেকে অ্যালকোহল নিয়ে এসো।"

লাও-টিং স্টোরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে এক টিন চীনা অ্যালকোহল নিয়ে এসে ও'বেনিয়নের হাতে দিলো। ও'বেনিয়ন ট্যাঙ্কের তেলের সঙ্গে অ্যালকোহল মিশিয়ে তেলটাকে পাতলা করে নিলেন।

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। রেক্টরীর বয় ইতিমধ্যে ফাদার ফিজগিবনের ব্যাগ আর বিছানার বাণ্ডিল নিয়ে এসে গাড়িতে তুলে দিয়েছে।

"আমি এখনই আসছি। তোমরা গাড়িটাকে বের করে আনো।" দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললেন মনসিনর ফিজগিবন।

ফাদার ও'বেনিয়নের সারাদিন খাওয়া হয়নি। খিদের জ্বালায় তাঁর পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু সে কথা কে শোনে! ফাদার ফিজগিবন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। দরোয়ান এবং লাও-টিংও তাঁর কাজ নিয়েই ছুটাছুটি করছে।

এই সময় আর একবার মনসিনর ফিজগিবনের বচন শোনা গেল—"কী ব্যাপার! গাড়িটা বের করছো না কেন তোমরা?"

ভাবখানা এমন, যেন গাড়িটাকে ইচ্ছে করলেই চালু করা যায়।

ফাদার ফিজগিবন নিচে নেমে এসে গাড়ির পাশে দাঁড়ালেন। ও'বেনিয়ন তখনও এঞ্জিনের কলকব্জা পরীক্ষা করছেন।

"কি হলো!" মনসিনর গর্জন করে উঠলেন—"গাড়িটা এখনও ঠিক হলো না?"

"আজ্ঞে না," ও'বেনিয়ন বললেন—"কোথায় খারাপ হয়েছে তা এখনও ধরতে পারি নি।"

"তুমি তা পারবেও না," মনসিনর বললেন—"ছাগল দিয়ে যদি চাষ করা যেতো তাহলে আর কথা ছিলো না।"

"দয়া করে নিজে একবার চেষ্টা করে দেখুন না, "ও'বেনিয়ন শান্ত কণ্ঠে বললেন—"আপনি চেষ্টা করলে হয়তো চালু করতে পারবেন গাড়িটা।"

ও'বেনিয়নের কথায় মনসিনর এবার একটু দমে গেলেন। তিনি বেশ ভালো করেই জানেন যে, এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তাই অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললেন—"লাও-টিং কি করছে?"

লাও-টিং কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো। মনসিনরের কথার উত্তরে সে বললে—ফাদার ও'বেনিয়ন আমার চেয়ে ভালো মেকানিক। আমার মনে হয়, কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়িটাকে চালু করতে পারবেন উনি।"

একটু পরেই এঞ্জিনটা ভট্‌ভট্‌ শব্দ করে উঠলো। ও'বেনিয়ন খুশীর সুরে বললেন—"মনে হচ্ছে, এবার চালানো যাবে গাড়িটা।"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই ফাদার ফিজগিবন গাড়িতে উঠে বসলেন। লাও-টিং বসলো চালকের আসনে। এই সময় বয়টি এক বাণ্ডিল বই মাথায় করে ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ীর পাশে দাঁড়ালো।

"বাণ্ডিলটাকে পেছনের সিটে রাখো।" মনসিনর আদেশ করলেন।

বয় উঠে বসলো লাও-টিংয়ের পাশে। মনসিনর তখন ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন—"শোনো ও'বেনিয়ন, তুমি এবার গাড়ির পেছনে গিয়ে সামনের দিকে ঠেলতে শুরু করো। লাও-টিং রেডী হও।"

সঙ্গে সঙ্গে ও'বেনিয়ন গাড়িটাকে ঠেলতে শুরু করলেন। "গিয়ার দাও, লাও-টিং!" ঠেলতে ঠেলতে ও'বেনিয়ন বললেন।

একটু পরেই বিকট শব্দ করে উঠলো এঞ্জিনটা। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া বের হয়ে এলো পেছনের দিক দিয়ে। তেল-পোড়া ধোঁয়া ক্যাদার ও'বেনিয়নের চোখে-মুখে এসে লাগায় তাঁর দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। এক লাফে সরে দাঁড়ালেন ও'বেনিয়ন।

কিন্তু ওই পর্যন্তই! গাড়িটা আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ও'বেনিয়ন নিজের মনেই বলে উঠলেন—"গাড়িটাকে দেখছি ভূতে পেয়েছে।"

ওদিকে মনসিনর তখন সমানে চিৎকার করে চলেছেন—"ধাক্কা মারো, আরও জোরে ধাক্কা মারো। ওকি, তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেন, ও'বেনিয়ন? তুমি কি আমাকে যেতে দেবে না, নাকি?"

ও'বেনিয়ন তখন লাও-টিংকে বললেন—"আমি ধাক্কা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি গিয়ার দেবে বুঝলে!"

এই কথা বলেই ও'বেনিয়ন আবার ঠেলতে শুরু করলেন গাড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ার দিলো লাও-টিং। এঞ্জিনটা আর একবার ভট্ ভট্ শব্দ করে উঠলো। এবারও ধোঁয়া বেরিয়ে এলো আগের মতোই। তবে এবার আর স্টার্ট বন্ধ হলো না। এঞ্জিন এবার চালু হয়ে গেল। মনসিনর ফিজগিবন মুখ বাড়িয়ে ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন—"বিদায় বন্ধু! জীবনে আর কোনোদিন হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। রেক্টরীর ভার তোমার হাতে অর্পণ করে গেলাম। আশা করি আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ভালোভাবেই কাজ চালাতে পারবে।"

এরপর লাও-টিংয়ের দিকে তাকিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন মনসিনর। কিন্তু গাড়ি ছাড়া আর সম্ভব হলো না তার পক্ষে। সামনের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেলো যে, চারজন অশ্বারোহী

সৈনিক এবং একজন অফিসার গাড়িটার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে থাকায় লাও-টিং লক্ষ্যই করেনি যে, পাঁচজন সৈনিক এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

লাও-টিং গাড়িটা চালাবার চেষ্টা করতেই মিলিটারী অফিসারটি কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—"থামো! গাড়ি চালাবার চেষ্টা করলেই তোমাকে আমি কুকুরের মতো গুলি করে মারবো।"

এরপর মনসিনর ফিজগিবনের দিকে তাকিয়ে আদেশ করলো—"এই বিদেশী কুকুর, শীগগির গাড়ি থেকে নেমে আয়।"

ফাদার ও'বেনিয়ন সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, রেড আর্মির অফিসারের ইউনিফর্ম পরিহিত সুন্দর চেহারার একজন যুবক রিভলবার উঁচিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনসিনরের দিকে।

তাকে দেখে ফাদার ও'বেনিয়ন বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন—"কি আশ্চর্য! হো-সান, তুমি!"

"চুপ কর্, বিদেশী কুত্তা।" হো-সান খেঁকিয়ে উঠলো—"তোরা দুজনই এখন আমার বন্দী। আর একটা কথা বললে গুলি করে তোর খুলি ফুটো করে দেবো।"

"এ তুমি বলছো কি, হো-সান!" ও'বেনিয়ন বললেন—"তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না? তোমার সঙ্গে আগেও আমার দেখা হয়েছে। দু বছর আগে আমি যখন এখানে ছিলাম তখন তুমিও তো এখানেই ছিলে।"

কিন্তু হো-সানের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোনো কথাই বের হলো না তাঁর মুখ দিয়ে। তিনি দেখতে পেলেন যে, হো-সান তাঁর বুক লক্ষ্য করে রিভলবার উঁচিয়ে ধরেছে এবং তার সঙ্গীরা গাড়ির আরোহীদের দিকে রাইফেল তাক্ করে রয়েছে। তিনি তাই মনসিনরের দিকে তাকিয়ে আর্তস্বরে বললেন—"মনসিনর!"

মনসিনর সবই দেখছিলেন এবং সবই শুনছিলেন। তিনি গাড়ি থেকে নেমে হো-সানের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"হো-সান!" চীনা ভাষায় চিৎকার করে বললেন মনসিনর—"ওই অভিশপ্ত কমিউনিস্ট ইউনিফর্মে তোমাকে দেখবো এটা আমি ভাবতেও পারিনি। তুমি ঘোড়া থেকে নেমে এসো। আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাই—এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? আর, এখান থেকে পালিয়েই বা গেলে কেন?"

তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে হো-সান আগের মতোই কর্কশ স্বরে বললে—"শোনো বিদেশী পাদ্রী মশাই! আমি তোমার এই গাড়ি দখল করছি। আমার লোকেরা এখনই এটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি যদি নিজের ভালো চাও তাহলে গাড়ি থেকে তোমার লোটবহর এখনই নামিয়ে নাও, নইলে সেগুলোও গাড়ির সঙ্গেই যাবে।

হো-সানের মুখ থেকে এই কথা শুনে মনসিনর ফিজগিবন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। বিগত চল্লিশ বছর যাবৎ তিনি চীনে বাস করছেন। তাঁর ধারণা ছিলো যে, তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় হো-সান ঘোড়া হতে নেমে দাঁড়াবে। চীন দেশে এটাই রীতি। বিশেষ করে যাকে তিনি বাল্যকাল থেকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছেন। খাওয়া পরার ব্যবস্থা করেছেন এবং পুরোহিত জীবন যাপন করবার জন্যে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, তার কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার তিনি আদৌ আশা করতে পারেন নি। যে যুবক তাঁরই দয়ায় আজ বড়ো হয়েছে, তাকে কি সমীহ করে কথা বলতে হবে? না, তাকে দেখে ভীত হতে হবে? না, হো-সানকে দেখে তিনি আদৌ ভীত হননি।

"আমার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলবার সাহস তোমার এলো কোথা থেকে?" মনসিনর ফিজগিবন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর

কণ্ঠে বললেন—"মনে রেখো, আমি তোমার ধর্ম-পিতা (Spiritual father)। আমি তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছি, এবং তোমার খবর জানবার জন্যে তোমার বাবা-মার কাছে লোক পাঠিয়েছি। শোনো হো-সান! আমি তোমার স্বীকারোক্তি শুনতে চাই। তবে অপরাধ স্বীকার করলেই সাজা থেকে তুমি রেহাই পাবে না, সে কথাও তোমাকে বলে রাখছি।"

"স্বীকারোক্তি করবার মতো কোন কিছু আমি করিনি।" হো-সান আগের মতোই কর্কশ স্বরে বললে—"আমি তোমার শিষ্য নই, এবং তোমার এই আস্তাকুঁড়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই। আমি তোমাকে এবং তোমার ওই সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করছি।"

"তোমার কাছ থেকে এরকম বেকুবী আমি আশা করিনি।" মনসিনর রাগতস্বরে বললেন—"তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারো না। আমি আমার স্বদেশ আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে যাচ্ছি।

"না। তা তুমি পারবে না। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।" হো-সান বললে—"এবং থাকতে হবে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী হিসেবে। তোমার ওই সঙ্গীটিও তোমার সঙ্গে বন্দী হয়ে থাকবে।"

"সে কি! তুমি কি আমাকে চেনো না, হো-সান?" ফাদার ও'বেনিয়ন শান্ত কণ্ঠে বললেন।

হো-সান ওর কথায় কান না দিয়ে তার অধীনস্থ সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলো—"এই দুই বিদেশী পাদ্রীকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে দুজন এখানে গার্ড দাও; বাকি দুজনে গাড়িটাকে হেড্‌কোয়ার্টারে নিয়ে যাও।"

হো-সানের আদেশে সৈনিকরা ঘোড়া থেকে নেমে মনসিনর এবং ও'বেনিয়নকে ধাক্কা মারতে মারতে ভেতরে নিয়ে গেলো। মনসিনর হো-সানের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকে অভিশাপ দিতে লাগলেন—

"হো-সান, আজ তুমি যে কাজ করলে এর জন্যে তোমাকে নরকে যেতে হবে। ভগবান তোমাকে যে কী ভীষণ শাস্তি দেবেন তা হয়তো তুমি বুঝতে পারছো না। ভগবানের ক্রোধ হতে তুমি রেহাই পাবে না।"

তাঁর কথা শুনে হো-সান দাঁত বের করে হেসে বললে—"শকুনের শাপে গরু মরে না, পাদ্রী মশাই। তোমাদের ভগবান আমার একগাছা চুলও স্পর্শ করতে পারবে না। সে ক্ষমতা তার নেই।"

হো-সানের মুখ থেকে এই রকম সাংঘাতিক কথা শুনে ফাদার মনসিনর ভয়ে কেঁপে উঠলেন। একি সাংঘাতিক কথা! ভগবানকে বিদ্রূপ!

তিনি তাই আর্তকণ্ঠে বললেন—"হো-সান! বৎস! তুমি কি সত্যিই সেই হো-সান? তুমি ছিলে এই রেক্টরীর সব চেয়ে উজ্জ্বল রত্ন। আমি ভেবেছিলাম তুমি ধর্মযাজক হবে এবং আমার মৃত্যুর পর আমার আরব্ধ কাজ তুমিই সম্পন্ন করবে। তোমার কি মনে নেই যে, তোমাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি চ্যাপেলে বসে কাটিয়েছি! গীর্জার রহস্যের কথা কি তোমাকে আমি শিক্ষা দিইনি? তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলে। সে বিশ্বাস তোমার কোথায় গেল? আমি বুঝতে পারছিনে, কি করে তুমি শয়তানের কবলে পড়লে।"

বক্তৃতা দেবার মতো করে কথাগুলো বললেন মনসিনর। তাঁর স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠ কখনও তীব্র এবং কখনও বেদনার্ত হয়ে পড়ছিলো। তাঁর নীল চোখ দুটিতে ফুটে উঠেছিলো বিস্ময়ের ভাব। "তুমি কি সত্যিই আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছো, হো-সান?"

এবার হো-সান তাকালো তাঁর দিকে। "আমি নতুন আলো দেখতে পেয়েছি। গীর্জার আলো হতেও উজ্জ্বলতর আলো আমি দেখতে পেয়েছি। এই নতুন আলোর পথেই আমি এখন চলেছি। এই আলো আমাকে নিয়ে যাচ্ছে এক উন্নত সমাজের এবং উন্নততর

পৃথিবীর দিকে। এই স্বর্গই আমি চেয়েছিলাম। এতদিনে আমি সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি।"

হো-সানের কথা শুনে তার অধীনস্থ সৈনিকরা অবাক হয়ে যায়। তারা একবার মনসিনরের দিকে এবং একবার তাদের কর্নেলের দিকে তাকাতে থাকে। ওরা সবাই যুবক। ওদের চোখগুলো দেখলে মনে হয়, গত রাত্রে ওরা সারারাত ধরে মদ খেয়েছে। হঠাৎ তারা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে। রাইফেল ওপরে তুলে ওরা সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে—"কমরেড মাও যুগ যুগ জিয়ো।"

এরপর তারা মনসিনর এবং ফাদার ও'বেনিয়নকে টেনে নিয়ে ভেতরের দিকে যেতে থাকে। হো-সান তার ঘোড়ার পিঠে বসে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার নজর পড়ে দারোয়ানের ওপরে। বেচারা তখন ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিলো। হো-সান তাকে ইসারা করে ডাকলো।

"তুমি এখনও এখানে আছো? আমাকে তোমার মনে আছে কি?"

"হ্যাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য ব্যক্তি।" দরোয়ান বললে—"আপনাকে আমি ভালো করেই চিনি।"

"শোনো, তোমাকে আমি নির্দেশ দিচ্ছি, এই দুজন বিদেশী পাত্রী যেন কোনো ক্রমেই গেটের বাইরে যেতে না পারে।" হো-সান আদেশের সুরে বললে—"ওরা যদি পালায় তাহলে তোমাকে তার মূল্য দিতে হবে শির দিয়ে। আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছো কি?"

"আমি বুঝতে পেরেছি।" লোকটা ভয়ে ভয়ে বললে।

"ঠিক আছে," হো-সান বললে—"আমি এখন যাচ্ছি। আবার আমি আসবো সময়মতো। মনে থাকে যেন।"

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ওখান থেকে চলে গেল হো-সান।

॥ দুই ॥

রেক্টরীর ভেতরে ঢুকে মনসিনর ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। "তোমার দেরীর জন্যেই এই অবস্থার সৃষ্টি হলো।" মনসিনর তিক্তকণ্ঠে বললেন—"এক ঘণ্টা আগেও যদি তুমি আসতে, তাহলেও আমি চলে যেতে পারতাম। কিন্তু তোমার দেরীর জন্যই আমাদের আজ বন্দী হতে হলো। কে জানে আর আমি স্বদেশের মুখ দেখতে পাবো কি না! এই রেক্টরীই হয়তো আমার সমাধিস্থল হবে।"

"ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমি কি করে জানবো যে, এখানে এলে আমাদের বন্দী হতে হবে। শয়তান গাধাটাই যত অনর্থের মূল। ওটার জন্যেই আমার দেরী হয়ে গেছে।"

দুদিন পেটে কিছু না পড়ায় ফাদার ও'বেনিয়ন সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছিলেন না। খিদেয়ে তাঁর পেট তখন চোঁ চোঁ করছিলো। একে খিদের জ্বালা, তার ওপর এই রকম অভাবনীয় বিপদ, ফাদার ও'বেনিয়নের চোখে তাই জল এসে পড়ে। হাতের পেছন দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে তিনি কম্পাউণ্ডের দিকে তাকান।

তিনি দেখতে পান যে, তাঁর গাধাটা একটা কলাগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

"ওরে শয়তান," তিনি গাধাটার উদ্দেশে বলে ওঠেন,—"তুই-ই এই সর্বনাশটা ঘটিয়েছিস। আমি যদি হেঁটেও আসতাম, তাহলেও আগে এসে পৌঁছাতে পারতাম।"

গাধার-পোর কিন্তু কোনো চিন্তাই নেই। সে নির্বিকার চিত্তে ওখানে দাঁড়িয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। মানুষের বিপদাপদ সম্বন্ধে তার কোনো ধারনাই নেই।

পরদিন ভোর হতে না হতেই মনসিনর ফাদার ও'বেনিয়নের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। "কী ব্যাপার, ও'বেনিয়ন!" মনসিনর বললেন—"তুমি এখনও ঘুমোচ্ছো? আমাদের প্রার্থনা-সভায় যেতে হবে, সে কথা কি তুমি ভুলে গেছো?"

ফাদার ও'বেনিয়ন আগেই জেগে উঠেছিলেন। মনসিনরের আহ্বানে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিলেন। "আমি এক মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে আসছি, মনসিনর।"

"হ্যাঁ, এসো।" মনসিনর বললেন—"আমি চ্যাপেলে যাচ্ছি। ভক্তরা হয়তো ইতিমধ্যেই এসে গেছে ওখানে। তুমি তাড়াতাড়ি এসো।"

চ্যাপেলের হল ঘরে তখন ভক্তের দল সমবেত হয়েছে। সংখ্যায় খুব বেশী না হলেও, খুব কমও নয়। প্রতিদিনের মতো সেদিনও ওরা চ্যাপেলের হল ঘরে এসে হাজির হয়েছে ফাদার ফিজগিবনের ধর্মোপদেশ শুনতে। দারোয়ানও তাদের বাধা দেয়নি। বাধা দেবার কথাও নয়, কারণ হো-সান তাকে নির্দেশ দিয়েছিলো যে, ফাদারদ্বয় যেন বাইরে যেতে না পারেন। বাইরের লোকদের ভেতরে আসা সম্বন্ধে সে কিছু বলে নি। এই কারণেই ভক্তদের ভেতরে প্রবেশ করতে দিয়েছে সে।

একটু পরেই মনসিনর আর ও'বেনিয়ন প্রবেশ করলেন চ্যাপেলে। মনসিনরের হাতে একটি ধর্মীয় কাপ (chalice)।

অল্টার বয় ইতিমধ্যেই বেদীটা ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে রেখেছে। মনসিনর ফিজগিবন গম্ভীরভাবে বেদীতে উঠে এলেন।

ও'বেনিয়নও এলেন তাঁর পেছনে। ফাদার ফিজগিবন সামনে এসে লাটিন ভাষায় বললেন—"ডামিনি নন সাম ডিগনাস (Domini non sum dignus)—"

বাণীটি তিনবার উচ্চারণ করলেন মনসিনর। তাঁর ভরাট কণ্ঠের সেই কথাগুলো শুনে ফাদার ও'বেনিয়নের মনে পড়লো অনেক দিন আগের একটা ঘটনার কথা। সেদিন তিনি ছিলেন শিক্ষার্থী এবং মনসিনর ছিলেন শিক্ষক। লাটিন ভাষায় এই বাণীটি শুনে ও'বেনিয়ন বলেছিলেন—"এই দুর্বোধ্য কথাগুলো না বলে সহজ ও সরল ভাষায় প্রার্থনা করলে ক্ষতি কি, ফাদার? আমার তো মনে হয় লাটিন ভাষায় না বলে চলিত ভাষায় কথা বললেই ভক্তরা তা বুঝতে পারবে।"

এর উত্তরে মনসিনর সেদিন বলেছিলেন—"না, তা হয় না, বৎস। চার্চের চিরাচরিত প্রথা আমরা ভাঙতে পারিনে। তুমি হয়তো জানো না যে, প্রতিদিন প্রভাতে বিশ্বের প্রতিটি চ্যাপেলে এই পবিত্র বানীটি উচ্চারিত হয়েই প্রার্থনা সভার কাজ শুরু হয়। সারা পৃথিবীতে ঠিক একই সময়ে উচ্চারিত হয় এই মহৎ বাণী। এটা হলো চার্চের গৌরব। এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে বজায় রেখেই ভগবান এবং মাতা মেরীর উদ্দেশে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। ভক্তরা বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছু আসে যায় না।"

সুতরাং আজও সেই মহান বাণী উচ্চারিত হওয়ায় ফাদার ও'বেনিয়ন মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলো। তিনি নিজেও যখন আচার্য হবেন, তখন তাঁকেও এই বাণী উচ্চারণ করেই প্রার্থনা সভার কাজ শুরু করতে হবে। হলের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনটা খুশী হয়ে ওঠে। তিনি দেখতে পান যে, যদিও হো-সান তাঁদের বন্দী করে রেখেছে, তবুও তারা নিঃসঙ্গ নন। এখনও শতাধিক চীনা ভক্ত তাঁদের পেছনে রয়েছে। কথাটা মনে হতেই ভগবানের অপার মহিমার কথা মনে করে চোখ দুটি বুজে ফেলেন তিনি। চোখ মেলে

তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন যে, মনসির বেদীর ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর হাতের কাপটি ভক্তদের সামনে উঁচু করে ধরে জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করে চললেন। তিনি বললেন—"আমার পাপরাশিকে ভগবান ক্ষমা করুন।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বাইরে অনেকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। ব্যাপারটা কি হচ্ছে দেখতে মনসিনর দাঁড়িয়ে উঠলেন। তিনি ভক্তদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন তখন। কিন্তু বলার সুযোগ আর তিনি পেলেন না। কথা বলবার আগেই হো-সানকে দলবল নিয়ে সভাগৃহে প্রবেশ করতে দেখে মনসিনর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

"হো-সান!" বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি বললেন—"কোন্ সাহসে তুমি এই পবিত্র প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করেছো?

তাঁর কথায় কান না দিয়ে হো-সান আদেশের সুরে বলে—"প্রার্থনা-সভা বন্ধ করো বিদেশী পাদ্রী। এখানে এ সব বুজরুকি চলবে না।" এরপর জনতার দিকে তাকিয়ে সে বলে—"তোমরা এখানে কি জন্যে এসেছো? তোমরা যদি ভেবে থাকো যে, ওই বিদেশী শয়তানরা তোমাদের সাহায্য করবে তাহলে তোমরা মহা ভুল করেছো। আমাদের নেতা মাও কি বলেছেন জানো? তিনি বলেছেন, 'ধর্মের ধ্বজাধারী এই সব বিদেশী পাদ্রীর দল পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায় আর তলে তলে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে'। সুতরাং তোমাদের ভালোর জন্যেই বলা হচ্ছে, তোমরা এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে তোমাদের সবাইকে আমি বন্দী করে রাখবো এখানে।"

ভক্তের দল তখনও নড়ছে না দেখে সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দেয় হো-সান—"এই আহম্মক লোকগুলোকে এখনই এখান থেকে বের করে দাও।"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকরা জনতার দিকে বেয়নেট উচিয়ে ধরে চিৎকার করে তাদের বেরিয়ে যেতে বলে।

সৈনিকদের রুদ্রমূর্তি বিশেষ করে তাদের হাতের রাইফেল আর উদ্যত-বেয়নেট দেখে ভক্তের দল প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করে দেয়। যে অল্টার বয় বেদী পরিস্কার করতো, সেও ছুটলো তাদের সঙ্গে। সৈনিকরা তাদের কুকুরের মতো তাড়িয়ে বাইরে নিয়ে গেল। ফলে এক মিনিটের মধ্যেই সভা-গৃহ জনশূন্য হয়ে গেল। ওখানে তখন মনসিনর, ও'বেনিয়ন আর হো-সান ছাড়া আর কেউ রইলো না।

এই প্রথম মনসিনরকে ঘাবড়ে যেতে দেখলেন ও'বেনিয়ন। ক্ষোভে দুঃখে আর ক্রোধে তিনি একবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তার হাতে তখনও সেই পবিত্র প্রতীকটি ধরা রয়েছে। পূর্ব দিকের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে তাঁর পরণের সাদা পোশাকের ওপরে। হো-সানের পরিধানে রয়েছে অফিসারের ইউনিফর্ম। সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনসিনরের দিকে। হঠাৎ সে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁর হাত থেকে পবিত্র প্রতীকটি ছিনিয়ে নিয়ে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

মনসিনর আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। হো-সানের দিকে তাকিয়ে-তীব্র ভৎসনার সুরে বললেন—"হো-সান! তুমি নিশ্চয়ই জান যে, প্রভাতের এই প্রার্থনা সভার সময়টা একটা পবিত্র। তুমি নিজেও অনেক বার এখানকার প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থেকেছো। কিন্তু আজ তুমি যে পাপ করলে তার কোনো ক্ষমা নেই। ভগবান তোমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না; কারণ, তুমি জেনে শুনে এই পাপ করেছো।"

মনসিনরের কথা শুনে হো-সান বিদ্রুপ হাসি হেসে বলল—"কে ক্ষমা করবেন না? তোমাদের ভগবান? ভগবান বলে সত্যিই কি কিছু আছে? আমি এখন জানতে পেরেছি ভগবান বলে কিছু নেই।

তোমাদের মতো ভণ্ডরাই ভগবান নামক একটা মিথ্যা বস্তুকে আমদানী করে মানুষকে ধর্মের নামে ভয় দেখিয়ে ধোঁকা দিয়ে থাকে। আমাকেও তুমি ধোঁকা দিয়েছিলে। তুমি তোমার মিথ্যার জালের মধ্যে আটকে রেখে আমার মনে ধর্মের ভয় ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলে। আমাকে দুটো খেতে পরতে দিয়ে আর মৌখিক দয়ার ভান করে তুমি আমার হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করেছিলে। সুতরাং পাপ কেউ যদি করে থাকে তা তুমিই করেছো। তুমি আমাকে এমন এক ভগবানের কথা বলতে যার কোনো অস্তিত্ব নেই। এই জন্যেই আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারিনে।"

হো-সানের কথা শুনে মনসিনর একবারে স্তব্ধ হয়ে যান। মনসিনর চিৎকার করে বলেন, "ভগবান আছেন।" "আমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে আমি আমার শির জামীন রাখছি।"

"তুমি নিজেকে ধাপ্পা দিতে পারো," হো-সান শ্লেষের সুরে বললে,—"কিন্তু অপরকে যাতে ধাপ্পা দিতে না পারো তার জন্যে আমাকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তোমাকে আর তোমার ওই সাঙাৎটিকে আমি এই বাড়িতে নজরবন্দী করে রাখবো। এই চ্যাপেলটিও আর চ্যাপেল থাকবে না। তোমাদের ভগবানের ভজনের পরিবর্তে এখানে ধ্বনিত হবে সৈনিকদের বুটের আওয়াজ। এটাকে আমি কারাগারে পরিণত করবো। তবে ভক্তদের মধ্যে যারা কমিউনিষ্ট ভ্রাতৃসঙ্ঘে যোগদান করবে তাদের আমি মার্জনা করবো। কিন্তু যারা তোমাদের ভূয়া ভগবানের আরাধনা করতে চাইবে তাদের ধরে এনে ওই বেদীর ওপরে বলি দেবো।"

এই পর্যন্ত বলে সে ফিরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে সৈনিকদের আহ্বান করলো। সৈনিকরা আসতেই সে তাদের আদেশ করলো—"বেদীটা সাফ করে ফেলো।"

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। সৈনিকরা ছুটে গিয়ে তাদের তরোয়ালের ফলা দিয়ে বেদীটাকে পরিষ্কার করে ফেললো। তারপর বেদীর পেছনে টাঙানো সোনালী রঙের ক্রুশচিহ্ন-আঁকা কাপড়খানা টেনে নামিয়ে পদদলিত করতে লাগলো।

ফাদার ও'বেনিয়ন এতক্ষণ এক ধারে দাঁড়িয়ে এই সব কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর হাত দুটি নিসপিস করছিলো হো-সানকে আক্রমণ করবার জন্যে, কিন্তু মনসিনর তাঁর দিকে এমন-ভাবে তাকাচ্ছিলেন যে, তিনি চুপ করে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সৈনিকরা যখন পবিত্র ক্রুশচিহ্ন সংবলিত কাপড়খানা পদদলিত করেছিলো তখন মনসিনর নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে এই অপকর্ম প্রত্যক্ষ করছিলেন। ফাদার ও'বেনিয়ন আর স্থির থাকতে পারলেন না। যে দুটি সৈনিক সেই কাপড়খানা পদদলিত করছিলো তাদের দিকে তিনি ছুটে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হো-সান চিৎকার করে উঠলো—"চুপ করে দাঁড়া শয়তান।"

ফাদার ও'বেনিয়ান বুঝতে পারলেন যে, কে যেন তাঁর পিঠের ওপরে বেয়নেটের ফলাটা চেপে ধরেছে। বেয়নেটের তীক্ষ্ণ ফলা তাঁর পিঠের চামড়া ভেদ করেছে।

হো-সান আবার চিৎকার করে উঠলো—"ফরোয়ার্ড, মার্চ।"

পেছন থেকে বেয়নেটধারী বলে উঠলো—"এগিয়ে চল্, বিদেশী কুকুর।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিঠে একটু জোরে বেয়নেটের খোঁচা মারলো সে। বাধ্য হয়ে ও'বেনিয়ন সামনের দিকে চলতে লাগলেন। তাঁর পেছনেই চললেন মনসিনর। রেক্টরীর দরজার সামনে এনে তাঁদের ধাক্কা দিয়ে হল-ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। ফাদার দুজন অসহায়ের মতো একে অপরের

মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে থেকে তখন দরজায় তালা দেবার শব্দ শোনা গেল।

ফাদার ও'বেনিয়ন বেশ কিছুক্ষণ তাঁর উপরওয়ালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার দুচোখ দিয়ে তখন দরদর ধারায় অশ্রু ঝরছে।

"আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো বলো তো?" মনসিনর অবশেষে বললেন।

"আমি চিন্তা করছিলাম এরপর আমাদের করণীয় কি হবে সে সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন।" ফাদার ও'বেনিয়ন বিনীতভাবে বললেন।

"এখন আর আমার কিছু বলার নেই।" মনসিনর বললেন—"আমি প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। আশা করি তুমি আমাকে বিরক্ত করবে না।"

তিনি দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে। ফাদার ও'বেনিয়ন হতাশভাবে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি বললেন—"আপনার খাবার নিয়ে আসবো কি?"

"না!" মুখ না ঘুরিয়েই চিৎকার করে উঠলেন মনসিনর। পরমুহূর্তেই তিনি গট্ গট্ করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

॥ তিন ॥

"এটা কি পদার্থ ?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি বিরক্তিভরা চোখে খাবারের ডিশের দিকে তাকালেন। পরদিন সকালে প্রাত্যহিক অভ্যাস মতো তিনি নিচে এসেছিলেন ব্রেকফাস্ট খেতে।

"আমার সাধ্যে যা কুলিয়েছে তাই আমি করেছি, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন কতকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন—"চাকররা সবাই পালিয়ে গেছে। রান্না সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই।"

ফাদার ও'বেনিয়নের কথা শুনে মনসিনর বললেন—"তবুও তো তুমি যা হয় একটা কিছু বানিয়েছো। আমার দ্বারা এটাও হতো না।" মনসিনর তাঁর কাঁটা হাতে তুলে নিলেন। "যখনই আমার মনে হয়,—" তিনি বললেন,—"যখনই আমার মনে হয় যে, তুমি একটু আগে এলেই আমি এতক্ষণ সমুদ্রতীরে পৌঁছে যেতাম, তখনই আমার—" আর কোনো কথা বের হয় না তাঁর মুখ দিয়ে।

"তাহলে আমাকে এখানে একা থাকতে হতো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"এবং তা যদি হতো তাহলে ওই হো-সানের মোকাবিলা করা আমার দ্বারা একেবারেই সম্ভব হতো না। আমার তাই মনে হচ্ছে, করুণাময়ী ভার্জিন মেরী বোধ হয় এই জন্যেই গাধাটাকে দেরী করিয়ে দিয়েছেন।"

"মেরী মাতার নাম গাধার সঙ্গে এক পংক্তিতে উচ্চারণ করতে তোমার লজ্জা হলো না ?" মনসিনর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—"ভবিষ্যতে এ রকম যেন আর কখনও না শুনি।"

ফাদার ও'বেনিয়ন লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলেন। "না, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, ভগবানের বোধ হয় ইচ্ছে যে, এই সময়ে আপনি এখানে উপস্থিত থাকেন। যাই হোক, আপনার চা নিয়ে আসবো কি?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"চা মানে তো এমনি ধরনের একটা কিছু।" মনসিনর বললেন—"বিপদে যখন পড়েছি তখন সবই খেতে হবে।"

"কি করা যাবে, স্যার?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"রান্না করবার মতো কোনো লোক এখানে নেই যে।"

মনসিনর তাঁর সামনের প্লেটখানা একটু দূরে ঠেলে দিলেন।

"রাঁধুনে লোকটা যে প্রথম রাতেই পালাবে তা আমি ধারণাও করতে পারিনি।" মনসিনর বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—"লোকটার জন্যে আমি কি না করেছি! ওর পরিবারকে আমিই খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। ওই লোকটাই ছিলো আমার প্রথম কনভার্ট। না, ও ছিলো হো-সানের প্রথম কনভার্ট। হো-সান একদিন ছিলো আমার ছেলের মতো—মানে ও ছিলো আমার ধর্ম-ছেলে, কিন্তু এখন—"

"ওর সম্বন্ধে আমাকে সব কিছু বলুন, স্যার।" ও'বেনিয়ন অনুরোধ করলেন।

মনসিনরের মনটাকে অন্যদিকে টেনে নেবার জন্যেই কথাটা বললেন ও'বেনিয়ন। গত রাতটা তাঁর কাছে ছিলো দুঃস্বপ্নের মতো। চাকরেরা একে একে পালিয়ে গেছে। সকালে উঠে গেটের দরোয়ানকেও আর দেখা যাচ্ছে না। তার পরিবর্তে গেটে দাঁড়িয়ে আছে একজন রাইফেলধারী সৈনিক। রাইফেল কাঁধে নিয়ে সে গেটের সামনে পায়চারি করছে। ওদের প্রত্যেকের কাছেই রাইফেল আছে। ভালো আমেরিকান রাইফেল। কমিউনিস্টরা ওগুলো

কেড়ে নিয়েছিল জাতীয়তাবাদী সৈনিকদের কাছ থেকে। ওই সব রাইফেল দিয়েই এবার হয়তো দুজন নিরপরাধ ধর্মযাজককে গুলি করে হত্যা করা হবে। ফাদার ও'বেনিয়ন এই সব কথাই চিন্তা করেছিলেন। মনসিনরও ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর চা আর ডিমের কথা। পূর্বস্মৃতি ভেসে আসছিলো তাঁর মনের মধ্যে।

"হো-সানকে যখন প্রথম এখানে নিয়ে আসি তখন ওর বয়স ছিলো ছয় কি সাত বছর।" মনসিনর বললেন—"দুর্ভিক্ষের সময় ওকে আমি পথে কুড়িয়ে পাই। ওর বাবা-মা অবিশ্যি ওর খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু আমি যখন ওকে দেখি তখন ও মাছের বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। আমি তখন একজন মরণাপন্ন কামার মিস্ত্রির শেষকৃত্য করবার জন্যে তার বাড়িতে যাচ্ছিলাম। সে আমার একজন কনভার্ট ছিলো। কামারশালে কাজ করবার সময় হঠাৎ নেহাই থেকে একটা লোহার টুকরো ছুটে এসে তার উরুতে আঘাত করে। আঘাতের ফলে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়। ক্ষতটা পরে বিষাক্ত হয়ে গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। তার বাড়িতে যাবার পথেই হো-সানকে আমি প্রথম দেখি। কিন্তু তখন আমার হাতে সময় ছিলো না বলে আমি আর দেরী করতে পারিনি। ফেরার পথে আমি দেখতে পাই, ও পথের ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওর একখানা হাত ছিলো মাথার নিচে। ওর ছেঁড়া-কাটা পোশাক ধুলো-কাদায় মাখা। ওর মুখটাও ছিলো ধুলো আর কাদায় মাখা। আমি ওকে তুলে নিতেই ও জেগে ওঠে। আমি ওর পরিচয় জিজ্ঞেস করি। কিন্তু ও শুধু নিজের নাম ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। আমি ওকে সঙ্গে করে রেক্টরীতে নিয়ে আসি। আমার কুক ওকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে দেয়। সেই থেকে গত বছর অবধিও আমার কাছেই ছিলো।"

"ওর বাপ-মা ওর সন্ধান করেনি?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস

করেন। জানালার বাইরে থেকে একজন সৈনিক ওদের দুজনকে লক্ষ্য করছিলো। মনসিনর তার দিকে পেছন ফিরে বসেছিলেন বলে তিনি তাকে দেখতে পাননি। কিন্তু, ও'বেনিয়ন তাকে লক্ষ্য করেছিলেন। মনসিনর যাতে তার দিকে লক্ষ্য না করেন এই উদ্দেশ্যেই ও'বেনিয়ন তাঁকে কথায়-ব্যাপৃত রাখতে চেয়েছিলেন।

মনসিনর তাঁর মাথাটা না ঘুরিয়েই বলেন—"হ্যাঁ, তারা ওর সন্ধানে এসেছিলো বৈকি।" তিনি বলে চলেন—"তারা ওকে হারিয়ে ফেলেছিলো শহরে প্রবেশ করবার পরেই। অনেক লোকের ভীড়ে ছেলেটিকে তারা হারিয়ে ফেলেছিলো।"

"এ ঘটনা কখন ঘটেছিলো?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করেন।

"ওরা আসছিলো একদল বাস্তুহারার সঙ্গে। সেটা মনে হয় প্রথম বিপ্লবের সময়—দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি; না, না প্রায় প্রথম বিপ্লবের অনেক পরের ঘটনা ওটা—হয়তো ওটা দ্বিতীয়—না, ওটা ছিলো জাপানীদের দ্বারা মাঞ্চুরিয়া অধিকারের সময়। উদ্বাস্তুর দল আসছিলো উত্তর দিক থেকে।"

"ওর খোঁজ পাবার পর তারা কি ওকে ফিরিয়ে নিতে চায় নি?" ফাদার ও'বেনিয়ন জানতে চান।

জানালার বাইরের সৈনিকটা তখন ওদের দিকে রাইফেল তাক করে রয়েছে।

"হ্যাঁ, ওর খোঁজ পাবার পর তারা ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো।" মনসিনর বললেন—"কিন্তু তারা যখন দেখতে পেলো যে, আমার কাছে থেকে ও ভালো ভালো খাবার খেতে পাচ্ছে তখন আর তারা ওকে নিয়ে যেতে চায় না। তারা আমার হাতেই ওকে সমর্পণ করে যায়। তবে মাঝে মাঝে তারা এখানে এসে ওকে দেখে যেতো। এবং যতোবারই আসতো কিছু-না-কিছু খাবার-

দাবার, অথবা কিছুসংখ্যক ডিম নিয়ে আসতো। হো-সানকে ওরা দূর থেকে দেখেই চলে যেতো।"

"কেন ?"

"কারণ, ওদের দেখলে হো-সান যদি ওদের সঙ্গে চলে যেতে চায়, সেই ভয়েই ওরা ওর সামনে আসতো না।"

কথা বলতে বলতে মনসিনরের চোখে জল এসে পড়ে।

"আপনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন," ফাদার ও'বেনিয়ন সহানুভূতির স্বরে বলেন,—"সারা রাত আপনি ঘুমোতে পারেন নি। এখন আপনার একটু বিশ্রাম করা দরকার।"

কথাটা ঠিকই বলেছিলেন ও'বেনিয়ন। গত রাত্রে লাল ফৌজ শহরে প্রবেশ করে। বাইরে তখন চলতে থাকে ভীষণ হল্লা আর ছুটাছুটি। ধর্মযাজকেরা রেক্টরীর মধ্যে বন্দী অবস্থায় থাকায় বাইরে কি হচ্ছে, না হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারেন নি। সারা রাত তাঁরা খাটের ওপরে বসে কাটিয়েছেন। ভোর পাঁচটার সময় মনসিনর তার প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান করেন। তবে এ সভা চ্যাপেলে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি, এবং শ্রোতা হিসেবে একমাত্র ও'বেনিয়ন ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলো না।

"এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত।" মনসিনর আর্তকণ্ঠে বলেন—"হো-সান যেন আমার বুকে বেয়নেট বিঁধিয়ে দিয়েছে।"

"ঠিকই বলেছেন।" ও'বেনিয়ন মৃদুস্বরে বলেন।

"মনসিনর তার গলাটা পরিষ্কার করে নেন বারকয়েক কেশে।" "জানো ও'বেনিয়ন, এই হো-সান খুব সাধারণ ছেলে নয়। পথের ধুলোয় আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একটা উজ্জ্বল রত্ন। ও আমার কাছে আসবার পরেই আমি দেখতে পাই, ওর মধ্যে রয়েছে সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতা। ওর আছে উন্নত হৃদয়, পরিষ্কার মগজ এবং এমন একটা শক্তি যা হাজারে একজনের মধ্যেও দেখা যায় না। তার

পর থেকেই আমি ওর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে থাকি। আমি আমার যা কিছু বিদ্যা সবই ওকে শিখিয়েছি। আমার ধারণা হয়েছিলো যে, ভগবানই ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি আরও ভেবেছিলাম, আমার পরে ও-ই আমার স্থান অধিকার করে আমার আরব্ধ কাজ আমার চেয়েও ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবে; কারণ, এই দেশের ছেলে বলে দেশের লোকের কাছে ও হবে নিতান্ত আপনজন। আমরা যাই করি না কেন, স্থানীয় লোকেরা আমাদের সব সময় বিদেশী বলেই মনে করে।"

মনসিনর একটু থামেন। ডান হাত দিয়ে টেবিলের ওপরে একটা চাপড় মারেন—"এবং এই বালক, হ্যাঁ এই হো-সান অনেককে কনভার্ট করে। আমি যা বিশ বছরেও করতে পারিনি, ও তা এক বছরেই সুসম্পন্ন করে। ও সহজেই যে কোনো মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে। আরও একটা বিশেষ জিনিস আমি ওর মধ্যে লক্ষ্য করি। আমি দেখতে পাই যে, কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি ওর মনে এতটুকু দুর্বলতা নেই। ও চেয়েছিলো ধর্মযাজক হতে। যেদিন ও আমাকে কথাটা বলেছিলো সেদিনের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে।"

মনসিনর পেছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুঁজলেন। ও'বেনিয়নের মনে হলো, তিনি যেন পূর্ব কথা স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। "আমি সেদিন চ্যাপেলে বসে প্রার্থনা করছিলাম। আমার পাশে আর কোনো লোক ছিলো না। কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। বিষয়টা যে কি তা আর আজ ঠিক মনে করতে পারছিনে, তবে আমি যে ওখানে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানতে গিয়েছিলাম তাতে কোনোই ভুল নেই। আমি যখন বেদীর ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বুঁজে ধ্যান করছিলাম, তখন হঠাৎ আমার মনে হলো, কে যেন আমার পাশে এসে বসেছে। চোখ খুলতেই আমি

দেখি, হো-সান আমার পাশে এসে বসেছে। সেও ঠিক আমারই মতো হাঁটু গেড়ে বসেছে। সেই প্রথম সে ওখানে গিয়ে আমার পাশে বসে। ও কেন এসেছে তা আমি ওকে জিজ্ঞেস করিনি, তবে ওকে ওখানে দেখে আমি মনে মনে খুশী হই। আমি তাহলে একা নই। নিজের মনেই আমি বলি যে, আমার প্রার্থনা শুনেই ভগবান ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এই সময়ই ওর মুখ থেকে কথাটা আমি প্রথম শুনি। ও বলে, 'আমি আপনার মতো ধর্মযাজক হতে চাই ফাদার।'

হ্যাঁ ঠিক এই কথাগুলোই ও বলেছিলো। ওর কথাগুলো যেন প্রভু যীশুর বাণীর মতো শোনালো আমার কানে। আমি তোমাকে বলছি, সেই দিন থেকেই আমার আর কোনো বিপদাপদ হয়নি। আমার মনে হতে থাকে, আমি যা করতে পারিনি, হো-সান তা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করতে পারবে।"

একটু থামলেন মনসিনর। তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠলো, চোখ দুটো জলে ভরে এলো।

"আপনি এবার বিশ্রাম করতে যান।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

হঠাৎ গেট খোলার শব্দ হলো এই সময়। ও'বেনিয়ন উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

মনসিনর বিশ্রাম করতে গেলেন না। ওর মনে কখন যে পরিবর্তন আসে তা আমি ঠিক জানি নে। না না আমি তা জানি। এটা হয় বিদ্রোহীরা যখন শহরে আসে সেই সময় থেকে। চিয়াং কাই-শেক্ তখন ওদের হঠাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। তিনি দেশ থেকে কমিউনিষ্টদের তাড়াবার ব্রত নিয়েছিলেন। ওরাও তখন পালাচ্ছিলো। পালাবার পথে ওরা পঙ্গপালের মতো এই শহরের ওপরে এসে পড়ে। ওরা যাচ্ছিলো উত্তর-পশ্চিম দিকে।

কি করে যেন হো-সানের খবর ওরা জানতে পারে। কে তাদের বলছিলো তা আমি ঠিক জানিনে; হয়তো পঞ্চম বাহিনীর কোন এজেন্টের কাছ থেকে অথবা কোনো দেশদ্রোহীর কাছ থেকে ওর খবর তারা জানতে পেরেছিলো। ওরা হো-সানের সঙ্গে গোপনে দেখা করে তাকে একেবারে গাছে তুলে দেয়। এ সবই হয় আমার অগোচরে। আমি এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, হো-সানের মনটা বিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমি ওকে বলি, তোমার বিবেকের কাছে কি তুমি কোনো পাপ করেছো যা তুমি কনফেস করছো না!"

"না, আমি কোনো পাপ করিনি।" ও বলে।

"এই কথাই ও বলেছিলো আমাকে এবং আমি জানি যে, ওটাই ছিলো ওর প্রথম মিথ্যাভাষণ। ওরা ওকে ইতোমধ্যেই মিথ্যা কথা বলতে শিখিয়েছিলো।"

এই পর্যন্ত বলে মনসিনর থামলেন। প্লেটের খাবার তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ফাদার ও'বেনিয়নও তাঁকে খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন না। এর পরিবর্তে তিনি বললেন—"অপর লোকেরা তাকে যা শিখিয়েছিলো তার জন্যে আপনার কোনো দোষ নেই—"

মনসিনর তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—"কিন্তু সে তাদের কথা শুনেছিলো কেন শুনেছিলো? এর মানে আমি তাকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারিনি। আমি ওর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতাম। আমি ওকে স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে সাবধান হতে বলতাম। মানুষের জীবনে স্ত্রীলোকেরাই যে সর্বনাশ টেনে আনে এই কথাটাই আমি ওকে বার বার বলতাম। আমি ওকে বলতাম—হ্যাঁ, আমি ওকে বলতাম যে, একটি মাত্র নারীও তোমার আর ভগবানের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করতে পারে। একটিমাত্র নারী একজন পুরুষকে এমনভাবে আবৃত করে রাখতে পারে যাতে সেই পুরুষ ভাবতে থাকে যে, সে স্বর্গে বাস

করছে। কিন্তু পরবর্তী কালে সে বুঝতে পারে যে, যাকে সে স্বর্গ মনে করেছিলো তা নরক ছাড়া আর কিছু নয়।"

কথাগুলো তিনি এমন জোর দিয়ে বললেন যার ফলে ফাদার ও'বেনিয়নের মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

"ঠিকই বলছেন। নারীর রূপ এমনই সাংঘাতিক বস্তু যা, যে কোনো মানুষকে নরকের পথে টেনে নিতে পারে," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমি আমার জীবনে কোনো নারীকে ভালোবাসিনি। কোন নারীকে আমার হৃদয়ে স্থান দিইনি।"

"ঠিকই করেছো।" মনসিনর বললেন—"তুমি যদি কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হতে তাহলে সে তোমাকে ফাঁদে ফেলে সোজা নরকের পথে টেনে নিয়ে যেতো।"

একটু থেমে মনসিনর আবার বললেন—"আমার প্রার্থনা-সভায়ও কয়েকজন মেয়ে আসতো। তারা হো-সানের সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করতো। তাদের মধ্যে অল্প বয়সের একটি তরুণীও ছিলো। আমি তার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতাম। হো-সানের দিকেও আমার লক্ষ্য ছিলো। কিন্তু হো-সান তার দিকে ফিরেও তাকাতো না। কোনো মেয়ের সঙ্গেই সে কথা বলতো না। আমার তাই মনে হয়েছিলো যে, ভগবানই ওকে রক্ষা করছেন।"

একটু থেমে মনসিনর আবার বলেন—"চিয়াংয়ের বাহিনী যখন এই শহরে এসে কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে সেই সময় কমিউনিস্টরা এখান থেকে পালায়। হো-সানও সেই সময় তাদের সঙ্গে পালিয়ে যায়। যাবার আগে আমাকে সে একখানা চিঠি লিখে রেখে যায়। চিঠিতে ও লিখেছিলো ছেলেবেলা থেকে সে এখানকার চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী হয়ে আছে, এখন সে বুঝতে পারছে চার্চের হাতার বাইরেও আছে আলাদা এক জগৎ। সেই জগতের সন্ধানেই সে মস্কো যাচ্ছে। চিঠিতে সে আরও লিখেছিলো,

কমিউনিস্টরা তাকে বলেছে যে, ওখানকার স্কুলে তাকে ভর্তি হবার সুযোগ করে দেবে। "এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন মনসিনর। ওরা খুবই চালাক—ওর প্রতিভা ওরা দেখতে পেয়েছিলো। তাই আমার কাছ থেকে ওকে ওরা চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"শয়তানের দল।" অনুচ্চকণ্ঠে কথাটা বললেন ফাদার ও'বেনিয়ন। মনসিনরের কথা শুনতে শুনতে তিনি এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাবার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন। গেট খোলার শব্দও তাঁর কানে যায়নি।

"হ্যা, ও আমাকে লিখেছিলো।" মনসিনর বলতে থাকেন, "আমার ছেলের মতোই সে আমার কাছে ছিলো। সুতরাং আমার প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে। চিঠিখানা ভালোই, কিন্তু আমার বুকটা ভেঙে যায় ওর চিঠি পড়ে। ও শয়তানের পাল্লায় পড়েছে বুঝতে পেরে আমার মনটা দুঃখে ভরে ওঠে। চলে যাবার কয়েক দিন আগে ও আমাকে বলেছিলো, ভগবানে ওর আর বিশ্বাস নেই। সেইদিন—হ্যাঁ, সেই দিনই আমি ছুটি চেয়ে চিঠি লিখি আয়ার্ল্যাণ্ডে। এটা আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগের ঘটনা। আমার তখন মনে হয়েছিলো যে, আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারিনি। আমার মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, সুতরাং আমার পক্ষে এখন দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত। নিজের বাড়িতেই, হ্যাঁ যে বাড়িতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, সেই বাড়িতেই আমি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে চাই। আমার সামনে নেমে এসেছিলো গাঢ় অন্ধকার। হো-সান যদি আমার স্থান দখল না করে—যে আশা আর আমার ছিলো না—তাহলে কেন আর এখানে বিড়ম্বিত জীবন যাপন করবো? আমার হৃদয়টা একেবারেই ভেঙে গিয়েছিলো।"

"এসব কথা এখন থাক স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন—

"এখন আর ওসব কথা চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।" ফাদার ও'বেনিয়ন বেশ বুঝতে পারছিলেন যে, হো-সান মনসিনরের বুকে প্রচণ্ড শেলাঘাত করে গেছে।

"কার্ডিনাল আমাকে লেখেন। আমাকে এখানেই থাকতে হবে।" মনসিনর বলতে থাকেন—"তিনি লিখেছিলেন যে, আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবার জন্যে তিনি শীগগিরই একজন যুবক ধর্মযাজককে এখানে পাঠাচ্ছেন। এর কিছুদিন পরেই তুমি এসেছিলে—"

"এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার তখন না ছিলো কোনো অভিজ্ঞতা, আর না জানা ছিলো এ দেশের ভাষা।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

অভিজ্ঞতা কারোই প্রথম দিকে থাকে না।" মনসিনর বললেন—"ওটা ক্রমশঃ জন্মে। তোমারও এখন অভিজ্ঞতা হয়েছে।"

ফাদার ও'বেনিয়ন হঠাৎ উঠে জানালার দিকে ছুটে গেলেন। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন তিনি। বাইরে তাকিয়ে যে দৃশ্য তিনি দেখলেন তাতে তাঁর বুকটা কেঁপে উঠলো। একটি চীনা তরুণী গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং গেটের সেন্টি তাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। রাইফেলের বেয়নেটটা মেয়েটির বুকের সামনে উঁচিয়ে ধরেছে সে।

"হায় ভগবান!" ফাদার ও'বেনিয়ন নিজের মনেই বলে উঠলেন—"ও আবার এখানে মরতে এলো কেন?"

"কি হয়েছে? কে এসেছে এখানে?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তখন প্লেট থেকে একটা ডিম তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। খেতে খেতেই কথাটা বললেন তিনি।

"ও আমার পরিচিত।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন। কথাটা বলেই জানালার পাল্লাটা পুরোপুরি খুলে দিলেন তিনি।

"এখান থেকে চলে যাও, শিউ-লান।" চিৎকার করে বললেন ফাদার ও'বেনিয়ন,—"তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও।"

মেয়েটি সেন্ট্রিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জানালার দিকে তাকালো।

"আপনি তাহলে এখানেই আছেন!" মেয়েটি বললে,—"অনেক খোঁজ করে অবশেষে আপনার দেখা পেলাম।"

ফাদার ও'বেনিয়ন মেয়েটির দিকে তাকালেন। "আমরা এখানে বন্দী," তিনি বললেন—"তোমার দেখাশুনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

হেসে ওঠে মেয়েটি। "আমার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।" সে বলে, "আমিই বরং আপনাদের দেখাশুনা করবো। আমি এখনই ভেতরে আসছি।"

মেয়েটির কণ্ঠস্বর আর তার হাসির শব্দ শুনে মনসিনর তাঁর চেয়ার থেকে উঠে জানালায় এসে দাঁড়ান। ঠোঁট থেকে ডিমের দাগ মুছে ফেলেন তিনি।

ফাদার ও'বেনিয়ন তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ান। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিস্ময় আর ভয়ের চিহ্ন। "আমাকে পাঁচ মিনিটের জন্যে ক্ষমা করুন স্যার।" কথাটা বলেই তিনি দ্রুতপদে দরজার দিকে ছুটে যান। দরজা খুলতেই সামনে একজন সশস্ত্র গার্ডকে দেখতে পান। সে ওঁর দিকে রাইফেল উচিয়ে হুকুমের সুরে বলে—"বাইরে যাওয়া চলবে না।"

শিউ-লান তখন ভেতরে ঢুকে পড়েছে। গেটের সেন্ট্রি তাকে বললে—"ওদিকে কোথায় চলেছো? এখানে ঢোকা চলবে না।"

"আমি একজন কমরেড।" শিউ-লান বলে—"আমি এসেছি বিদেশীদের কাছে একটা খবর জানাতে।"

"না। খবর-টবর জানানো চলবে না।" সেন্ট্রি খেঁকিয়ে ওঠে।

শিউ-লান ইতোমধ্যে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সেন্টির কথা গ্রাহ্য না করে সে ছুটে যায় দরজার দিকে। ওখানে যে গার্ডটি দাঁড়িয়ে ছিলো তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে সে।

"ওকে ধরো।" সেন্ট্রি চিৎকার করে বলে।

কিন্তু কে কাকে ধরে? শিউ-লান তখন বাড়ির ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে।

॥ চার ॥

শিউ-লানের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো ফাদার ও'বেনিয়নের।

"শোনো, শিউ-লান," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"তুমি এখানে এসে হাজির হলে কেন, বলো তো?" কথাগুলো চীনা ভাষায় বলেন তিনি।

শিউ-লানের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে বলে—আমি যাকে ভালোবাসি তার কাছে কেন আসবো না আমি?

"না" ফাদার ও'বেনিয়ন গম্ভীর ভাবে বলেন—"আমি তোমাকে আগেও বলেছি, আমার সামনে 'ভালবাসা' কথাটা উচ্চারণ করবে না। ও সব কথা শোনা আমাদের পক্ষে পাপ।"

"কিন্তু আপনাদের পবিত্র গ্রন্থে তো এ কথাটা অনেক জায়গায় আছে।" বীণানিন্দিত কণ্ঠে মেয়েটি বলে।

ফাদার ও'বেনিয়ন একটু লজ্জিত হন। "না, সে ভালবাসা, আর তুমি যে ভালবাসার কথা বলছো, উভয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ।" বেশ একটু জোর দিয়েই কথাটা তিনি বলেন।

"তফাৎ মানে? ভালবাসার আবার রকমফের আছে নাকি?" দুষ্টু হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে শিউ-লান।

"শোনো, শিউ-লান, আমাদের ধর্মগ্রন্থে যে ভালবাসার কথা আছে, তা হলো ভগবানের প্রতি ভালবাসা। মেয়েদের ভালবাসার সঙ্গে ওর কোনো সংশ্রব নেই।"

'ভার্জিন মেরী কি তাহলে মেয়ে নন?" আবার দুষ্টু হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে শিউ-লান।

"তিনি আমাদের প্রভুর মা।" ফাদার ও'বেনিয়ন গম্ভীর-ভাবে বলেন—"তাঁর নামটা এভাবে উচ্চারিত হওয়া ভয়ানক অন্যায়।"

ফাদার ও'বেনিয়ন যদিও চীনা ভাষায় কথা বলছিলেন, তবুও তাঁর উচ্চারণ ঠিক হচ্ছিলো না। তাঁর কথার টান ছিলো আইরিশদের কথার মতো।

"আপনি কি আমাদের ভাষার কথা বলছেন, না আপনার মাতৃ-ভাষার কথা বলছেন?" শিউ-লান জিজ্ঞেস করে। "কেন, আমার কথা কি বুঝতে পারছো না? আমি তো চীনা ভাষাতেই কথা বলছি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আপনার মাতৃ ভাষাতেই কথা বলছেন। আপনার দেশ তো আয়ার্ল্যাণ্ড! দেশটা কোথায় বলুন তো!"

"অনেক দূরে।" ও'বেনিয়ন বললেন—"ইংল্যাণ্ড থেকেও দূরে।"

আপনি যখন দেশে যাবেন তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি? আব্দারের সুরে বলে শিউ-লান।

"আমি শীগগির দেশে যাচ্ছি নে।" ও'বেনিয়ন গম্ভীর ভাবে বলেন—"এবং যখন আমি যাবো তখন নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে নেবো না; না, কিছুতেই না। এটা আমাদের অনুশাসনের বিরোধী কাজ। কোনো ধর্মযাজক কখনও কোনো সুন্দরী তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না।"

"তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, আমি সুন্দরী ?" আবার দুষ্টু হাসি ফুটে ওঠে শিউ-লানের মুখে।

"না, না, সে কথা আমি বলতে চাইনি।" ও'বেনিয়ন তাড়াতাড়ি বলেন।

"আপনি না বললেও আমি জানি যে, আমি সুন্দরী।"

"তুমি সুন্দরী কি অ-সুন্দরী তাতে আমার কিছু আসে যায় না।" ও'বেনিয়ন বলেন—"আমি কখনও তোমার মুখের দিকে তাকাই নি।"

ঠিক এই সময় মনসিনর ফিজগিবন এসে দাঁড়ান ও'বেনিয়নের পেছনে। তিনি এসে শিউ-লানের হাত ধরে বসবার ঘরে নিয়ে যান।

"ওখানে বসো তুমি,"—দূরে একটা সোফা দেখিয়ে মনসিনর বলেন—"আমার কাছ থেকে অনেক দূরে বসতে হবে তোমাকে। আর একটা কথা, তুমি নিজে থেকে কোনো কথা বলবে না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দেবে শুধু।"

শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে তার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করতে থাকেন মনসিনর। ফাদার ও'বেনিয়ন ইতোমধ্যে ওখানে এসে হাজির হন। মনসিনর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকান।

"কে এই মেয়েটা ?" তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

ফাদার ও'বেনিয়ন একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেন। "ও একজন কনভার্টের মেয়ে। আমার আগের স্টেশনে ওর মা সিস্টারদের কনভেণ্টে রাধুনীর কাজ করতো।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু ও এখানে এসেছে কেন ?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন।

এ প্রশ্নের উত্তর দিলো শিউ-লান। "আমি এই সহৃদয় পুরোহিতের কাছাকাছি থাকবো বলে এসেছি। আগে উনি আমাকে ধর্মকথা বলতেন। এখানেও আমি ওঁর কাছে ধর্ম-কথা শুনতে চাই।"

"কিন্তু আমি তো তোমাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আমার পেছনে তুমি ধাওয়া করবে না। ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"সে কথা তুমি শোনো নি কেন ?"

"এ কথা তো আপনি অনেকবার বলেছেন।" শিউ-লান বলে—"কিন্তু তবুও আমি বার বার আপনার কাছে আসি।"

ফাদার ও'বেনিয়ন বিব্রতভাবে মনসিনরের দিকে তাকান। "আমি ওকে অনেকবার এ কথা বলেছি স্যার। বহুবার ওকে আমি বলেছি যে, ও যেন কোনো নানের কাছ থেকে উপদেশ নেয়, আমার কাছ থেকে নয়।"

শিউ-লানের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তার সুন্দর গাল দুটিতে টোল খায়। "নানরা যখন আমার সঙ্গে কথা বলেন তখন আমার ঘুম পেয়ে যায়। শিউ-লান বলে—"আমি আপনার কাছ থেকেই উপদেশ শুনতে চাই।"

ফাদার ও'বেনিয়ন হতাশ ভাবে মনসিনরের দিকে তাকান। মনসিনর তখন তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। সে দৃষ্টির সামনে ও'বেনিয়ন রীতিমতো সংকুচিত হয়ে পড়েন। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয় তাঁর।

"এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার!" মনসিনর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন—"তুমি এই যুবতী মেয়েটিকে উপদেশ দিতে, এটা আমি চিন্তাও করতে পারছি নে।"

ও'বেনিয়ন চুপ করে থাকেন।

"ঘটনাটার সূত্রপাত কি ভাবে হয় ?" ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করেন মনসিনর।

"ও ওর মায়ের সঙ্গে প্রার্থনা-সভায় আসতো" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন। কথা বলতে গিয়ে তাঁর কপালে ঘাম দেখা দেয়। ডান হাত দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলেন তিনি।

"ওর মায়ের ব্যাপ্টিজমের পর থেকেই ও আসতো।"

"হ্যাঁ। আমি মায়ের সঙ্গে প্রায়ই গীর্জায় আসতাম।" শিউ-লান বলে।

"ওকেও বাপ্তাইজ করা হয়নি কেন?" মনসিনর বলেন—"মায়ের সঙ্গেই ওকে বাপ্তাইজ করো নি কেন?"

"ও বলেছিলো যে, ধর্ম সম্বন্ধে সব কথা ভালোভাবে না জানা পর্যন্ত ও দীক্ষা নিতে চায় না।" ফাদার ও'বেনিয়ন মাথা নিচু করে বলেন।

তাঁর মনে পড়ে যায় যে, মেয়েটি প্রায়ই তাঁর স্টাডিতে এসে তাঁর সামনে বসতো। তিনি বার বার ওকে বলেছিলেন যে, ও যেন প্রার্থনা-সভায় আসে। কিন্তু সে কথা ও কানেই নিতো না। ও এসে সোজা হাজির হতো স্টাডিতে।—যেখানে আর কেউ থাকতো না। এটা যে অন্যায় সে কথা তিনি ভালো করেই জানতেন। ও তাঁর সামনে টেবিলের ওপর কনুই রেখে বসতো। তিনি চেষ্টা করতেন ওর মুখের দিকে না তাকাতে, কিন্তু চেষ্টা করেও তিনি তা পারতেন না। মাঝে মাঝেই তিনি ওর দিকে'তাকাতেন। এই সব কথা মনে পড়ায় তার কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে।

"এবং তুমিও ওর কথামতো ওকে ধর্ম-কথা শুনাতে।" মনসিনর বললেন—"কতদিন ধরে এরকম চলেছিলো?"

ফাদার ও'বেনিয়ন চুপ করে থাকেন।

"তাহলে অনেক দিন ধরেই এটা চলছিলো, কেমন?" মনসিনর জিজ্ঞেস করেন।

এবারেও কোনো কথা বলেন না ও'বেনিয়ন।

"তাহলে তোমার ইচ্ছেতেই এটা হতো তাই না?"

"না-স্যার! ও আসতো ওর মায়ের কথামতো।" ও'বেনিয়ন বললেন।

"ওর মা কি ওকে তোমার সঙ্গে নিভৃতে থাকতে বলতো ?" মনসিনর জিজ্ঞেস করেন।

"না, না," ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"তখন ওখানে অনেক লোক থাকতো। আমি ওকে কখনও আমার সঙ্গে একা থাকতে দিতাম না।" জেনে শুনে মিথ্যে কথা বলেন ও'বেনিয়ন। কিন্তু কথাগুলো তিনি এমন জোরের সঙ্গে বলেন যাতে মনসিনর তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করেন না। তিনি তখন ফিরে তাকান মেয়েটির দিকে। মেয়েটি কিন্তু তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলো না। সে তাকিয়ে ছিলো ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে। ওর ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠেছিলো আদিম নারী ঈভের মতো দুষ্টু হাসি।

এ হাসির অর্থ বুঝতে দেরী হয় না মনসিনরের।

"চলে যাও," মনসিনর আদেশের সুরে বলেন—"এখনই এখান থেকে চলে যাও তুমি। আমরা এখানে বন্দী। এখানে তোমার থাকা সম্ভব নয়।"

"আমার এখানে থাকবার অনুমতি আছে, স্যার।" শিউ-লান বলে।

"অনুমতি! কার অনুমতি ? মনসিনর জিজ্ঞেস করেন।

"লাল ফৌজের কর্নেল হো-সান আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।"

"তুমি তাহলে বলতে চাও, সে-ই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে ?" মনসিনর বিস্মিত স্বরে বলেন।

"হ্যাঁ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের কাজ-কর্ম করবার জন্যেই আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। রান্না-বান্না, কাপড় কাচা—সব।" শিউ-লান বলে।

মনসিনরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে শিউ-লান। মনসিনর নিজের মনেই বলে ওঠেন—"বেশ, তবে তাই হোক। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন।"

এরপর ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—"শোনো ও'বেনিয়ন। তুমি ওকে ধর্মোপদেশ দিতে পারো। তবে উপদেশ দেবার সময় তুমি সব সময় মনে রাখবে যে, তুমি একজন ধর্মযাজক, আর যাকে উপদেশ দিচ্ছো, সে একটি তরুণী নারী।"

"আমার তা মনে থাকবে, মনসিনর।" ও'বেনিয়ন নিম্নস্বরে বললেন।

মনসিনর ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ফাদার ও'বেনিয়ন তখন দ্রুতপদে ওখান থেকে উঠে দোতলায় চলে যান। নিজের ঘরে গিয়ে ভগবানের উদ্দেশে তিনি প্রার্থনা করতে থাকেন—"ভগবান, আমাকে রক্ষা করো। আমার মনে যেন পাপ চিন্তা স্থান না পায়।"

॥ পাঁচ ॥

ফাদার ও'বেনিয়ন যখন নিচে নেমে এলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, শিউ-লান বাঁশ বাগানে বসে আছে। বাঁশ বাগানটা রেক্টরীর দক্ষিণ দিকে। গেট থেকে অনেকটা দূরে। জায়গাটা খুব নিরিবিলি। মনসিনরের নির্দেশে ওখানে একটা পাথরের বেঞ্চ পেতে রাখা হয়েছে। তিনি মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে বসতেন। এখন আর তিনি ওখানে যান না। জায়গাটা এখন আগাছা আর ঝোপ-ঝাড়ে ভরতি হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে ওখানে বিরাট আকারের একটা বিষাক্ত প্রাণী দেখা গিয়েছিলো। লম্বায় সেটা ছিলো ছয় ইঞ্চিরও বেশী। বিছেটার দেহ ছিলো কঠিন আবরণে ঢাকা এবং দেহের রঙ ছিলো কালো। পাগুলো ছিলো হলদে রঙের, মাথাটা লাল এবং লেজটা চিমটের মতো দুইভাগে বিভক্ত। প্রাণীটা

মনসিনরকে আক্রমণ করে তাঁর পায়ে দংশন করেছিলো। মনসিনর সেবার মারা যাবার মতো হয়েছিলেন। এরপর থেকে ভুলেও তিনি ওই বাঁশবাগানে যাননি। তাঁর ধারণা, ওটা ছিলো শয়তানের চর।

কথাটা ফাদার ও'বেনিয়নও শুনেছিলেন মনসিনরের মুখ থেকে। তিনিও মনে করতেন যে, শয়তানই ওই প্রাণীটাকে পাঠিয়েছিলো মনসিনরকে হত্যা করবার জন্যে। কিন্তু নিতান্ত পুণ্য-বলেই সেবার তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে কি শিউ-লানও শয়তানের চর? শয়তানই কি ওকে এখানে পাঠিয়েছে? ও'বেনিয়ন তির্যক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। ও বসে ছিলো বাঁশের তৈরী একটা টুলের ওপরে। ওর পায়ে ছিলো নীল রঙের কাপড়ের জুতো। হাত দুটি কোলের ওপরে ভাঁজ করে রেখে চুপ করে বসেছিলো ও। ও'বেনিয়নকে দেখতে পেয়ে ও উঠে দাঁড়ায়। কালো চোখ দুটি ফাদার ও'বেনিয়নের মুখের সামনে তুলে ধরে ও। এবার কিন্তু ওর মুখে হাসি দেখা যায় না। ও'বেনিয়ন ধীরে ধীরে এগিয়ে যান ওর কাছে। তারপর সেই পাথরের বেঞ্চির ওপরে বসেন ওর—কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে। তিনি বসলে শিউ-লানও বসে।

ও'বেনিয়নের হাতে ছিলো একখানা ধর্মগ্রন্থ।

"আমরা কোন্ পর্যন্ত পড়েছিলাম মনে আছে?" শিউ-লানকে জিজ্ঞেস করেন ও'বেনিয়ন।

"আপনি সেদিন দশ উপদেশ ((Ten Commandments) পড়াবেন বলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মনসিনরের চিঠি পেয়ে ওটা আর পড়ানো হয়নি।"

"তোমার স্মরণশক্তি খুব প্রখর, বৎস্যে।" ওর দিকে না তাকিয়েই ফাদার বলেন।

"আপনি আমাকে যা যা বলেছিলেন সবই আমার মনে আছে।" শিউ-লান বললে।

ফাদার ও'বেনিয়ন আগের মতোই অন্যদিকে তাকিয়ে নিম্নস্বরে বল্লেন—"ভগবান আমাকে ক্ষমা করুন।"

"আমাকে কিছু বলছেন কি? শিউ-লান জিজ্ঞেস্ করে।

"না।" তিনি বললেন—"তোমাকে কিছু বলিনি।"

"তবে কি হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন নাকি?"

"না—"

"তাহলে কার সঙ্গে?"

"ভগবানের সঙ্গে।" ফাদার গম্ভীরভাবে বল্লেন—"ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করছিলাম আমি।"

"এই বাঁশ বাগানে। প্রার্থনা করবার জায়গাটা তো বেশ! "শিউ-লান দুষ্টু হাসি হাসে।

"শোনো শিউ-লান! তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন। তোমার আমার সব কথাই তিনি শুনছেন।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমি বেশ বুঝতে পারছি, তুমি এখানে আসায় তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নন।"

শিউ-লান এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

"আশ্চর্য তো! এ কথা তিনি আমার মাকে জানাননি কেন?"

"তোমার মা কি তোমাকে আমার পিছে ধাওয়া করে এখানে আসতে বলেছেন?" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন—"আমি জানি তিনি তা বলেন নি।"

"না, মা আমাকে আসতে বলেন নি। আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলবো না, ফাদার।"

"অর্থাৎ, মাকে না বলেই তুমি এখানে চলে এসেছো। তুমি তাহলে পালিয়ে এসেছো মায়ের কাছ থেকে!" ও'বেনিয়ন কঠিন স্বরে বললেন।

"না, ঠিক তা নয়! মা নিজেই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"এটা কি তুমি মিথ্যে কথা বলছো না?"

"না, ফাদার, আমি সত্যি কথাই বলছি। আপনি ওখান থেকে চলে আসায় আমার মনে খুব দুঃখ হয়েছিলো। এত দুঃখ যে, বাড়ির কোনো কাজকর্মও আমি করতাম না। এর জন্যে মা একদিন আমাকে ঝাঁটা-পেটা করে বলেন, "তুই এখুনি দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে।"

এই বলে একটু থেমে শিউ-লান আবার বলে—"এই জন্যেই আমি তাঁর চোখের সামনে থেকে চলে এসেছি।"

শিউ-লান হাসতে থাকে।

"এবার দয়া করে 'দশ উপদেশ' পড়তে শুরু করুন ফাদার।"

ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে ছাত্রীর মতো বংশবদ তাকায় সে। ও'বেনিয়ন বই খুলে গম্ভীর কণ্ঠে পড়তে শুরু করেন। এক লাইন পড়েন আর চীনা ভাষায় তার অনুবাদ করে শুনান। শিউ-লানের দিকে একবারও তিনি তাকান না। শিউ-লানও চুপ করে বসে শুনতে থাকে ফাদারের কথামৃত।

পড়া শেষ হলে ওপরের দিকে তাকান ফাদার। সূর্য তখন অনেক ওপরে উঠে এসেছে। সূর্যের কিরণ এসে ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের ভেতরে। বেঞ্চির ওপরেও রোদ এসে পড়েছে। সেই আলোয় ফাদার হঠাৎ শিউ-লানকে নতুন করে দেখলেন যেন! তার কালো চোখ দুটিতে গভীর আগ্রহ নিয়ে ও তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তা তিনি পারেন না।

"ফাদার!"

"আমাকে কিছু বলতে চাও?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করেন।

"আপনি যে সব অনুশাসনের কথা বললেন, এগুলো সবই কি আমাদের পালনীয়?

"নিশ্চয়ই।"

"আপনি নিজে এসব পালন করেন কি?" শিউ-লান বলে।

"আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করি। ভগবান আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"সব?"

"হ্যাঁ, সব।" ও'বেনিয়ন দৃঢ় স্বরে বলেন।

"প্রথম পাঁচটা তেমন কঠিন নয়।" শিউ-লান বলে—"কিন্তু ষষ্ঠটা—"

"কেন, ষষ্ঠটা কি?"

ও'বেনিয়ন মনকে দৃঢ় করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শিউ-লানের সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে তিনি কেমন যেন ঘাবড়ে যান।

"আপনি কি কখনও এই ষষ্ঠ অনুশাসন ভঙ্গ করেন নি ফাদার?" শিউ-লান জিজ্ঞেস করে।

ও'বেনিয়ন হঠাৎ চুপসে যান। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে দৃঢ় করেন তিনি। "আমাকে প্রশ্ন করা তোমার কর্তব্য নয়। (It is not your duty to question me.)

শিউ-লান এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ও'বেনিয়নের মুখের দিকে।

"আপনি বিয়ে করেননি কেন, ফাদার? বিয়ে করলে, ষষ্ঠ অনুশাসন ভঙ্গ করার কথাই উঠতো না! আপনি সুন্দর এবং আপনার বয়স অল্প। সত্যি কথা বলতে কি, আপনার চেহারাটা খুবই সুন্দর। আপনার বিয়ে করা উচিত। আপনার পক্ষে তাতে ভালোই হবে। প্রত্যেক পুরুষেরই উচিত সময় মতো বিয়ে করা। এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করা উচিত যে, তাকে সব রকমে সেবা

করতে পারে। তাকে রান্না করে খাওয়াতে পারে এবং তার জামা-কাপড় পরিষ্কার করে দিতে পারে।"

"আমি বিয়ে করবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" ফাদার বললেন।

"শিউ-লান বিস্মিত হয় ফাদারের কথা শুনে।

"এ রকম ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কেন করেছেন বলুন তো?" শিউ-লান বলে—"আমি তো দেখেছি, বিদেশী ধর্মযাজকেরা অনেকেই বিয়ে করেন, এবং তাঁদের ছেলেপুলেও হয়। আমি এমন একজন ধর্মযাজকের কথা জানি, যাঁর দুটি স্ত্রী এবং ছয়টি ছেলেমেয়ে আছে।

"তিনি ধর্মযাজক নন।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন—"তিনি প্রটেস্ট্যাণ্ট এবং মিনিস্টার। তাঁরা ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারে। তাঁদের বেলায় ওটা পাপ বলে গণ্য হয় না।"

"আপনার পক্ষে বুঝি এটা একটা পাপ?" শিউ-লান মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, আমার পক্ষে এটা পাপ।" ফাদার বলেন।

"তাহলে আপনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট হন না কেন?" শিউ-লান বলে—"আপনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট হলে আমরা—"

ফাদার ও'বেনিয়ন উঠে দাঁড়ালেন। "আমাকে এখনই মনসিনরের সঙ্গে দেখা করতে হবে।" তিনি বললেন।

শিউ-লানও উঠে দাঁড়ালো। সে দ্রুতপদে ফাদারের পেছনে পেছনে যেতে লাগলো। একটু এগিয়ে ও'বেনিয়নের হাত ধরে টানলো সে।

"আপনি কি আমার ওপরে রেগে গেছেন, ফাদার? রাগ করবেন না ফাদার—"

ওর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর ফাদারের হৃদয় স্পর্শ করলো। তিনি তাঁর হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেন। ভারী নরম ওর হাত।

ফাদার নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেও ওর হাতে হাত দিয়ে রইলেন। তিনি হাতটাকে ছাড়িয়ে নিতে পারলেন না।

"আমি তোমাকে শেখাতে চাই।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন, "আমি তোমাকে শেখাতে চাই কি করে ভালো ক্রিশ্চিয়ান হতে হয়।"

ওর মুখটা ফাদারের ঠিক কাঁধের নিচে ছিলো। তিনি ওর দিকে না তাকিয়ে পারলেন না। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল দেখছেন।

"আমাকে আপনি শেখান," মৃদুস্বরে শিউ-লান বললে—"আপনি আমাকে ভালোভাবে সব কিছু শেখান।"

ও'বেনিয়ন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার ধমনীর রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হলো। "ভগবান জানেন, কি হতে পারতো," যদি না ঠিক এই সময়ে মনসিনরকে তিনি দেখতে পেতেন। মনসিনর তখন রেক্টরীর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন ওদের দিকে। রাগে তাঁর সারা দেহ কাঁপছিলো।

"ও'বেনিয়ন!" বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন তিনি,—"এখানে তুমি কি করছো?"

"উনি আমাকে 'দশ অনুশাসন' শেখাচ্ছিলেন।" শিউ-লান বললে।

তখনও সে ফাদার ও'বেনিয়নের হাতটা ধরে ছিলো। বেচারা ওবেনিয়নের অবস্থা তখন সাংঘাতিক। তিনি তাড়াতাড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন।

মনসিনর সবই লক্ষ্য করেছিলেন। ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে রোষকশায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি।

"আমার সঙ্গে এসো তুমি।" মনসিনর আদেশের সুরে ও'বেনিয়নকে বললেন।

"নিশ্চয়ই! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি যাবো। খুশী মনেই যাবো।" রুদ্ধকণ্ঠে ও'বেনিয়ন বললেন। তার হাতখানা যেন পুড়ে যাচ্ছিলো।

"তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে চলো।" মনসিনর বললেন— "আমি তোমার কাছ থেকে সব কিছু শুনতে চাই।" ভয়াবহ সুরে মনসিনর বললেন—"আজ থেকে তুমি দ্বিগুণ সময় পড়াশুনা করবে এবং সব সময় আত্মানুসন্ধান করবে। তোমাকে নিজেই স্থির করতে হবে যে, তুমি কোনো পাপ করেছো কিনা।"

"নিশ্চয়ই আমি তা করবো, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন মৃদুস্বরে বললেন।

মনসিনর চলতে শুরু করলেন। রাগে গড় গড় করতে করতে সোজা হয়ে হাঁটতে লাগলেন তিনি। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। ও'বেনিয়ন কি করছে দেখতে চাইলেন তিনি। ও'বেনিয়ন তখন চিন্তিত ভাবে তাঁকে অনুসরণ করছিলেন। মনসিনরের কথাগুলো তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করছিলো। 'সত্যিই কি আমি পাপ করেছি? আমার মনে কি পাপ-চিন্তা স্থান পেয়েছে?' নিজের মনেই এই কথা তিনি ভাবছিলেন। শিউ-লান তাঁর পেছনেই আসছিলো। কিন্তু তার দিকে তিনি ফিরেও তাকালেন না। মৃদু মৃদু হাসছিলো শিউ-লান। মনসিনর তাঁকে সঙ্গে করে সোজা চ্যাপেলের দিকে চলতে লাগলেন।

ওঁরা দুজনে চোখের আড়াল হতেই শিউ-লান রান্না ঘরের দিকে রওনা হলো। রান্না ঘরের অবস্থা দেখে তার হাসি পেয়ে গেল। এখানে জঞ্জাল, ওখানে ছাই, ক'দিন ঝাড়ু দেওয়া হয়নি, দুটো প্লেটে ডিমের দাগ লেগে আছে, কালির মতো কালো চায়ের তলানি পড়ে আছে কাপের মধ্যে। শিউ-লান তার জামার আস্তিন গুটিয়ে কাজে লেগে গেল। প্রথমে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলো ঘরের আবর্জনাগুলো। তারপর বাসনপত্র ধুয়ে ফেললো।

খাবার জিনিস বলতে কিছুই নেই সেখানে। ভাত, মাংস, মাছ, তরকারি কিছুই নেই। শিউ-লান তার জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সিল্কের রুমালে বাঁধা ছোট্ট একটা পুটলি বের করে আনলো। তাতে কিছু টাকা-পয়সা বাঁধা ছিলো। ওগুলো সে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে আসবার সময়। পুটলিটা খুলবার আগে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। গার্ড তাকে লক্ষ্য করছে কিনা দেখে নেয়। না, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না। সে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে পুটলিটা খুলে টাকাক'টা গুনে নিয়ে ও থেকে তিনটি টাকা বের করে রেখে বাকি টাকাগুলো আবার পুঁটলি করে বেঁধে জামার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখে। টাকা তিনটি হাতের মুঠোয় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। গেটের কাছে আসতেই সেন্ট্রি ওকে বাধা দেয়। সে ওকে ধরতে চেষ্টা করে। শিউ-লান ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় তাকে।

"তোমার তো সাহস কম না!" শিউ-লান বলে—"আমার গায়ে হাত দিতে চাইছো! আমাকে এখানে কে পাঠিয়েছেন জানো? আমাকে পাঠিয়েছেন কর্নেল হো-সান। আমি তাঁর কাছে তোমার ব্যবহারের কথা বলবো।"

হো-সানের নাম শুনে সেন্ট্রি ঘাবড়ে যায়। সে তখন দুই পা পেছনে সরে শিউ-লানকে সেল্যুট করে। শিউ-লান বেরিয়ে যায় গেট দিয়ে।

॥ ছয় ॥

দু ঘণ্টা হলো ফাদার ও'বেনিয়ন ছাড়া পেয়েছেন। মনসিনর সারাদিন ওঁকে চোখে চোখে রেখেছেন। স্বীকারোক্তি দেবার আগে পাপীকে যে ভাবে চোখে চোখে রাখা হয়, ও'বেনিয়নকেও সেইভাবে গার্ড দিয়েছেন মনসিনর।

"স্বীকারোক্তি দেবার মতো কোনো কিছু আমি করিনি।" অন্ততঃ দশবার একথাটা বলেছেন ফাদার ও'বেনিয়ন।

বিকেলের দিকে ও'বেনিয়নকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে আসেন মনসিনর। শিউ-লান ওখানে ছিলো না। আগেই সে চলে গেছে। কখন গেছে বা কোথায় গেছে তা ওঁরা জানেন না। তবে যাবার আগে ঘর-দোর পরিষ্কার করে গেছে সে। ওঁদের জন্যে রান্নাও করে গেছে। স্টোভের ওপরে রয়েছে ভাতের হাঁড়ি। মাংস এবং তরকারিও রয়েছে দুটো পাত্রে। খাবার বেড়ে নিয়ে ওঁরা খেতে বসলেন। রান্না বেশ ভালোই হয়েছে। খুশী মনে খেলেন ওঁরা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মনসিনর একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। গতকাল থেকে খাওয়া হয়নি। সকালে ফাদার ও'বেনিয়ন যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করেছিলেন তা খাওয়ার মতো ছিলো না। মনসিনর বসলে ও'বেনিয়ন চা তৈরি করলেন। মনসিনরকে এক বাটি দিয়ে নিজেও এক বাটি নিলেন। গরম চা পান করে খুশী হলেন মনসিনর। এবার তিনি ও'বেনিয়নের দিকে তাকালেন।

"তুমি একটি যুবতী মেয়ের হাত ধরেছিলে, তবুও বলছো তুমি কোনো পাপ করোনি!" এবার আর তার কণ্ঠস্বর আগের মতো রুক্ষ নয়।

"আমি ওর হাত ধরিনি।" ফাদার ওবেনিয়ন বললেন—"ওই আমার হাত ধরেছিলো। আমি যখন হাতটা ছাড়াতে যাচ্ছিলাম ঠিক সেই সময়ই আপনি আমাকে দেখতে পান। ও আমার হাত ধরায় আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম।"

মনসিনর তাঁর কথাটা বিশ্বাস করলেন না। তবে তার মনে আর আগের মতো রাগ নেই তখন। রেক্টরীতে তখন ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। চাকরেরা আগেই পালিয়েছে। যে সব কনভার্ট ওখানে আসতো, তারাও আর আসছে না। এমনকি, প্রতিবেশীরাও আর ওখানে আসছে না। বাগানের বাইরে একজন সৈনিক রাইফেল কাঁধে নিয়ে পায়চারি করছে, আর মাঝে মাঝে রেক্টরীর দিকে তাকাচ্ছে। গেটের সামনেও রয়েছে একজন সশস্ত্র সেন্ট্রি। যেখানে এই রকম সতর্ক পাহারা সেখানে মেয়েটি বাইরে গেল কেমন করে? ওর এখানে আসা এবং এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা মনসিনরকে ভাবিত করে তোলে। গার্ডরা ওকে লক্ষ্য করেনি এটা হতেই পারে না। এই সব কথাই চিন্তা করতে লাগলেন মনসিনর। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর আবার তাঁর মনে হলো ও'বেনিয়নের কথা। আশ্চর্য! একজন ফাদার হয়ে কিভাবে তিনি একটি যুবতী মেয়ের হাত ধরলেন!

"শোনো ও'বেনিয়ন! তুমি যা করেছো তার কোনো ক্ষমা নেই।" মনসিনর বললেন—"তুমি যখন মেয়েটির হাত ধরে তার সঙ্গে কথা বলছিলে, তখন গার্ডটা নিশ্চয়ই তোমাদের দেখতে পেয়েছিলো! ও কি মনে করেছে বলো তো? এ কথা ও ওদের কমাণ্ডারকে নিশ্চয়ই জানাবে এবং তার ফল হবে অত্যন্ত গুরুতর।"

"না স্যার। আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন ধারে কাছে কেউ ছিলো না।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"কোনো গার্ডই

আমাকে দেখতে পায়নি। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। বাগানে আমি আর ওই মেয়েটি ছাড়া আর কেউ ছিলো না।"

"এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?" মনসিনরের কণ্ঠে সন্দেহের সুর,—"গার্ড না থাকবার কারণ কি?"

"তা আমি বলতে পারি নে, স্যার।" ও'বেনিয়ন বললেন।

"মেয়েটিই এ ব্যবস্থা করেছিলো।" মনসিনর চিৎকার করে বলেন। তার মনের মধ্যে হঠাৎ এক নতুন সন্দেহ দানা বাঁধে। চিন্তিত মুখে টেবিলের ওপর কনুই রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন তিনি।

"শোনো, ও'বেনিয়ন।" নিম্নকণ্ঠে মনসিনর বলেন—"তুমি যা করেছো, বা করোনি সেটা আমার কাছে এখন আর তেমন গুরুতর কিছু নয়। আমি ভাবছি অন্য কথা। আমার মনে হচ্ছে, মেয়েটি একজন রেড স্পাই। ওকে এখানে পাঠানো হয়েছিলো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। তোমাকে টেষ্ট করবার জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো ওকে। আমরা এখানে দুজনে সাধারণ অপরাধীর মতো বন্দী। এখানে আমাদের এখন অনেক কিছু হতে পারে। ওরা যদি বুঝতে পারে যে, একজন ফাদার একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে মেলামেশা করছেন তাহলে ওরা সহজেই ধরে নেবে যে, আমরা আসলে ধর্মযাজক নই—ধর্মযাজকের ছদ্মবেশে আমরা এখানে ওদের শত্রুপক্ষের হয়ে গোপন ক্রিয়া-কলাপ চালাচ্ছি। তাহলে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সে সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা আছে কি?"

ফাদার ও'বেনিয়নের চোখে-মুখে ফুটে উঠলো ভীতির চিহ্ন। তাঁর দিকে তাকিয়ে মনসিনর বলে চললেন। আগের মতোই নিম্নকণ্ঠে তিনি বললেন—"প্রথম সুযোগেই আমাকে ওরা এখান থেকে সরিয়ে নেবে। আমিই এখানকার প্রধান ধর্মযাজক। সুতরাং আমার ওপরেই ওদের রাগ হবে সবচেয়ে বেশী। তুমি তখন একা থাকবে

এখানে। কিন্তু তোমার কাছে না আছে কোনো টাকা-কড়ি, না আছে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস। আমি চলে গেলে তুমি বাঁচবে কি করে বলো তো ?"

ফাদার ও'বেনিয়ন ভীতভাবে মনসিনরের দিকে তাকান। "এসব কথা আমি আগে ভেবে দেখিনি, স্যার। মেয়েটিকে আমি আগে থেকেই জানতাম, তাই সরল-বিশ্বাসেই ওকে আমি ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলাম।"

"যা হবার তা হয়ে গেছে।" মনসিনর বললেন—"এখন আর সে কথা নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। এবার আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো। আমি এখানে কিছু কিছু দরকারি জিনিস লুকিয়ে রেখেছি। আমাকে যদি ওরা এখান থেকে নিয়ে যায় তাহলে তোমার জীবন রক্ষার জন্যে এ সব জিনিস দরকার হবে।"

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঘরের ভেতরটা আধো-আলো আধো আঁধার। মনসিনর ইচ্ছে করেই মোমবাতি জ্বালেন নি। জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকালেন তিনি। দেখে নিলেন, বাইরে থেকে কেউ তাঁদের লক্ষ্য করছে কি না। বাইরে কেউ নেই দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের অন্যদিকে একটা কাপবোর্ডর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আর একবার বাইরেটা দেখে নিলেন। জানালাটা বন্ধ করে দিলেন, কাপবোর্ডটাকে ঠেলে সরিয়ে ফেললেন। ওটার নিচে রয়েছে একটা আলগা তক্তা। তক্তাটা সরিয়ে ফেললেন তিনি। তক্তা সরাতেই বেরিয়ে পড়লো একটা গর্ত।

"আমার পেছনে এসে দাঁড়াও, ও'বেনিয়ন।" মনসিনর বললেন—"দেখো, কি সব জিনিস আমি লুকিয়ে রেখেছি এখানে।"

ও'বেনিয়ন দেখতে পেলেন যে, গর্তের মধ্যে অনেক জিনিস রয়েছে। টিনে বন্ধ বহু রকম খাবার রয়েছে এখানে। অস্ট্রেলিয়ান

মাখন, মাংস, ডাচ চীজ, আমেরিকান মিল্ক পাউডার, নরওয়ের মাছ এবং আরও অনেক কিছু।

"এ যে বিরাট সম্পদ!" ফাদার ও'বেনিয়ন বিস্মিতভাবে বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এসব আমি আগে থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছি।" তক্তাটা চাপা দিতে দিতে মনসিনর বললেন। এরপর আবার কাপবোর্ডটা টেনে সেই তক্তার ওপরে নিয়ে এলেন।

"আমি জানতাম, কমিউনিস্টরা শীগগিরই এসে পড়বে।" মনসিনর বললেন—"ওদের মতো আমারও গুপ্তচর আছে। ওরা হলো আমার কনভার্ট। ওরাই আমাকে কমিউনিস্টদের খবর জানাতো। ওরা এসে পড়লে যে কি হবে, এই কথা চিন্তা করেই ভবিষ্যতের জন্যে খাবার-দাবার ব্যবস্থা করে রেখেছি। এসবই আমি কিনেছি চার্চের টাকা থেকে। তবে ও টাকা আমি নিয়েছি ঋণ হিসেবে। সুবিধেমতো ও টাকা আমি শোধ করে দেবো।"

ফাদার ও'বেনিয়ন হঠাৎ মনসিনরের কাঁধে হাত দিয়ে ফিসফিস করে বললেন—"জানালার দিকে একবার তাকান, স্যার।"

জানালার একটা খড়খড়ি ভেঙে গিয়েছিলো। কিছুদিন আগে যখন ওখানে ঘুর্ণি ঝড় হয় সেই সময় ওটা ভেঙে গিয়েছিলো। ওটা আর মেরামত করা হয়নি। ওখানে তাই কিছুটা ফাঁক হয়ে ছিলো। সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে তাকিয়ে ছিলো অল্টার-বয়।

"আমি আপনার জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি।" জানালার ফাঁক দিয়ে একটা পোটলা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো সে।

"আমরা কি করছি তা ও দেখে ফেলেছে, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন ফিসফিস করে বললেন।"

"তাতে কিছু আসে যায় না।" মনসিনর বললেন—"ছেলেটা বিশ্বাসী। ও নিশ্চয়ই কিছু বলবে না।"

"আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, ও বলে দেবে। ও'বেনিয়ন বললেন।

মনসিনর তখন জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"গুড বয়।" মনসিনর বললেন—"কি আছে এতে?"

"কয়েকটা মাংসের চপ, স্যার।" ছেলেটি বললে—"আমার মা এগুলো তৈরী করেছেন।"

"তোমার মাকে আমার আশীর্বাদ জানিও।" পোটলাটা হাতে নিয়ে মনসিনর বললেন।

"আমার মন থেকে কিন্তু সন্দেহ দূর হয়নি, স্যার।" ওবেনিয়ন ইংরেজিতে বললেন—"আমার মনে হচ্ছে ওকে এখানে পাঠানো হয়েছে আমাদের খবর নেবার জন্যে।"

"তোমার তাহলে ধারণা, এই ছেলেটি স্পাই আর মেয়েটি ধোয়া তুলসী-পাতা!" মনসিনর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই মেয়েটিই স্পাই।"

ওঁরা যখন বাদানুবাদ করছেন সেই সময় ছেলেটি ওখান থেকে চলে গেছে। একটু পরেই রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। হো-সান প্রবেশ করলো ঘরের মধ্যে।

"এভাবে চোরের মতো ঘরে ঢুকবার কারণ কি, হো-সান?" মনসিনর ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

"চোপ রও, বিদেশী কুকুর," হো-সান চিৎকার করে ওঠে,—"কোন্ সাহসে তুমি জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখেছো? আমাদের সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পরিণাম কি হয় তা বোধ হয় তোমার ধারণা নেই।"

ফাদার ও'বেনিয়ন সামনে এসে দাঁড়ালেন এই সময়। তাঁর হাব-ভাব দেখে হো-সান রেগে গিয়ে তাঁর হাতে আঘাত করলো।

"ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন না, হো-সান।" মনসিনর চিৎকার করে বললেন।

হো-সান হো-হো করে হেসে উঠলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে সৈনিকদের ডাকলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা ছুটে এলো ঘরের ভেতরে। হো-সানের নির্দেশে তারা কাপবোর্ড সরিয়ে ফেললো। তারপর গর্তের ওপরের তক্তাটা সরিয়ে ফেলে ভেতর থেকে সমস্ত জিনিস বের করে মেঝের ওপরে রাখলো। ঘটনার এই আকস্মিকতা দেখে ফাদার মনসিনর একেবারে বোবা হয়ে গেলেন যেন। মনসিনর বেশ বুঝতে পারলেন যে, তার বিশ্বাসী অল্টার-বয়ই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মনসিনর এবং ফাদার ও'বেনিয়ন দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সর্বনাশের ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। ও'বেনিয়ন যে সব জিনিসকে সম্পদ বলে উল্লেখ করেছিলেন সে সম্পদ পরিণত হল বিপদে। সৈনিকরা হাসাহাসি করতে করতে বাক্স ভরতি টিনের কৌটোগুলো বাইরে নিয়ে যেতে লাগলো। হো-সানও গেল তাদের সঙ্গে। ওরা চলে যেতেই ফাদার-দ্বয় জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওঁরা দেখতে পেলেন, হো-সান সোজা গেটম্যানের কাছে গিয়ে তাকে হুকুম করলো—"এই উল্লুক! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? জিনিসগুলো গাড়িতে তুলে দিতে পারছিস না?"

হো-সানের রুদ্র মূর্তি দেখে গেটম্যান বেচারা ভয়ে কেঁচো হয়ে গেল। সে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জিনিসগুলো গাড়িতে তুলে দিতে লাগলো।

মনসিনর ফিজগিবন ঘোৎ ঘোৎ করে উঠলেন। এতক্ষণ তিনি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন হতাশভাবে একখানা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লেন। "আমাদের কেউ নেই। দারোয়ানও এখন শত্রুপক্ষের লোক।" মনসিনর বললেন,—"অথচ এই লোকটাকে আমি বহুদিন থেকে সাহায্য করে চলেছি। ওর ছেলেমেয়েদের

জামা-কাপড় দিচ্ছি অনেক বছর ধরে। হায় ভগবান! আমি দেখছি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছি। আমার ব্যর্থতার জন্যেই সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে।"

"এটা আপনি ঠিক বললেন না, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"ওরা কেউ স্বেচ্ছায় আপনার বিরোধিতা করছে না! বন্দুকের ভয়ে ওরা ওদের কথামতো কাজ করছে। হো-সান যদি খালি হাতে একা আসতো তাহলে কি জিনিসগুলো সে নিয়ে যেতে পারতো। আপনি কি তাহলে ওকে সব দিয়ে দিতেন? না, তা কখনও দিতেন না। তার হাতে বন্দুক আছে বলেই আমাদের ও বন্দী করে রাখতে পেরেছে।"

"আমি কিন্তু অন্য রকম আশা করেছিলাম।" মনসিনর বললেন, —"আমি যাদের কনর্ভাট করেছি, তারা আমার বিরোধিতা করবে এটা আমি ভাবতেও পারি নি। এই জন্যেই তো বলছি, আমি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছি।"

এই সময় আর একটি ঘটনা লক্ষ্য করলেন ওঁরা। হো-সান আবার গেটের ভেতরে ঢুকেছে। সে সোজা এগিয়ে চলেছে বাগানের দিকে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কি যেন দেখছে সে। নেবার মতো আর কিছু আছে কিনা। হঠাৎ তার নজর পড়লো গাধাটার দিকে। গাধাটা তখন একদিকে দাঁড়িয়ে মুখ নিচু করে ঘাস খাচ্ছে। হো-সান এগিয়ে এলো গাধাটার দিকে। তারপর দড়িটা ধরে টেনে নিয়ে চললো গেটের দিকে। ও যখন গাধাটাকে নিয়ে গেটের দিকে যাচ্ছে সেই সময় শিউ-লান কোথা থেকে ছুটে এসে দাঁড়ালো হো-সানের সামনে। এতক্ষণ সে বাগানের একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে বসেছিলো। হো-সান গাধাটা নিয়ে যাচ্ছে দেখে সে আর চুপ করে থাকতে পারেনি।

হো-সানের সামনে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো সে।

গাধার দড়িটা ধরে সে বললে—"এটা কি করছেন আপনি? এটা কি অধিনায়কের কাজ? লাল ফৌজের কর্নেল হয়ে আপনি গাধা চুরি করছেন! ছিঃ ছিঃ!"

ফাদারদ্বয় জানালা দিয়ে সবই দেখতে পাচ্ছিলেন। শিউ-লানের কথাগুলোও শুনতে পাচ্ছিলেন ওঁরা। সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে হো-সানের দিকে তাকিয়ে বলছিলো,—"তাহলে সাধারণ চোর ডাকাতের সঙ্গে আপনার তফাৎ কি? আপনিও দেখছি শত্রুপক্ষের সৈনিকদেরও হার মানিয়েছেন। যে সৈন্যদের আপনারা শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাদের আপনারা চোর-ডাকাত বলেন। আপনি বললেন, আপনার লোকেরা কখনও চুরি করবে না। আমরাও ভেবেছিলাম, কমিউনিস্টরা সবাই ভালো লোক। কমিউনিস্ট সেনাদলের অধিনায়ক হিসেবে আপনি তো একজন বিখ্যাত লোক। কিন্তু আপনিই আজ একটা গাধা চুরি করছেন।"

"চুপ কর্ শয়তানী! "হো-সান চিৎকার করে উঠলো,—"আমি চুরি করছি নে। আমি এটাকে বাজেয়াপ্ত করছি।"

"চমৎকার! চমৎকার কাজ করছেন কর্নেল হো-সান। "শিউ-লান শ্লেষের সঙ্গে বললে—"এ শহরের অধিনায়ক, লাল ফৌজের কর্নেল হো-সান এবার গাধা বাজেয়াপ্ত করে তাঁর কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। আপনারা বলেন, আপনারা জনগণের বন্ধু। বন্ধুত্বের চমৎকার নিদর্শন দেখাচ্ছেন আপনারা। দুজন অসহায় বিদেশী ধর্মযাজককে বন্দী করে রেখে তাঁদের জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়াটা বুঝি জনদরদী কাজ?

"চোপ রাও ক্রিশ্চিয়ান!" হো-সান চিৎকার করে উঠলো—"তোমাকে গুলি করে মারা উচিত।"

"তাহলে আর দেরী করছেন কেন?" শিউ-লান আগের মতোই শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—"দয়া করে বন্দুক নিয়ে এসে সে মহৎ

কর্তব্যটি সুসম্পন্ন করে ফেলুন। আমি তো নিরস্ত্র। একজন নিরস্ত্র নারীকে হত্যা করে বীরত্ব প্রদর্শন করুণ অধিনায়ক মশাই।"

অস্তগামী সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে শিউ-লানের মুখে। তার চোখ দুটো তখন রাগে জ্বলছে। তার সুন্দর মুখখানা যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে এতে। হো-সান তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো।

"না। কোনো মেয়েকে আমরা হত্যা করিনি।" হো-সান বললে—তোমাকে গুলি করে মারা মানে, একটি বুলেটের অপচয় করা। তাছাড়া তোমাকে আমার অন্য কাজে প্রয়োজন আছে। এবং সে কাজটি যে কি, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।"

কথাটা বলেই হো-সান খপ্ করে তার কনুইটা ধরে তাকে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগলো। শিউ-লান প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো তাকে। আঁচড়ে, কামড়ে, লাথি মেরে সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো।

"ভগবান দয়া করুন।" হতাশভাবে বলে উঠলেন মনসিনর।

ও'বেনিয়ন তখন চোখ বুজে প্রার্থনা করছেন। মনসিনর তাঁর দিকে লক্ষ্য না করে জানালা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। দ্রুতবেগে হো-সানের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

"ওকে ছেড়ে দে শয়তান।" মনসিনর চিৎকার করে উঠলেন। "ওরে নরকের কীট! ওরে শয়তানের পাঁজরা! এখনই ছেড়ে দে ওকে!

হো-সান তাঁর কথা কানেই নিলো না। সে তখন শিউ-লানকে তার বুকের ওপরে টেনে নিয়েছে। মনসিনর রাগে জ্ঞান হারিয়ে হো-সানকে এলোপাথারি লাথি মারতে লাগলেন। কিন্তু মনসিনরের লাথিতে ওর কিছু হলো না। সে তখন মনসিনরের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে—ওরে বুড়োমানুষ, তোর লাথিতে আমার কিছু হবে না। তুই এখনই ভেতরে চলে যা, নইলে তোর সামনেই আমি একে বলাৎকার করবো।"

মনসিনর তখন স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে হো-সানের উরুটা কামড়ে ধরলেন। কামড়ের চোটে দাঁত বসে গেল মাংসের ভেতরে। সে তখন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে শিউ-লানকে ছেড়ে দিয়ে মনসিনরকে ধরে ফেললো। দুই হাত দিয়ে ধরে একটা হেঁচকা টান মেরে মনসিনরকে শূন্যে তুলে ফেললে সে। তার মতলব ছিলো, মনসিনরকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু মতলবটা আর কাজে পরিণত করা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। কে যেন পেছন দিক দিয়ে তার হাত দুটো সহ গলাটা সাঁড়াসির মতো চেপে ধরেছে।

আগেই বলেছি, ফাদার ও'বেনিয়ন চোখ বুজে প্রার্থনা করছিলেন। কিন্তু বাইরে চিৎকার শুনে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন তাতে আর প্রার্থনা করা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। "প্রভু আমাকে এক মিনিটের জন্যে মার্জনা করুন।" অনুচ্চ কণ্ঠে এই কথা বলে জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লেন তিনি। হো-সান তাঁর দিকে পেছন ফিরে ছিলেন বলে তাঁকে সে দেখতে পায়নি। সে তখন মনসিনর ফিজগিবনকে দুই হাত দিয়ে ধরে মাথার ওপরে তুলে ফেলছে। ও'বেনিয়ন বিদ্যুৎবেগে তার পেছনে ছুটে গিয়ে দুই হাত দিয়ে তার হাত দুটি আর গলাটা চেপে ধরেন। এত জোরে চেপে ধরেছিলেন যে, হো-সানের দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। মনসিনর এই সুযোগে তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে নিচে নেমে দাঁড়ালেন।

"ধন্যবাদ, ও'বেনিয়ন।" মনসিনর বললেন—"শয়তানটা আমাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছিলো।"

"আপনি ভেতরে যান, স্যার!" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"শয়তানটার সঙ্গে আমিই মোকাবিলা করছি।"

"আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।" মনসিনর বললেন।

"না, স্যার। ও'বেনিয়ন বললেন—"আমি একাই এর মোকাবিলা করতে পারবো। আপনি ভেতরে যান। শিউ-লান, তুমিও যাও।"

"আপনি কি ওর সঙ্গে লড়াই করবেন?" শিউ-লান আর্তস্বরে বললে।

"না, ফাদার" ও'বেনিয়ন বললেন,—"লড়াই করা আমার পেশা নয়। আমি শান্তিপ্রিয় লোক। নিজের জন্য আমি কারো সঙ্গে লড়াই করিনি।"

"কিন্তু—" শিউ-লান আবার কি বলতে যাচ্ছিলো।

"আর কোনো কথা নয়। তুমি এখনই ভেতরে চলে যাও।"

"না। আমি ভেতরে যাবো না।" শিউ-লান বললে।

"তাহলে বাঁশ ঝাড়ের ভেতরে গিয়ে বসো।" ও'বেনিয়ন আদেশের সুরে বললেন।

এবার আর শিউ-লান আপত্তি করলো না। সে বাঁশ ঝাড়ের দিকে ছুটে দৌড় দিলো।

ফাদার ও'বেনিয়ন তখন হো-সানকে লৌহ-বেষ্টনিতে ধরে আছেন। তিনি মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, হো-সানের দেরী দেখে তার অধীনস্থ সৈনিকরা যেন ওখানে এসে না পড়ে। ইতিমধ্যে দারোয়ান তার ঘরে ফিরে এসেছে। সে সব কিছুই দেখতে পেয়েছে। ওদিকে গেটের সেন্ট্রি আর সৈনিকরা শুধু এইটুকুই দেখেছে যে, হো-সান একটি সুন্দরী মেয়েকে তার বুকের ওপরে টেনে নিয়েছে। এই সময় ওখানে গিয়ে বাধা সৃষ্টি করতে চায়নি তারা। সেন্ট্রি তাই গেটটা বন্ধ করে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, কর্নেল তার কাজ সেরে এলে আবার সে খুলে দেবে গেট।

মনসিনর তখন বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেছেন। শিউ-লান আত্মগোপন করেছে বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে। ফাদার ও'বেনিয়ন তখন

তাঁর হাতের বাঁধন শিথিল করে হো-সানকে বললেন—"তোমাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমার নেই। এবার তুমি মানে মানে সরে পড়ো এখান থেকে।"

হো-সান জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো ও'বেনিয়নের দিকে। পারলে সে এখনই তাঁকে হত্যা করতো। কিন্তু ফাদারদের হত্যা করবার নির্দেশ সে পায়নি। তার ওপরে হুকুম হয়েছে, সে যেন রেক্টরীর ধর্মযাজকদের নজরবন্দী করে রাখে। ওপরের এই হুকুমের বিরোধিতা করবার সাহস তার নেই। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে তার সৈনিকদের ডাকলো না।

"তুমি—তুমি ক্রিশ্চিয়ান," হো-সান বললে,—"এবার তুমি অপর গালটি এগিয়ে দিচ্ছো।"

"তোমার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে বলে আমি দুঃখিত।" ফাদার ওবেনিয়ন বললেন,—"এটা আমার স্বভাব নয়। তাছাড়া আমাদের ধর্মেও এরকম নির্দেশ নেই।"

"ঠিক আছে, তোমরা কেমন ধার্মিক তা আমি দেখবো। হো-সান খেঁকিয়ে ওঠে। (Ho-san barked.)

হঠাৎ সে ফাদার ও'বেনিয়নের বাঁ গালে চপেটাঘাত করে। ও'বেনিয়ন শুধু একটু হাসেন। তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন হো-সানের চোখের দিকে।

"এবার অন্য গালটি এগিয়ে দাও।" হো-সান চিৎকার করে বলে।

ফাদার ও'বেনিয়ন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। হো-সান আবার তাঁর ডান গালে চপেটাঘাত করে।

"ওরে বিদেশী শয়তান!" হো-সান খেঁকিয়ে ওঠে,—"তুই আমেরিকার স্পাই। তোর মতো সব পুরোহিতই আমেরিকার স্পাই। ওরে গাধার বাচ্চা। তোদের আমি ভালো করেই জানি।"

শিউ-লান বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে বসে সব লক্ষ্য করছিলো। হো-সান

ও'বেনিয়নকে মেরে চলেছে আর তিনি নির্বিবাদে তার মার হজম করে চলেছেন, এটা সে সহ্য করতে পারলো না। সে ছুটে বেরিয়ে এসে অনুযোগের সুরে ফাদার ও'বেনিয়নকে বললে—"একি ব্যাপার ফাদার। আপনাকে মেরে চলেছে আর আপনি ওকে কিছু বলছেন না। এ কি রকম ব্যাপার? আপনি হঠাৎ এভাবে ভেড়া হয়ে গেলেন কেন? একটু আগে আপনার যে শক্তি আমি দেখেছি, সে শক্তি কোথায় গেল? তখন আপনি ছিলেন বিজয়ী, আর এখন আপনি যেন ওর ক্রীতদাস!"

শিউ-লানের কথা শুনে ফাদার ও'বেনিয়ন শুধু একটু হাসলেন।

"ধর্মপিতা!" শিউ-লান আবার বললে,—"আপনি কি এইভাবে ওর কাছে মার খেয়ে যাবেন?"

"মার খাওয়া ছাড়া ওর আর কিছু করবার নেই।" হো-সান গর্জন করে ওঠে,—"ও একটা কাগুজে বাঘ (paper tiger) ছাড়া আর কিছুই নয়। বাঘের মুখোশটা একবার দেখো।"

"হো-সান ওঁর গালে পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাত করতে লাগলো। ব্যাপার দেখে শিউ-লান কেঁদে ফেললো। সে ধারণাও করতে পারেনি যে, ফাদার ও'বেনিয়ন এই ভাবে মার খেয়ে যাবেন।

শিউ-লানের কান্না শুনে মনসিনর জানালা দিয়ে ও'বেনিয়নের দিকে তাকালেন। হো-সান তাঁকে মারছে দেখে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

"প্রত্যাঘাত করো', ও'বেনিয়ন।" মনসিনর চিৎকার করে বললেন,—"ওকে আঘাত না করলে মেরী মাতা তোমার ওপরে নির্দয় হবেন। ভগবানের নামে আমি বলছি, ওকে তুমি আঘাত করো।"

মনসিনরের কথা শুনে ও'বেনিয়নের মন থেকে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন হো-সানের সামনে। হো-সান আবার এগিয়ে এলো তাঁকে আঘাত করতে। কিন্তু সে

আঘাত করবার আগেই ফাদার ও'বেনিয়ন তার পেটের ওপরে ঘুসি মারলেন। ঘুসি খেয়ে হো-সান ছিটকে পড়লো দুই হাত দূরে। ও'বেনিয়ন তার জামার কলার ধরে টেনে তুলে আর একটা ঘুসি মারলেন পাঁজরার ওপরে। ও'বেনিয়ন বাঁ হাত দিয়ে ওর জামার কলারটা ধরে থাকায় এবার আর সে পড়ে গেল না। ও'বেনিয়ন তখন হো-সানের ঘাড় ধরে এমন এক ধাক্কা মারলেন যে, সে একেবারে গেটের সামনে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। গেটের সেন্ট্রি তাড়াতাড়ি গেট খুলে তাকে বাইরে বের করে দিয়ে আবার গেট্‌টা বন্ধ করে দিলো। ও'বেনিয়ন বিজয়ী বীরের মতো বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তিনি ভেতরে ঢুকতেই মনসিনর এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। "সাবাস ভাই! তুমি আজ ওকে ভালোভাবে শিক্ষা দিয়েছো।"

ও'বেনিয়ন শুধু একবার মাথা নাড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। মনের মধ্যে বিবেকের দংশন অনুভব করছেন তিনি। কে যেন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁকে বলছেন,

"ও'বেনিয়ন, তুমি কেন জানালা দিয়ে বাইরে এসে ওই লোকটাকে আক্রমণ করেছিলে তা তুমি ভালো করেই জানো। শুধু মনসিনরকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে তুমি ওখানে যাওনি। তা যদি হতো তাহলে মনসিনর যখন জানালা দিয়ে বের হয়ে যান তখন তুমি চোখ বুজে থাকতে না। আসলে তুমি ওখানে গিয়েছিলে মেয়েটার চিৎকার শুনে। ওকে রক্ষা করবার জন্যেই তুমি ছুটে গিয়েছিলে। তুমি কি ধর্মযাজক? এখনও তোমার মনে নারীর প্রতি দুর্বলতা রয়েছে। এটা ধর্মযাজকের কাজ নয়।"

"ও কথা থাক, স্যার।" নিম্নকণ্ঠে ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন— "আমি যা করেছি তা ধর্মযাজকের কাজ নয়।"

এই কথা বলেই তিনি দ্রুতপদে ওখান থেকে সরে যান। তাঁর

চোখে জল এসে পড়েছিলো। এক মিনিটের মধ্যেই তিনি তাঁর নিজের ঘরে এসে হাজির হন। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি তাঁর বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে বসেন। ভগবানের কাছে বার বার নিজের দুর্বলতার কথা বলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। একজন ধর্মযাজক হয়ে তিনি একটি তরুণীকে ভালোবেসে ফেলেছেন। এ পাপ কেন তিনি করলেন? তাঁর মনে হতে লাগলো, এ পাপের কোনো ক্ষমা নেই। মনসিনরের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন। কিন্তু ভগবানের চোখকে তো তিনি ফাঁকি দিতে পারবেন না। সর্বদ্রষ্টা ভগবান সবই দেখেছেন। সবই জেনেছেন। 'হায় ভগবান! এ পাপ চিন্তা আমার মনে কেন এলো?' বার বার এই কথা তিনি নিজের মনে বলতে লাগলেন।

সেদিন আর ঘর থেকে বের হলেন না ফাদার ও'বেনিয়ন। প্রার্থনা করেও তার মনের শান্তি ফিরে এলো না। তিনি চুপচাপ করে শয্যায় শুয়ে পড়লেন। কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে দিলেন তিনি। রাত্রে ঘরে আলো জ্বালার ইচ্ছেও তাঁর হলো না। বাড়িতে কোনো রকম শব্দ নেই। মনসিনরও তাঁকে ডাকেন নি। ও'বেনিয়নের মনটা আজ রীতিমত অশান্ত। জীবনে তিনি কোনো মেয়েকে ভালোবাসেন নি। তিনি ভালোই জানেন যে, ধর্মীয় অনুশাসনে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া পাপ। ছেলেবেলা থেকেই তিনি জানতেন যে, উত্তর জীবনে তাঁকে ধর্মযাজক হতে হবে। তাঁর ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁর পিতা-মাতার ইচ্ছে ছিলো, তাদের বড়ো ছেলে হবে ধর্মযাজক। একদিন তিনি আলুর ক্ষেতে কাজ করতে করতে পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে দেখতে পান। মেয়েটি বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করছিলো।

মেয়েটিকে দেখে তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়েটির দিকে। হঠাৎ পেছন দিক হতে তার বাবার ডাক শুনে ফিরে দাঁড়ান তিনি।

"শোনো।" তাঁর বাবা বলেছিলেন,—"তোমাকে দু' একটা কথা বলতে চাই আমি।"

বাবা এগিয়ে এসেছিলেন তার দিকে।

"শোনো। বৎস! তোমাকে ধর্মযাজক হতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই তোমাকে চার্চে পাঠানো হবে। সুতরাং এখন থেকেই তোমাকে এর জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করা তোমার পক্ষে উচিত হবে না।"

বাবার কথা শুনে তিনি ফিরে এসেছিলেন। এরপর আর কোনোদিন তিনি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন নি। তরুণ বয়সে মেয়েদের প্রতি ছেলেদের যে স্বাভাবিক দুর্বলতা থাকে তা তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি চার্চে যান। ওখানে কিছুদিন বাস করবার পর তাঁকে চীন দেশে পাঠানো হয়। এখানে এসেই শিউ-লানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সে তাঁর কাছে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ নিতে আসতো। কিন্তু তিনি তার প্রতি যে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি। এতদিন পরে আজ ওটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। শিউ-লানও হয়তো তাঁকে ভালোবাসে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে তাঁকে ভালোবাসে। তা না হলে দুশো মাইল পথ ঠেঙিয়ে কেন সে এসেছে! কিন্তু না, আর নয়। ওর চিন্তাকে এখনই মন থেকে দূর করে দিতে হবে।' 'হে ভগবান, আমার মন থেকে এ কু-চিন্তা দূর করে দাও।' বার বার ভগবানের উদ্দেশে এই কথা বলতে থাকেন তিনি।

তিনি মোমবাতি জ্বেলে তখনি বই নিয়ে পড়তে শুরু করেন। বইটি হলো সেণ্ট পলের উপদেশামৃত। এক জায়গায় তিনি

বলেছেন—"মনে মনে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে বিবাহ করা ভালো। (It is better to marry than to burn.) ও'বেনিয়ন যখন বইটি বন্ধ করতে যাচ্ছেন ঠিক সেই সময় দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল।

"আপনি কি টেবিলের ওপরের ঘণ্টাটি বাজিয়েছিলেন?",

শিউ-লানের কণ্ঠস্বর! টেবিলের ওপরে ছোটো একটি পিতলের ঘণ্টা ছিল ঠিকই, কিন্তু চাকররা পালিয়ে যাবার পর ওটা বাজাবার আর দরকার হয় না।

"না, আমি বাজাই নি।" বইয়ের পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলেন তিনি।

"কিন্তু আমি যে ঘণ্টার শব্দ শুনলাম।" শিউ-লান আবার বলে।

ফাদার ওবেনিয়ন এবার তার দিকে তাকাল। না তাকিয়ে পারেন না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সে। মোমবাতির আলো এসে তার মুখের ওপর পড়েছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। 'হায় ভগবান! এ বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করো'—নিজ মনে মনে উচ্চারণ করলেন ফাদার ও'বেনিয়ন।

"তুমি ভালো করেই জানো যে, আমি ঘণ্টা বাজাই নি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"এটা তোমার একটা বায়না!"

শিউ-লান এগিয়ে আসে তাঁর দিকে। তার মুখে তখন মৃদু হাসির রেখা।

"আপনি যেভাবে বাগান থেকে চলে আসেন তাতে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মতো সময়ও পাইনি। আপনি সত্যিই মহান। আপনাকে আমি দেবতার মতো ভক্তি করি।"

ও'বেনিয়ন তার মুখের দিকে তাকাল। তার মুখের মিষ্টি কথা শুনে মনে মনে খুশী হল। কিন্তু তার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। তার ঠোঁট দুটি শুকিয়ে আসে। কোনো কথাই তিনি বলতে পারেন না।

শিউ-লান আরো এগিয়ে আসে। তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। "আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি বলুন।" সে বলে।

"আমার জন্যে কিছু করতে হবে না তোমাকে।" ও'বেনিয়ন বলেন।

"না। আমাকে কিছু করতেই হবে।" শিউ-লান আবার বলে।

"তুমি এবার দয়া করে এখান থেকে বিদায় হও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।" ও'বেনিয়ন দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বন্ধ করেন। শিউ-লান কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দরজার দিকে পা বাড়ায়। দরজার সামনে গিয়ে আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

"কিন্তু আমাকে আপনার যদি দরকার হয়?" মৃদুস্বরে বলে উঠে সে।

ফাদার ও'বেনিয়ন তার দিকে তাকাল না।

"তুমি যাও। এখনই চলে যাও এখান থেকে।" তিনি বলেন।

দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পান তিনি।

"শয়তান, এবার তুমি আমার কাছে হেরে গেছো।" মৃদু স্বরে বলেন তিনি,—"আমি ওকে বিদেয় করে দিয়েছি। তুমি এতে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছো। হ্যাঁ। আমাকে তুমি জয় করতে পারোনি। পারবেও না কোনোদিন।"

আবার তিনি বইখানা পড়তে থাকেন। প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি শব্দ জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়তে থাকেন তিনি। কিছুক্ষণ পড়বার পর আবার তিনি দরজার দিক থেকে একটা শব্দ শুনতে পান। আবার কি ও ফিরে এলো নাকি! হয়তো তাই।

"হায় ভগবান!" ফাদার মনে মনে বললেন—"আবার আমি ওর কথা চিন্তা করছি। এ রকম চলতে থাকলে কিভাবে আমি নিজেকে রক্ষা করবো?"

বইখানা টেবিলের ওপরে রেখে বালিশে মাথা দিয়ে তিনি ঘুমিয়ে থাকার ভান করেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাত বাড়িয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়। টেবিল থেকে হাতটা টেনে আনবার সময় তাঁর হাতটা ঘণ্টার ওপরে পড়ে। ঘণ্টাটা নিচে পড়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলার শব্দ পান তিনি। শিউ-লান ঘরে ঢোকে।

"এবার আমি ঠিকই ঘণ্টার শব্দ শুনেছি।" শিউ-লান বলে।

"আমি বাজাইনি।" ও'বেনিয়ন বলেন—"ঘণ্টাটা আমার হাতে লেগে টেবিল থেকে পড়ে গিয়েছে।"

দেশলাইটা খুঁজে বের করে আবার তিনি মোমবাতিটা জ্বাললেন। আলো জ্বলতেই শিউ-লানকে দেখতে পেলেন তিনি। সে তখন মৃদু মৃদু হাসছিলো।

"আপনি মিথ্যে কথা বলছেন," শিউ-লান মিষ্টি সুরে বলে,—"আপনি ঘণ্টা বাজিয়ে আমাকে ডেকেছেন।"

"না, আমি ঘণ্টা বাজাই নি।" ও'বেনিয়ন বেশ জোর দিয়ে বললেন—"ওটা পড়ে গিয়ে শব্দ হয়েছিলো।"

"কিন্তু নিচে তো ওটা নেই। মেঝের ওপরে কোনো ঘণ্টা আমি দেখতে পাচ্ছিনে।" শিউ-লান বললে।

"ওটা তাহলে চৌকির নিচে ঢুকে গেছে।"

ও'বেনিয়ন বিছানা থেকে উঠে শিউ-লানকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারতেন। ওকে স্পর্শ করতে সাহস হয়নি তাঁর। তিনি ওকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ধর্মীয়-জীবনের শেষ হবে। সুতরাং তিনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকা দরকার।

"আমি ওটাকে খুঁজে বের করছি।" শিউ-লান বললে।

কথাটা বলেই সে নিচু হয়ে চৌকির নিচে ঢুকে পড়লো। ঠিক

এই সময়ই মনসিনর ফিজগিবন এসে দরজায় করাঘাত করলেন। তিনি ঠিক এই সময় ওখানে এসে হাজির হলেন কেন তা একমাত্র ভগবানই জানেন। হয়তো একা থাকতে কষ্ট হচ্ছিলো বলেই তিনি ও'বেনিয়নকে ডাকতে এসেছেন। কিংবা ও'বেনিয়ন কি করছেন তা দেখবার উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন। যে কারণেই হোক, তিনি ওখানে এসে দরজায় করাঘাত করে ও'বেনিয়নকে ডাকলেন।

"ও'বেনিয়ন!" মনসিনর বললেন—"তুমি কি জেগে আছো?"

মনসিনরের কথার আওয়াজ পেয়ে শিউ-লান ভীষণ ঘাবড়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি চৌকির নিচে ঢুকে ও'বেনিয়নের কম্বলটা পর্দার মতো টেনে দিলো।

ফাদার ও'বেনিয়ন তড়াক্ করে উঠে বসলেন চৌকির ওপর। পা দুটি মেঝের ওপর নামিয়ে দিলেন তিনি। মনসিনর যাতে শিউ-লানকে দেখতে না পান তার জন্যেই এতটা সতর্কতা।

মনসিনর কোনো কিছু লক্ষ্য না করে ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন—"শোনো, ও'বেনিয়ন, আমি সেন্ট টমাসের জীবনী থেকে কিছু অংশ শুনতে চাই। ওর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের অনেক মিল আছে। আশা করি তুমিও এতে শান্তি পাবে।

"ঠিকই বলেছেন, স্যার। আমিও এখন শান্তি চাই।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

মনসিনর একখানা বই তুলে দিলেন ও'বেনিয়নের হাতে। তারপর তিনি টেবিলের পাশের একটা বাঁশের মোড়ার ওপরে বসলেন।

"জোরে জোরে পড়ো," মনসিনর বললেন,—"আমি চোখ বুজে শুনছি।"

দুই হাঁটুর ওপরে হাত দুটি রেখে চোখ বুজলেন তিনি। ফাদার ও'বেনিয়ন পড়তে শুরু করলেন।

এবং প্রভু সেন্ট টমাসকে বললেন, "তোমাকে যেখানে পাঠাতে চাই সেখানেই তুমি যাবে কি?"

"হ্যাঁ প্রভু, আমি নিশ্চয়ই যাবো। আমাকে যেখানে পাঠাবেন, সেখানেই আমি যাবো। শুধু ভারতবর্ষে যাবো না।"

"এর উত্তরে প্রভু বললেন, 'আমি তোমাকে ভারতবর্ষেই পাঠাতে চাই। ভারতবর্ষেই তোমাকে যেতে হবে। ওখানে গিয়ে কাজ করতে হবে তোমাকে।"

"কঠিন নির্দেশ।" মনসিনর চোখ খুলে বললেন,—"আমাদেরও ঠিক একইভাবে চীনে পাঠানো হয়েছে। এখানেই হবে আমাদের কাজের বিচার।"

এই সময় চৌকির নিচে একটা কিছু দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

"চৌকির নিচে কে লুকিয়ে আছে বলো তো?" মনসিনর আদেশের সুরে বললেন।

ফাদার ও'বেনিয়ন ঘাবড়ে গেলেন তাঁর কথা শুনে। "আপনি কি কিছু দেখেছেন নাকি ওখানে?" আমতা আমতা করে তিনি বললেন।

মনসিনর মাথা নিচু করে চৌকির নিচে তাকালেন। "আমি একটা পা দেখতে পাচ্ছি। মেয়ের পা। একি ব্যাপার!" মনসিনর চিৎকার করে বললেন।

"আমি শপথ করে বলছি—" ফাদার ও'বেনিয়ন বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই শিউ-লান বেরিয়ে এলো খাটের নিচে থেকে। তার হাতে একটা ঘণ্টা। যেন কিছুই হয়নি এইভাবে সে বললে—"এই দেখুন সেই ঘণ্টাটি। ওটা চৌকির নিচে পড়েছিলো।"

ঘণ্টাটি টেবিলের ওপরে রেখে দিলো সে। তারপর সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে জামা থেকে ধূলো ঝাড়তে লাগলো। "চৌকির নিচে রাজ্যের ধূলো জমে আছে। আমি ওগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি।" শিউ-লান বললে—"আমার মনে হয় বহুদিন ওখানে ঝাঁট পড়েনি। এখন আর এসব আবর্জনা আমি রাখবো না। আমি যখন এসেছি, তখন বাড়ি-ঘর সব সময় পরিষ্কার রাখবো। এটা আপনারা দেখে নেবেন।"

তার কথায় কান না দিয়ে মনসিনর রুদ্র দৃষ্টিতে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকালেন—"তোমার বক্তব্য আমি শুনতে চাই, ও'বেনিয়ন। ও এখানে কেন এসেছে?"

ও'বেনিয়ন কিছু বলবার আগেই শিউ-লান বললে—"আমি ঘন্টার শব্দ শুনতে পেয়ে এখানে এসেছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো, ফাদার হয়তো কোনো কিছুর প্রয়োজনে আমাকে ডেকেছেন। আসলে কিন্তু উনি আমাকে ডাকেন নি। মোমবাতিটা জ্বালতে গিয়ে ওঁর হাত লেগে ঘণ্টাটা নিচে পড়ে গিয়েছিলো। ওটা গড়িয়ে চৌকির নিচে চলে গিয়েছিলো।"

মনসিনর গর্জে উঠলেন—"তুমি এখনই এখান থেকে বের হয়ে যাও।"

"কিন্তু স্যার, এখন যে আপনাদের জন্যে ভাত রান্না করবার সময়।" শিউ-লান বললে—"আমাকে এখনই ভাত রাঁধতে হবে, নইলে আপনাদের অনাহারে থাকতে হবে।"

এই কথা বলেই সে বসন্তের হাওয়ায় উড়ে যাওয়া ফুলের পাপড়ির মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনসিনর উঠে দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর সর্বশরীর তখন কাঁপছে।

"হাঁটু গেড়ে বসো।" তিনি আদেশ করলেন,—"এখনই হাঁটু গেড়ে বসো। ভগবানের কাছে তোমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। রাতের বেলায় দরজা সব সময় তালা দিয়ে রাখবে। আগামীকাল

সকালে আমার সঙ্গে বাগানে দেখা করবে। সকাল ঠিক সাতটার সময়। কোনো কিছু খাওয়ার আগে। আমরা তখন পরিস্থিতিটা আলোচনা করবো। এখন আমি কিছু বলতে চাইনে; কারণ আমি এখন রেগে গেছি।"

"কিন্তু স্যার," ফাদার ও'বেনিয়ন সওয়াল করতে চেষ্টা করলেন,—"আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ! আমি—"

"আর কোনো কথা নয়।" মনসিনর বললেন—"তোমার চোখ বলছে, তুমি দোষী।"

এই কথা বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন বাইরে থেকে। ও'বেনিয়ন ধীরে ধীরে দরজার কাছে এগিয়ে এসে তালা চাবি লাগিয়ে দিলেন দরজায়। এর পর তিনি বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে চেষ্টা করলেন। ঘুমে তাঁর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছিলো। তিনি তাই শয্যায় শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ সাত ॥

পরদিন সকাল ঠিক সাতটায় ফাদার ও'বেনিয়ন বাগানে এসে হাজির হলেন। তখনও তার মনের মধ্যে চলছে বিরাট দ্বন্দ্ব। দুটি বিপরীত শক্তি তার মনের মধ্যে যুদ্ধ করছে। একটি হলো পুরোহিতের, অপরটি হলো মানবিক সত্তা। যুদ্ধ তখনও চলছে। কোনো পক্ষ জয়ী হতে পারেনি। এই রকম মানসিক অবস্থা নিয়েই তিনি বাগানে এসে বসেছেন। মনসিনর ফিজগিবনের কথাগুলো তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। তাঁর পুরোহিত সত্তা বলছে, তুমি পাপ করেছো। তোমাকে তার জন্যে অনুশোচনা করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানবিক সত্ত্বা প্রতিবাদ করে উঠছে—'না, তুমি কোনো পাপ করোনি। শিউ-লানকে তুমি ডেকে আনোনি। সে এসেছিলো নিজের ইচ্ছায়। হয়তো সে তোমাকে ভালোবাসে তাই সে তোমার কাছে এসেছিলো। এতে তোমার দোষ কোথায়?' কিন্তু সত্যিই কি তাই? আবার তাঁর পুরোহিত সত্ত্বা বলে—'সত্যিই কি তোমার মনে কোনো পাপ-চিন্তা আসেনি। মেয়েটি তোমার কাছে আসে ঠিকই, কিন্তু তুমি কি তাকে আস্কারা দাওনি? একজন পুরোহিতের পক্ষে নারী-সঙ্গ-লিপ্সা কি পাপ নয়?'

এমনি মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়েই তিনি ঘুম থেকে উঠেছিলেন। তারপর ভগবানকে স্মরণ করে বেসিনের কাছে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়েছিলেন এবং রাতের জামা ছেড়ে নীল চাইনিজ লিনেনের পরিষ্কার জামা পরেছিলেন। জামা পরে ঘরের দরজাটা খুলতেই প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস তাঁর গায়ে লাগে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাগানে এসে পাথরের বেঞ্চিতে বসেন। রাতে কখন বৃষ্টি হয়েছিলো, বেঞ্চিটা তখনও ভিজে, মাটিও ভিজে।

একটু পরেই মনসিনর এসে হাজির হলেন ওখানে। তাঁকে দেখেই ফাদার ও'বেনিয়ন উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আজ পরিপূর্ণ ধর্মযাজক-বেশে এসেছেন। বুকের ওপরে একটি রূপোর ক্রশ চক্‌চক্ করছে। এছাড়া আরও একটি জিনিস তাঁর হাতে ছিলো। সেটি হলো ছোটো একটি বেতের লাঠি। মনসিনর যখন নিম্নপদস্থ ধর্মযাজকদের সামনে আসেন তখনই শুধু ওই বেতের লাঠিটা হাতে নিয়ে আসেন। বেতের লাঠিটা দেখে ফাদার ও'বেনিয়ন বুঝতে পারেন যে, আজ তাঁর আর মনসিনরের সম্পর্ক হলো উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে নিম্নপদস্থ অফিসারের সম্পর্কের মতো। মনসিনর আজ এসেছেন নিম্নপদস্থ একজন পাপী পুরোহিতের বিচার করতে। মনসিনরের দৃঢ় বিশ্বাস, ফাদার ও'বেনিয়ন পাপ করেছেন।

ও'বেনিয়নের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি মেয়ে কখনও তার ঘরে ঢুকতে পারতো না এবং ঘরে ঢুকে তার চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকতে পারতো না।

"ও'বেনিয়ন ?" মনসিনর গম্ভীরভাবে বললেন।

"গুড্ মর্ণিং, স্যার।" ও'বেনিয়ন উত্তর দিলেন।

"আমরা এখনই আলোচনা শুরু করবো।" মনসিনর বললেন,—"তুমি এসো, চলতে চলতে কথা হবে আমাদের।"

দুজনে পাশাপাশি চলতে লাগলেন। ফাদার ও'বেনিয়নের মুখে কোনো কথা নেই। তিনি উৎকর্ণ হয়ে আছেন মনসিনরের কথা শুনবার জন্যে। আকাশ পরিষ্কার থাকায় সূর্যের কিরণ এসে ছড়িয়ে পড়েছে বাগানের মধ্যে।

"প্রথমেই আমি বলতে চাই," মনসিনর শুরু করলেন,—"তুমি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করো না যে মেয়েটা তোমার অগোচরে এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার চৌকির তলায় ঢুকেছিলো।"

ফাদার ও'বেনিয়নের মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মনসিনরের ভূমিকা শুনেই তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি আগে থেকেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে রেখেছেন। তিনি তাই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হন। মনসিনর যাই বলুন এবং যাই করুক-এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ, মেয়েটিকে তিনি ডেকে আনেননি, ও যদি মনে মনে তাঁকে ভালোবেসে থাকে তাহলে তিনি কি করতে পারেন? একজন পুরোহিতকে ভালোবেসে ও হয়তো ভাল করছে। কি ধর্মে বলছে, এখন ভালোবাসবে না, কি কাউকে ভালবাসবে'। তিনি যদি তাই পাপীপিষ্ট মনকে ভালোবেসেই থাকেন সেটা কখনও দোষের ব্যাপার হতে পারে না। এইভাবে নিজের মনকে প্রস্তুত করলেন ফাদার ও'বেনিয়ন।

"আমি আপনাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করছিনে, "ফাদার"

ও'বেনিয়ন মৃদু স্বরে বললেন—"তবে এ কথা সত্যি যে আমার ইচ্ছায় সে চৌকির নিচে ঢোকে নি।"

তার এই কণ্ঠস্বর শুনে মনসিনর রেগে গেলেন। হাতের বেত-খানাকে একটা পাথরের ওপর ঠুকলেন তিনি। "আমার প্রশ্ন হলো, কেন সে ওখানে ঢুকেছিল?" মনসিনর গম্ভীর স্বরে বললেন "সে ওখানে ছিলো, এটা কি সত্যি নয়?"

হ্যাঁ, সে ওখানে ছিলো।—ফাদার ওবেনিয়ন স্বীকার করেন,—"কি সে বলেছিলো—"

মনসিনর তাঁকে বাধা দিলেন। "আমি কি এতই বেকুব যে, মেয়েটার আবোল তাবোল কথা আমি বিশ্বাস করবো? ওখানে থাকার কোন কারণ তার ছিল না। একথা তুমি স্বীকার করো নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ এটা আমি স্বীকার করি, ফাদার" ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু বিশ্বাস করুন। এটা আমি চাইনি। ওকে চৌকির নিচে ঢুকতে দেখে আমি রেগে গিয়েছিলাম।"

"ও তুমি রেগে গিয়েছিলে বুঝি?" মনসিনর শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বললেন,—"কিন্তু ও তোমার ঘরে এলো কেমন করে?"

ফাদার ও'বেনিয়ন ঘটনাটা স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিউ-লান ঠিক কখন ঘরে ঢুকেছিলো, সে কথা তিনি স্মরণ করতে পারছেন না। তিনি তাঁর ভ্রূরুর ওপরে আঙ্গুল দিয়ে কিছুটা মনসিনরের দিকে তাকালেন।

"ভগবান আমাকে সাহায্য করুন," তিনি অসহায় ভাবে বললেন—"ও ঘরে ঢুকেছিলো ঠিকই, কিন্তু কখন ঢুকেছিলো তা আমি স্মরণ করতে পারছিনে। ঘরের দরজাটা খোলা ছিলো কিনা তাও ঠিক মনে করতে পারছিনে।"

মনসিনর ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকালেন। "ধর্মযাজক

হওয়া তোমার উচিত হয়নি।" তিনি বললেন,—"তোমার উচিত ছিলো সংসারী হওয়া। ধর্মযাজকের পবিত্র জীবন তোমার জন্যে নয়।"

"আমার কথা আপনি শুনেছেন কি ?" ফাদার ও'বেনিয়ন বলল।

"না। তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে।" মনসিনর বললেন, "এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই, এবং এ থেকে সিদ্ধান্ত নিতেও কোনো অসুবিধা নেই। তোমার উচিত এখনই ধর্মযাজকের পবিত্র কলার খুলে ফেলে যাজকত্ব পরিত্যাগ করা।"

ফাদার ও'বেনিয়ন আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলেন না। কলার খুলে ফেলা মানেই অসম্মানিত হয়ে এখান থেকে বেড়িয়ে যাওয়া। তাহলে তাঁর অবস্থা কিরকম হয়, এই বিপজ্জনক দেশে কোথায় তার স্থান হবে ? সাধারণ মানুষ হতে তিনি চান না।

ইডেন গার্ডেনের আদমের মতো তিনিও ভগবানের কাছে তাঁর কৈফিয়ৎ দেবার কথা ভাবছেন।

মনসিনরের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন,—"আপনি তো জানেন স্যার, যে দুষ্টা স্ত্রীলোকেরা মাঝে মাঝে ধার্মিক ব্যক্তিদের ধর্ম পথ থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করে। আমার বিশ্বাস, আপনি এটা ভালো করেই জানেন।"

মনসিনর কিন্তু নরম হন না। তাঁর মুখের ভাব আরও কঠিন হয়ে ওঠে।

"দুষ্টা স্ত্রীলোকেরা এরকম কাজ করে তা আমি জানি।" মনসিনর বললেন,—"কিন্তু আমাদের উচিত তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আমরা সংসারী মানুষ নই, আমরা সব সময় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলি।"

"আমি ওকে একথা বলেছিলাম," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু আমার কথা ও হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলো।"

"তার মানে, সে তোমার মনের গোপন কামনার কথা বুঝতে পেরেছিলো।" মনসিনর বললেন,—"তোমার চাল-চলনে এবং কথাবার্তায় সে এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলো যাতে সে বুঝতে পেরেছিলো যে, তোমার মনে কামনা রয়েছে। মেয়েরা পুরুষদের মনের কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে।"

"আপনি একথা বলতে পারেন," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু আমি তো আমাকে জানি। আমি জানি, একথা ঠিক নয়।"

"আমার এ সম্বন্ধে কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই," মনসিনর বললেন,—"আমি এই রকমই শুনেছি। আমি ভাবছি, মেয়েটিকে আমি কোনো দূর অঞ্চলে পাঠিয়ে দেবো। এখানে ওর থাকা কিছুতেই চলতে পারে না।"

"কিন্তু স্যার, রান্নার জন্যে আমাদের একজন লোক তো চাই," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আপনি নিজেই তো বলেছেন যে, ও কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

"হ্যাঁ, তোমার দ্বারা রান্নার কাজ চলবে না।" মনসিনর বললেন,—"কিন্তু তাই বলে ওকে রাখাও ঠিক হবে বলে মনে হয় না।"

রান্নার কথায় মনসিনর একটু নরম হয়েছেন বুঝতে পারেন ও'বেনিয়ন। তাঁর মনে হয়, এই অস্ত্রেই মনসিনরকে তিনি ঘায়েল করতে পারবেন। তিনি ভালো করেই জানেন যে, এখন শত চেষ্টা করলেও রান্নার লোক বা ঘরের কাজ করবার চাকর সংগ্রহ করা যাবে না। লাল জুজুর ভয়ে কেউ আর এখন এখানে আসতে চাইবে না। আগে যে সব কনভার্ট আসতো তারাও এখন আসে না। সুতরাং রান্নার কাজের জন্যেই শিউ-লানকে এখানে রাখা দরকার। যে কারণেই হোক না কেন, শত বিপদ অগ্রাহ্য করে নিজের ইচ্ছায় ও এখানে এসেছে এবং রান্না করে তাঁদের খাওয়াচ্ছে।

ও'বেনিয়ন তাই ধীরে ধীরে তাঁর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে শুরু করেন।

"আমার ওপরে আপনি অকারণেই রেগে গেছেন স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আপনি ধীরভাবে চিন্তা করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, ওই মেয়েটার ওপরে আমার কোনো দুর্বলতা নেই। আমার যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তা হলো, ওকে আমি দীক্ষা দিতে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ, এখনও আমি ওকে পবিত্র খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে চাই। আমার মনে হয়, প্রতিনিয়ত সদুপদেশ দিলে ওর মনের কালিমা ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাবে। ধরে নিচ্ছি, ও পাপী, কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আমাদের ওপরে পবিত্র নির্দেশ আছে যে, পাপকে আমরা ঘৃণা করবো, কিন্তু পাপীকে ভালোবাসবো।"

"ধর্মীয় অনুশাসনে এই কথাই আছে বটে," মনসিনর বললেন,—"কিন্তু তা বলে এর সুযোগ নেওয়া ঠিক নয়। পাপীকে ভালোবাসা আর একটি সুন্দরী তরুণীকে ভালোবাসা কখনও এক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। ওটা হবে 'ভালোবাসা' কথাটার কদর্থ। 'ধর্মের জন্যে পাপীকে ভালোবাসা'র মানে হলো পাপীকে ঘৃণা না করা। এই 'ঘৃণা না করা', আর কোনো নারীকে ভালোবাসা কখনও এক পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও এই দুটো ব্যাপারকে তুমি গুলিয়ে ফেলছো।"

"এবার আমি বুঝতে পেরেছি, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

মনসিনরের কথায় ও'বেনিয়নের মনটা হালকা হয়ে গেল। আসলে শিউ-লানকে তিনি খারাপ চোখে দেখেন নি। শিউ-লানও জানে না যে, তার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি কখনও শিউ-লানকে এমন কথা বলেন নি।

"আমাকে বিশ্বাস করুন, স্যার।" ও'বেনিয়ন বললেন,—"ওই মেয়েটাকে আমি দীক্ষিত করবো এবং দীক্ষা নেবার পর সে ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারবে। আমি মনে করি, এইভাবেই ওকে সত্যের পথে নিয়ে আসা যাবে। ও তখন বুঝতে পারবে যে, আমাকে ভালোবাসা পাপ।"

মনসিনর হঠাৎ দাঁড়িয়ে ও'বেনিয়নের দিকে ফিরে তাকালেন। "তোমার কথায় আমি সায় দিতে পারছিনে," মনসিনর বললেন,—"তোমার মানসিকতা এখনও যে স্তরে আছে, তাতে হয়তো আবার তুমি ভুল করে বসবে। ওই 'পাপকে ঘৃণা করা এবং পাপীকে ভালোবাসা,' কথাটাই তোমার মনে নতুন ভাবে দেখা দেবে।"

"আমি আর ভুল করবো না, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

মনসিনর ও'বেনিয়নের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। "তুমি তাহলে ভুল বুঝতে পেরেছো।"

"হ্যাঁ, স্যার। ধর্মীয় অনুশাসনের প্রকৃত অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবার।" ও'বেনিয়ন বললেন।

"আমি তোমাকে আরও একটা কথা বিশেষভাবে বলতে চাই," মনসিনর বললেন,—"তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, মনের ভেতরে যদি কারো কোনো পাপ চিন্তা স্থান পায় সেটাও পাপ কাজ বলেই গণ্য হয়।"

"আমি আমার মনকে বশে রাখতে সক্ষম, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"মনের ওপর আমার যথেষ্ট আধিপত্য আছে বলেই আমি মনে করি। কিন্তু—"

"কিন্তু মানে? কি বলতে চাইছো তুমি?" মনসিনর জিজ্ঞাসু'তে ও'বেনিয়নের দিকে তাকালেন।

"আমি বলতে চাই, স্বপ্নের ওপরে আমার কোনো আধিপত্য

নেই।" ও'বেনিয়ন বললেন,—"স্বপ্ন নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং স্বপ্নে যদি কিছু দেখে থাকি তার জন্যে কি আমাকে দায়ী হতে হবে?"

"এটা একটা প্রশ্ন বটে।" মনসিনর বললেন,—"ঘুমন্ত অবস্থার জন্যে তুমি দায়ী হবে কিনা, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।"

ফাদার ও'বেনিয়নের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। "যদিও আজ পর্যন্ত কোনো খারাপ স্বপ্ন আমি দেখিনি। সুতরাং ও বিষয়ে এখনই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কোনো কারণ দেখছি নে। আজ পর্যন্ত যে সব স্বপ্ন আমি দেখেছি, তার শেষটা শুভ হয়েছে।"

"তার মানে?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন,—"কি এমন স্বপ্ন তুমি দেখেছো যার উপসংহার শুভ হয়েছে?"

ফাদার ও'বেনিয়ন হেসে উঠলেন।

"যাই দেখি, ও মেয়েটা তার মধ্যে ছিলো না।"

মনসিনর ফিজগিবন কঠিনতা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। "ভাগ্যিস আমি ঠিক সময়ে ওখানে হাজির হয়েছিলাম, নইলে কি যে হতো, বা হতে পারতো, তা একমাত্র ভগবানই জানেন।"

"আপনি যা ভাবছেন তা কিছুই হতো না।" ফাদার ও'বেনিয়ন জোর দিয়ে বলেন,—"আমি ভুলে যাই নি যে, আমি একজন ধর্মযাজক। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে, নিজেকে আমি কখনও মসীলিপ্ত করবো না।"

মনসিনর মুখ তুলে ও'বেনিয়নের দিকে তাকান। এবার তিনি হেসে ফেলেন। ফাদার ও'বেনিয়নও হেসে ওঠেন। দুজনের হাসিই নির্মল। মনসিনরের মন থেকে সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। ও'বেনিয়নও তাঁকে বোঝাতে পেরেছেন বলে নিজেকে হাল্‌কা বোধ করছেন। মনসিনর এবার বিশ্বাস করছেন যে, ও'বেনিয়নের দ্বারা কোনো পাপ কার্য সংঘটিত হবে না। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও তিনি

মনে মনে স্থির করেন যে, শিউ-লানকে কখনও ও'বেনিয়নের ঘরে আসতে দেওয়া হবে না। যদি কখনও সে ঘরে আসে তাহলে ও'বেনিয়নকে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কথাটা ও'বেনিয়নকে জানিয়ে দেন তিনি। "শোনো, ও'বেনিয়ন, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমার অবর্তমানে তোমাকেই হতে হবে এ রেক্টরীর মনসিনর। সুতরাং তুমি এমন কিছু করবে না, যাতে তোমার নিজের এবং এই রেক্টরীর সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়।"

ফাদার ও'বেনিয়ন মাথা নিচু করে বলেন,—"আপনার এই মূল্যবান উপদেশের কথা সব সময় আমার মনে থাকবে, স্যার।"

॥ আট ॥

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে শরৎকাল শুরু হয়েছে। ধর্মযাজকদ্বয় তখনও রেক্টরীতে বন্দী জীবন যাপন করছেন। বন্দী অবস্থায় থাকার দরুন উভয়ের ভেতরের ব্যবধানও ঘুচে গেছে। মনসিনর ফিজগিবন এখন আর উচ্চ পদাধিকারীসুলভ আচরণ করেন না ফাদার ও'বেনিয়নের প্রতি। তবে ও'বেনিয়ন সব সময়ই মনসিনরকে সমীহ করে চলেন। কি জানি কখন তাঁর ক্রোধবহ্নি প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে—এই ভয়েই তিনি সব সময় তটস্থ থাকেন। (ভদ্রলোকের চরিত্রটা প্রায় আমাদের পুরাণের দুর্বাসা মুনির মতো। দুর্বাসা মুনি যেমন যখন-তখন রেগে উঠতেন, অনুবাদক মনসিনর ফিজগিবনও সেইরকম কথায় কথায় যখন-তখন রেগে ওঠেন।—অনুবাদক) তবে ওপরে ওপরে তাঁকে কঠিন ও রুক্ষ মেজাজের মানুষ বলে মনে হলেও আসলে তিনি ঠিক তা নন। তাঁর হৃদয়ে স্নেহ ও করুণাধারা ফল্গু নদীর মতো প্রবাহিত হচ্ছে।

মনসিনর এখন সব সময় নরম সুরে কথা বলেন। তাঁর প্রকৃতির এই পরিবর্তন দেখে ফাদার ও'বেনিয়ন মনে মনে বিস্মিত হন। একদিন কথায় কথায় মনসিনর তাঁর পূর্ব জীবনের কথা প্রকাশ করেন ফাদার ও'বেনিয়নের কাছে। ও'বেনিয়ন ছিলেন এক নিম্নবিত্ত চাষী পরিবারের ছেলে। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে পৈত্রিক ক্ষেত-খামারে। নিজের হাতে ক্ষেতের কাজও করতে হতো তাঁকে। ভালো খানাও তাঁর জুটতো না। প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে খেতে হতো আলুর তরকারি অথবা বাঁধাকফির ঘণ্ট। মাংস খুব কমই রান্না হতো বাড়িতে। মাসে একবারও হতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু মনসিনর ফিজগিবন জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রাসাদে। যে পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, আয়ার্ল্যাণ্ডে সে পরিবার যথেষ্ট বিখ্যাত। এক সময় ওঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন রাজা। সেই সুবাদে ওঁকে রাজবংশোদ্ভব বলা যায়। মনসিনর যদি তাঁর নিজের দেশে, অর্থাৎ আয়ার্ল্যাণ্ডে থাকতেন তাহলে তিনি হয়তো তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁদের বংশের সম্মানীয় খেতাব ব্যবহার করতে পারতেন। মনসিনরের মুখ থেকে এই কথা শুনবার পর ফাদার ও'বেনিয়ন তাঁকে আরও বেশী শ্রদ্ধা করতে থাকেন। মনসিনর কিন্তু ও'বেনিয়নকে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতোই স্নেহ করেন। বন্দী দশায় এই স্নেহের মাত্রাটা আরও বেড়েছে। শিউ-লান এখনও রেক্টরীতে কাজ করছে। নিয়মিতভাবেই সে রান্না এবং গৃহস্থালীর কাজ করে চলেছে। তবে তার সম্বন্ধে মনসিনরের মনোভাব এখনও ঠিক আগের মতোই রয়েছে। ও'বেনিয়নও এটা বোঝেন। তিনি তাই কখনও ওর সঙ্গে একা দেখা করেন না। ও যখন রান্না ঘরে থাকে তখন ফাদার ও'বেনিয়ন সেখানে যান না। টেবিলে ও যখন খাবার দিতে আসে তখন ওর হাত যাতে তাঁর হাতকে স্পর্শ না করে সে দিকেও তিনি বিশেষভাবে সাবধান হয়ে থাকেন।

শিউ-লান হয়তো মনে দুঃখ পায় ফাদার ও'বেনিয়নের এই রকম মনোভাব দেখে। কিন্তু ও'বেনিয়ন এমন কোনো কাজ করেন না, অথবা এমন কোনো মনোভাব প্রদর্শন করেন না, যার ফলে ও আস্কারা পেতে পারে। ভোর হতে না হতেই শিউ-লান রেক্টরীতে চলে আসে এবং রাত আটটায় বন্দীদ্বয়কে রাতের খাবার দিয়ে তারপর রান্নাঘর পরিষ্কার করে চলে যায়। এর ফলে বাড়িটা এখন সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। তবে এখনও সে নিয়মিতভাবে একটি কাজ করে যাচ্ছে। রেক্টরী হতে চলে যাবার আগে প্রতি রাতে একগুচ্ছ ফুল ফাদার ও'বেনিয়নের শোবার ঘরের টেবিলের ওপরের ফুলদানিতে রেখে যায়। এর ফলে প্রথম দিকে ও'বেনিয়ন বিচলিত বোধ করতেন। তাঁর মনে হতো যে, ওভাবে ফুল দিয়ে যেতে তিনি নিষেধ করবেন শিউ-লানকে। কিন্তু তা তিনি করেন নি। ও মনে দুঃখ পাবে বলেই ওকে কিছু বলেন নি। এখন এটা ওঁর গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে মনসিনর পাছে কোনোদিন তাঁর ঘরে এসে ফুলগুলো দেখতে পান, এই ভয়ে তিনি ফুলদানিটাকে চৌকির নিচে লুকিয়ে রেখে দেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, এটাও এক ধরনের পাপ। তাঁর মনে এখনও শিউ-লানের প্রতি দুর্বলতা রয়ে গেছে। তা না হলে কেন তিনি ওকে ফুল রাখতে নিষেধ করেন না!

আগেই বলেছি, মনসিনরকে তিনি এখন আগের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করেন। তিনি এখন সব সময় ওঁর সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখেন। এখন আর চ্যাপেলে প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় না। এ ব্যাপারে শিউ-লানই ওঁদের সাবধান করে দিয়েছিলো। এক রবিবারের সকালে মনসিনর যখন সভার কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন, সেই সময় শিউ-লান ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে বলে যে, চ্যাপেলে যাতে প্রার্থনা-সভা না হয় তার জন্যে হো-সান তার সৈনিকদের প্রতি আদেশ জারী করেছে। সে বলেছে যে, প্রার্থনা-সভায় যারা

আসবে তাদের সবাইকে বন্দী করে রাখতে হবে। শিউ-লান আরও বলে যে, সৈন্যদল কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে উপস্থিত হবে। তার মুখ থেকে ওই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই সভায় উপস্থিত নরনারীরা ভীত হয়ে মনসিনরের মুখের দিকে তাকায়। মনসিনর তখনই তাদের ওখান থেকে চলে যেতে বলেন। তিনি ওদের বলেন যে, ওরা যেন আর কোনোদিন চ্যাপেলে না আসে। তিনি আরও বলেন যে, ভগবান সর্বত্রই বিরাজিত আছেন। সুতরাং ওরা যেন ওদের বাড়িতেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। মনসিনরের কথা শুনে সবাই ওখান থেকে চলে যায়। ওখানে তখন মনসিনর, ফাদার ও'বেনিয়ন এবং শিউ-লান ছাড়া আর কেউ রইলো না।

শিউ-লান মনসিনরের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেতো। সে তাই ফাদার ও'বেনিয়নের কাছে গিয়ে বলেছিলো,—"কনভার্টদের ওপরে যাতে কোনো রকম অত্যাচার না হয় তা আমাদের দেখতে হবে। আমরা তাদের মঙ্গল চাই, তাদের মৃত্যু চাইনে।"

"শিউ-লান ঠিক কথাই বলছে, মনসিনর।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"ওদের আমরা জল্লাদদের হাতে শিকার হতে দিতে পারিনে।"

মনসিনর কোনো কথা না বলে চ্যাপেল হতে চলে যান। প্রার্থনা-সভা না করতে পেরে তাঁর মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছিলো। কোনো দেশের সরকারই দেশের লোকেদের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করে না। মনসিনর মনে মনে ভাবতে থাকেন,—'রাশিয়াতেও তো শুনেছি চার্চের কাজে সরকার হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু এখানে দেখছি আলাদা ব্যবস্থা। কমিউনিষ্টরা শুনেছি ধর্ম মানে না। কিন্তু তাই বলে ধর্ম-বিশ্বাসীদের ওপরে সৈন্য লেলিয়ে দেওয়া! একি অত্যাচার!' মনে মনে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেন তিনি। ফাদার ও'বেনিয়ন তাঁকে অনুসরণ করেন। যেতে যেতে পেছনে

একবার ফিরে তাকান তিনি। দেখতে পান, শিউ-লান একাই দাঁড়িয়ে আছে বেদীর পাশে। সে হয়তো ভেবেছিলো ও'বেনিয়ন তার দিকে একবার ফিরে তাকাবেন। তিনি ফিরে তাকাতে ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ও তখন আর দেরী না করে বেরিয়ে যায় চ্যাপেল হতে।

প্রার্থনা-সভা না করতে পেয়ে মনসিনর ফিজগিবনের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তিনি একবারে মুষড়ে পড়েন। এই ব্যাপারেও শিউ-লান এগিয়ে আসে সাহায্য করতে। মনসিনরকে শুনিয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন বলে, "কনভার্টরা চ্যাপেল আসতে না পারলেও আর এক জায়গায় তারা সমবেত হতে পারে। শহরের পশ্চিমদিকে যে ধানক্ষেত আছে সেখানে ওরা জমায়েত হতে পারে। ওখানে এসে হাঁটু গেড়ে বসলে বাইরে থেকে কেউ তাদের দেখতে পাবে না।" সে আরও বলে যে এ বিষয়ে কনভার্টদের সঙ্গে সে আলোচনাও করেছে। সবাই রাজী হয়েছে ওখানে আসতে।

মনসিনরের মনটা কিন্তু এ ব্যাপারে সায় দেয় না। চোরের মতো লুকিয়ে ধানক্ষেতে গিয়ে প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠিত করতে তাঁর ইচ্ছে হয় না। কিন্তু এই পরিকল্পনাটাকে তিনি বাধাও দেন না। তিনি চুপ করে থেকে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থায় তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। মনটাকে প্রস্তুতও করছিলেন আগামী রবিবারের প্রার্থনা-সভার জন্যে। কিন্তু শনিবার সকাল থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘ কাল যাবৎ তিনিই প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করে এসেছেন। ধানক্ষেতের সভাও তারই পরিচালনা করবার কথা। বিশ্বাসী কনভার্টরা ওখানে সমবেত হয়ে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নেবে। শিউ-লানকে তারা জানিয়ে দিয়েছে যে, সূর্য ওঠার সাথে সাথে তারা ওখানে সমবেত হবে।

মনসিনরের আশীর্বাদ না পেয়ে তারা শান্তি পাচ্ছিলো না। শিউ-লানের মারফৎ তারা খবর পাঠিয়েছে যে, রবিবার ভোরে তারা

শহরের পশ্চিম দিকের বৌদ্ধ মন্দিরের পেছনের ধানক্ষেতে সমবেত হবে মনসিনরের উপদেশ শুনতে এবং তাঁর আশীর্বাদ নিতে।

"উঁচু টিলাটার পেছনে থাকায় আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।" ফাদার ও'বেনিয়নকে শিউ-লান বলেছিলো। "বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের ভয় করবার কারণ নেই, ওঁরা সতর্কভাবে চারিদিকে নজর রাখবেন বলে কথা দিয়েছেন। ওঁরা বলছেন ভগবানকে যারা বিশ্বাস করে তাদের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, তারা সবাই ধর্মভাই এবং ধর্মবোন।"

সে রাতে শিউ-লান বাইরে থেকে ওঁদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছিলো। খাবারগুলো তাকে ভেতরে আনতে হয়েছিলো চোরা পথে। এ ব্যাপারে দরোয়ান তাকে সাহায্য করেছিলো। বহুদিন এ রকম সুখাদ্য ওঁরা খেতে পাননি। শিউ-লান যখন খাবারগুলো ওঁদের সামনে টেবিলে সাজিয়ে দিচ্ছিলো তখন ওঁরা রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। এটা হলো শুক্রবার রাত্রের কথা।

খাবারগুলো কিভাবে আনা হলো সে কথা ওঁরা শিউ-লানকে জিজ্ঞাসা করেন নি। ওঁরা অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী (They believed in miracles)। শিউ-লানকে তাঁরা দেবদূত (angel) হিসেবে গ্রহন করেন। মনসিনর মনে মনে স্বীকার করেন যে, মেয়েটি লাখো মেয়ের মধ্যে একজন বিশেষ মেয়ে। ওর প্রতি একটা পিতৃসুলক স্নেহ আর মমতা দেখা দেয় মনসিনরের মনে। ও'বেনিয়নের প্রতি তাঁর মন এখন অনেকটা নরম। শিউ-লান সম্পর্কেও তাঁর মনে আর তেমন কোনো সন্দেহ নেই। না থাকারই কথা, কারণ, শিউ-লান ইচ্ছে করলেই বাইরে সুখী জীবন যাপন করতে পারতো। সুন্দর চেহারার অধিকারিনী বলে যে কোনো যুবা পুরুষকে সে নিশ্চয়ই বিয়ে করতে পারতো।

ওর যা চেহারা, তাতে অনেক যুবকই ওকে জীবন সঙ্গিনী করতে

রাজী হতো। কিন্তু নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করে ও স্বেচ্ছায় এই বিপদসংকুল বন্দীশালায় এসে তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করে চলছে। ও যদি ওঁদের সাহায্য না করতো তাহলে না খেয়েই মরতে হতো ওঁদের।

মনসিনর তাই ও'বেনিয়নকে বলেন—"নিজের চিন্তাকে যদি তুমি পবিত্র রাখো তাহলেই শয়তান তোমার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। শিউ-লানের চিন্তা করতে পারবে না। শিউ-লানের চিন্তা যখনই তোমার মনে আসবে তখনই তুমি মেরী মাতার কথা চিন্তা করবে। মেরী মাতাই ওকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।"

ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন—"আপনার উপদেশ মতোই কাজ করবো আমি।"

শনিবার সকাল থেকেই মনসিনরের পেটের অসুখ দেখা দেয়। ফাদার ও'বেনিয়ন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন,—"গতরাত্রের খাবারগুলো খেয়ে তোমার অসুখ করেনি তো?"

"না" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন—"আমার শরীর বেশ ভালই আছে।"

"আমি কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়েছি।" মনসিনর বললেন, "লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আমার আমাশয় হবে। অনেক দিন বাইরের খাবার খাইনি, তাই ওই সব মশলাদার খাবার খেয়ে হজম করতে পারিনি।"

"এখন তাহলে কি করতে চান?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করলেন—"ঔষধ-পত্র দরকার হবে কি?"

"দরকার হলে খাওয়া যাবে," মনসিনর বললেন—"দেখা যাক আজকের দিনটা উপোস করে থাকলে কি অবস্থা দাঁড়ায়। আমার মনে হয়, আজকের দিনটা উপোস করে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মনসিনরের আশা কিন্তু ফলবতী হলো না। রবিবার সকালে তিনি একেবারে উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়লেন। একজন ডাক্তারকে যে কল দিয়ে আনানো হবে তারও উপায় নেই। সেন্ট্রিকে বললে কিছুই হবে না। কর্নেল হো-সানের হুকুম ছাড়া সে কিছুই করবে না। এতদিনে বন্দীদশার জ্বালা যে কি, তা বুঝতে পারলেন মনসিনর। তাঁর মানসিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছে এখন। বন্দী অবস্থায় না থাকলে, অসুস্থ শরীরেও তিনি ধানক্ষেতে গিয়ে প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু পাঁচিল ডিঙিয়ে শহরের প্রান্তে যাওয়া তার পক্ষে এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব। মুক্ত থাকলে তিনি যখন খুশি-যে কোনো কনভার্টের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন এবং অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু আজ তিনি নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতে পারছেন না।

ফাদার ও'বেনিয়ন যখন তাঁর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন, তখন তিনি অসহায়ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,—"আমি বিছানা থেকে উঠতে পারছিনে।''

"তাই নাকি!" বিস্মিত কণ্ঠে ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"আমি পা নাড়তে পারছি নে।" মনসিনর বললেন,—"পেটের অসুখের জন্যই এটা হয়েছে। আমার মনে হয়, মসলাদার খাবার খেয়ে এটা হয়েছে। তোমার কোনো অসুখ হয়নি তো?"

''না, আমি ভালই আছি।'' ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"তাহলে বোধ হয় আমি আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছি।" মনমিনর বললেন—"আজকের প্রার্থনা সভা তোমাকেই পরিচালনা করতে হবে।"

"আমি একা কখনও প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করিনি, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বল্লেন,—"আমার ভয় হচ্ছে, আমি হয়তো ঠিকমতো কাজ করতে পারবো না।"

"না, ভয়ের কিছু নেই, তাছাড়া, আমার অবর্তমানে তোমাকেই তো সবকিছু করতে হবে। এখন থেকেই তার জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করো।"

"কিন্তু—"

"না কোন কিন্তু নয়," মনসিনর বললেন,—"আমার শরীর ভালো থাকলে আমিই যেতাম, কিন্তু আজ আমি উঠতেই পারছিনে।"

"কিন্তু স্যার, আপনাকে এই অবস্থায় রেখে যাই কি করে?" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন।

যেতে তোমাকে হবেই, মনসিনর বললেন,—"শত বাধা অগ্রাহ্য করে কনভার্টরা আসবে। তাদের নিরাশ করা কোনো মতেই চলবে না। আমার জন্যে চিন্তা করো না। আমি শুয়ে শুয়েই প্রার্থনা করবো।"

আর দেরী করবার মতো সময় নেই। শিউ-লান ওঁদের নিয়ে যাবার জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে। ফাদার ও'বেনিয়ান অসহায়ভাবে তাকান মনসিনরের দিকে। তাঁর মনের কথা বুঝতে পারেন মনসিনর।

"মন থেকে সব রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দাও—ও'বেনিয়ন।" মনসিনর বললেন—"ওখানে আজ তোমাকে একাই যেতে হবে শিউ-লানের সাথে। তাতে কিছু আসে যায় না। তোমার মন যদি খাঁটি থাকে তাহলে কোনো রকম পাপ চিন্তাই তোমার মনে আসবে না।"

"আপনি কি মনে করেন এখনও আমার মনে পাপ চিন্তা আছে?" আহত স্বরে ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"তাছাড়া আমি যখন প্রার্থনা-সভা পরিচালনা করতে যাচ্ছি, তখন অন্য কোনো চিন্তাই আসতে পারে না আমার মনে।"

মনসিনর তাকালেন ও'বেনিয়নের দিকে।

"আমাকে ক্ষমা করো পিটার," স্নেহ পূর্ণ স্বরে মনসিনর বললেন "তোমার মনে আঘাত দেবার জন্যে আমি এ কথা বলিনি।"

পিটার! এই প্রথম ফাদার ও'বেনিয়নকে তাঁর পিতৃদত্ত নাম ধরে সম্বোধন করলেন মনসিনর। তিনি যে এ নামটি মনে রেখেছেন সে কথা জেনে ও'বেনিয়ন মনে মনে খুশী হলেন। তাঁর চোখে জল এসে গেল। মনসিনরের বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর হাতে চুমো দিলেন তিনি।

"আশীর্বাদ করুন, আমি যেন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারি।" এই কথা বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নিচে আসতেই শিউ-লানের সাথে দেখা হয়ে গেল তাঁর। সে ওঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। বাঁশ ঝাড়ের পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। ওখানেই সে থাকবে বলেছিলো। সে আজ একটা সবুজ রঙের জ্যাকেট পরে এসেছে। আজ আর সে ফাদার ও'বেনিয়নকে দেখে হাসলো না। সে তার ডানহাতের তর্জনীটা ঠোঁটের ওপর তুলে ও'বেনিয়নকে চুপ করে থাকতে ইসারা করলো।

বাঁশ ঝাড়ের কয়েকটি বাঁশ দেওয়ালের ওপর এসে পড়ছে। শিউ-লান কাঠবেড়ালীর মতো একটা বাঁশের ওপরে উঠে তরতর করে দেয়ালের ওপরে উঠে গেল। ওখানে গিয়ে সে ইসারা করে ও'বেনিয়নকে আসতে বললো। ও'বেনিয়নের পক্ষে ওর মতো সহজে দেওয়ালের ওপরে ওঠা সম্ভব হলো না। তবুও অনেক চেষ্টার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত উঠে এলেন। শিউ-লান তখন নিচে নেমে পড়েছে। ও'বেনিয়ন দেওয়ালের কার্নিশ ধরে নিচে ঝুলে পড়লেন। তারপর ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লেন নিচে। ওদিকটায় কোনো গার্ড না থাকায় কেউ ওঁদের লক্ষ্য করতে পারলো না।

আজ আর ও'বেনিয়নের মনে কোনো রকম ভয় নেই। তার মন থেকে সমস্ত আবিলতা দূর হয়ে গেছে। শিউ-লান পথ দেখিয়ে

আগে আগে চলেছে। ফাদার ও'বেনিয়ন তাকে অনুসরণ করছেন। মরালের মতো চমৎকার তার গতিভঙ্গি। কিন্তু ফাদার ও'বেনিয়ন আজ তাকে দেখছেন অনুগত ভক্তের মতো। তাঁর মনে আজ ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই।

পূর্ব আকাশে মেঘ জমে আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সেই মেঘমালার ভেতরে। অনেকক্ষণ হাঁটবার পরে অবশেষে ওঁরা এসে হাজির হলেন পূর্ব-বর্ণিত টিলাটার কাছে। কনভার্টরা আগেই ওখানে উপস্থিত হয়েছে। তারা একটা ধানের ক্ষেতের পাশে লাইনবন্দী অবস্থায় হাঁটু গেড়ে বসে আছে। কে একজন ওখানে খড়ি দিয়ে চতুষ্কোণ দাগ দিয়ে রেখেছে। ওই চতুষ্কোণ জায়গাটাই আজ বেদী হিসেবে চিহ্নিত করেছে সে। তার ঠিক পেছনে শুকনো ডাল দিয়ে একটা ক্রুশ তৈরি করে পুঁতে রাখা হয়েছে। ফাদার ও'বেনিয়ন আসতেই ভক্তের দল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে স্বাগত জানালো। তিনি ওদের পাশ দিয়ে বেদীর দিকে চলে গেলে আবার ওরা হাঁটু গেড়ে বসলো। ফাদার ও'বেনিয়ন ধীর গম্ভীর স্বরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন। প্রভাতের সূর্যকিরণ তখন ছড়িয়ে পড়েছে টিলার ওপরে।

সমাগত ভক্তবৃন্দের সামনে দাঁড়িয়েছেন ফাদার ও'বেনিয়ন। তাঁর সামনে ভক্তবৃন্দ হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আশীর্বাণী উচ্চারণ করবার পর কমিউনিয়নের (Communion) জন্যে প্রস্তুত হলেন ফাদার। মাথা নত করে গম্ভীর কণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করলেন "ডমিনি নন সাম ডিগনাস" (Domini non sum dignus) কথাটা। ভক্তরা প্রত্যুত্তর দিলো। ফাদার তখন হাত উঁচু করে তাদের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর হাতে পবিত্র ধর্মীয় প্রতীক (Chalice)। প্রত্যেকের মাথায় ওটিকে একবার করে ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করতে লাগলেন তিনি।

ভক্তদের পেছনের সারিতে শিউ-লান হাঁটু গেড়ে বসেছে। তার কাছে এসে ফাদার একটু দাঁড়ালেন। পবিত্র ধর্মীয় প্রতীক দ্বারা তার মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন তাকে।

ফাদার ও'বেনিয়ন যে, শিউ-লানকে খ্রীষ্টান ভক্তদের মতো আশীর্বাদ করবেন, তার মাথায় পবিত্র প্রতীকটি ঠেকাবেন, তা সে ধারণাও করতে পারে নি। তখনও সে দীক্ষিতা হয়নি, সুতরাং কনভার্ট সে নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফাদার ও'বেনিয়ন তাকে আজ আশীর্বাদ করেছেন। ফাদার ও'বেনিয়নের আশীর্বাদ লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে শিউ-লানের মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিজেকে সে দীক্ষিতা খ্রীষ্টান বলে মনে করে। তার কর্তব্যজ্ঞান এবং ধর্মজ্ঞান যেন বেড়ে যায় হঠাৎ। তার মনে হয়, আজ থেকে সে লাভ করেছে পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের পূত আশীর্বাদ। সে মনে মনে স্থির করে যে, এখন থেকে সেও মাতা মেরী এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আরাধনা করবে। সে রেক্টরীতে ফিরে আসে যেন নতুন মানুষ হয়ে। এখন থেকে সে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে মনসিনর এবং ফাদার ও'বেনিয়নকে সেবা করতে থাকে।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিনও শিউ-লান প্রতিদিনের মতো ঘর-দোর পরিস্কার করে বিছানা পাতছিলো। মনসিনর এখন ভালো হয়ে উঠেছেন। তবে এখনও তাঁর শরীরের দুর্বলতা দূর হয়নি। ফাদার ও'বেনিয়ন এবং মনসিনর নিচের ড্রয়িংরুমে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছেন। শিউ-লান কাজ করছে দোতলায়। মনসিনরের বিছানাটা ঠিক করে সে যায় ও'বেনিয়নের ঘরে। এখন আর সে ফাদার ও'বেনিয়নকে যখন-তখন বিরক্ত করতে আসে না। পারত-পক্ষে তাঁর সামনে সে আসে না। কিন্তু সামনে না এলেও মনে মনে

ভক্তি করে তাঁকে। উনি মানুষ নন, দেবতা।—মনে মনে বলে সে। ঘর ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেলে সে বিছানা ঠিক করতে শুরু করে। এই সময় হঠাৎ সে যেন ও'বেনিয়নের সান্নিধ্য অনুভব করে। এই সরু চৌকির ওপরে ফাদার গতরাত্রে শুয়েছেন। এই শক্ত বালিশটার ওপরে মাথা রেখেছিলেন। কি ভেবে সে বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে। তার মুখে ফুটে ওঠে একটা অপার্থিব হাসির রেখা। ফাদারের কথা মনে হয় তার। কি সরল এবং ভালো মানুষ! শিউ-লান জানে যে, ফাদার তাকে ভালোবাসেন। তবে এ ভালোবাসা অন্য ধরনের। সে তাঁকে মনে-প্রাণে পূজা করে। পবিত্র আত্মার দ্বারা মাতা মেরী যখন গর্ভবতী হন তখন তিনি তাঁর অনাগত সন্তানের প্রতি যে রকম স্বর্গীয় ভালোবাসা অনুভব করতেন, এ ভালোবাসাও অনেকটা তেমনি।

শিউ-লান হাসে। ফাদারের বালিশটার ওপরে হাত দেয় সে। তার মনে হয়, ফাদারকে সে তার হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে। তার চোখ দুটি বুজে আসে। চোখ বন্ধ করে সে যেন দেখতে পায়, ফাদার তার পাশে বসে তাকে আশীর্বাদ করছেন।

দিবা স্বপ্ন দেখতে থাকে শিউ-লান। একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে সে। যেন বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তার দেহের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত বইতে থাকে। হার্টের গতি দ্রুততর হয়। কেন এ রকম হচ্ছে তা সে বুঝতে পারে না। আগে তার মনে এ রকম ভাব আর কখনও আসে নি। তবে কি সেও পবিত্র আত্মার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে? সে এখনও কুমারী। অনাঘ্রাত কুসুমের মতো তার দেহ এখনও সুপবিত্র। তবে কি তার কোলেও ভগবান আসছেন? এরকম অনেক কাহিনী সে শুনেছে। নদীতে কুমারী জলদেবতার দ্বারা অন্তঃস্বত্তা হয়েছে। মন্দিরে প্রার্থনারতা কোনো কুমারী মেয়ের দেহে অদৃশ্যভাবে উপগত হয়েছেন ভগবান—

এ সবই প্রাচীন কাহিনী। এগুলো সে শুনেছে তার মায়ের মুখে, তিনি শুনেছেন তাঁর মা অথবা দিদিমার মুখে; এমনি করেই লোক পরম্পরায় চলে আসছে এই সব অলৌকিক কাহিনী।

সম্রাট শুং-চিয়াং-য়ের আমলে দেশে এমন একজন যাদুকর ছিলেন যিনি যাদুবিদ্যার সাহায্যে সব রকম রোগ নিরাময় করতে পারতেন। তাঁর জন্মও নাকি কুমারী মায়ের গর্ভেই হয়েছিলো। তাঁর কুমারী মা যখন পবিত্র ওমেই পর্বতের একটি গুহায় বসে ধ্যান করছিলেন সেই সময় হঠাৎ একজন রূপবান যুবক তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন একজন দেবতা। মানুষের রূপ ধরে তিনি এসেছিলেন মেয়েটির গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করতে।

"আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না।" তিনি বলেন—"আমি—"

শিউ-লান চোখ বুজে সেই দৃশ্য চিন্তা করতে থাকে। তার মুখে তখন মৃদু হাসির রেখা। হঠাৎ কার কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে সে।

"তুমি তাহলে এখানে এসে লুকিয়ে আছো!"

সুউচ্চ কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ঘরের মধ্যে। পুরুষের কণ্ঠস্বর। শিউ-লান ভীতা হরিণীর মতো এক লাফে উঠে দাঁড়ায়। একটু আগে তার মুখে যে হাসির রেখা ফুটে উঠেছিলো, সে হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে তখন। ভয়ে কাঁপতে থাকে সে। এ লোকটা দেবতা নয়। দেবতার পরিবর্তে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে হো-সান। তার মাথায় সৈনিকের টুপি। কোমরের বেল্টের সঙ্গে খাপে ভরা পিস্তল। মাতাল অবস্থায় এসেছে সে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে শিউ-লান ভয় পায়।

"আমি জানতাম, এখানে এলেই তোমাকে পাওয়া যাবে।" হো-সান বলে,—"শয়তান পাদ্রী ব্যাটা তোমাকে—"

কথাটা শেষ না করেই সে ছুটে এসে শিউ-লানকে জাপটে ধরে

বিছানার ওপরে শুইয়ে ফেলে তার বুকের ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে। শিউ-লান ওর নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করে গালের ওপরে। উষ্ণ সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে মদের গন্ধ আসে। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে শিউ-লানের। তার মনে হয়, এখনই সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। প্রাণপণ শক্তিতে হো-সানকে বুকের ওপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে সে। কিন্তু তা সে পারে না। হো-সান তাকে দুহাত দিয়ে জাপটে ধরে আছে। শিউ-লান এবার চিৎকার করতে চেষ্টা করে। হো-সান তার মুখের ওপর হাত চাপা দেয়। কিন্তু তবুও তার চিৎকার শুনতে পান ফাদার ও'বেনিয়ন। মনসিনর ফিজগিবনও শুনতে পান চিৎকারটা। ও'বেনিয়ন তখন একখানা বই পড়ছিলেন। বইখানা টেবিলের ওপর রেখে তিনি ছুটে যান তাঁর ঘরে। হো-সানকে শিউ-লানের বুকের ওপরে দেখতে পান তিনি। কি ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে দেরী হয় না তাঁর। তিনি তখন হো-সানের জামার কলার ধরে টেনে তুলে ফেলেন। এইভাবে বাধা পেয়ে হো-সান বাঘের মতো লাফ দিয়ে ফাদার ও'বেনিয়নকে আক্রমণ করে।

"শীগগির এখান থেকে পালিয়ে যাও," শিউ-লানের উদ্দেশ্যে ও'বেনিয়ন বলেন—"আর এক মুহূর্তও এখানে থেকো না।"

কিন্তু পালিয়ে যাবার সুযোগ পেলো না শিউ-লান। হো-সান চিৎকার করে তার সৈনিকদের আহ্বান করলো। সঙ্গে সঙ্গে এক দল সৈনিক এসে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। তাদের প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে গুলিভরা রাইফেল।

"শয়তান পাদ্রীটাকে বেঁধে ফ্যালো।" হো-সান হুকুম দিলো তাদের—"ওই চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফ্যালো শয়তানটাকে।"

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো ও'বেনিয়নের

ওপর। ও'বেনিয়ন একা এবং নিরস্ত্র। সৈনিকরা তাই সহজেই তাঁকে কাবু করে ফেললো। ওরা তাঁকে টানতে টানতে চেয়ারের দিকে নিয়ে গিয়ে জোর করে চেয়ারের ওপরে বসিয়ে দিলো। তারপর দড়ি দিয়ে তাঁকে চেয়ারেয় সঙ্গে এমন ভাবে বাঁধলো যে, তাঁর আর নড়বার শক্তি রইলো না। এরপর টেবিল ক্লথটা টেনে নিয়ে তাঁর মুখটা এমন ভাবে বাঁধলো যাতে তিনি চিৎকার করতে না পারেন।

হো-সান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো ও'বেনিয়নকে। শিউ-লান তখনও বিছানার ওপরে মড়ার মতো পড়ে আছে।

"এবার তোমরা বাইরে যাও।" সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে হো-সান বললে—"আমার একটু কাজ আছে এখানে।"

সৈনিকরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

* * * *

সব শেষ হয়ে গেছে। হো-সান বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। শিউ-লানের দুচোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। তার কুমারী জীবনের পবিত্রতা আজ নষ্ট হয়ে গেছে। শয়তানটা জোর করে তার সতীত্ব নষ্ট করে গেছে। কিছুক্ষণ স্থানুর মতো পড়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসলো। এতক্ষণ যেন সে একটা কূপের মধ্যে নিমজ্জিতা অবস্থায় ছিলো। অতি কষ্টে সে কূপ থেকে উঠে এসেছে যেন। তার পোশাক অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। হঠাৎ ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে নজর পড়লো তার। তখনও তিনি চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা। শয়তানরা ওঁর মুখ বেঁধে রেখে গেছে। ওঁর চোখের সামনেই শিউ-লানের ওপরে বলাৎকার করে গেছে বর্বর হো-সান। তিনি মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন—"ভগবান ওদের ক্ষমা করো। ওরা জানে না কি পাপ ওরা করে গেছে আজ। হে জগৎ পিতা! আমাকেও তুমি ক্ষমা করো। আমি ধর্মযাজক হবার উপযুক্ত নই।"

শিউ-লানের মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। লজ্জায় ও'বেনিয়নের দিকে তাকাতেও পারছে না। কিন্তু কতক্ষণ না তাকিয়ে পারা যায়। সে তাই চোখ তুলে তাকায় তাঁর দিকে। ও'বেনিয়নের হাত-পা এবং দেহের উপরার্ধ চেয়ারের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা রয়েছে দেখে সে ছুটে যায় তাঁর কাছে। তার চোখ দিয়ে তখনও জল পড়ছে। হাত কাঁপছে থরথর করে। কম্পিত হাতেই ফাদার ও'বেনিয়নের বাঁধন খুলে দেয় সে। তারপর ফাদারের দিকে পেছন ফিরে জামার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে। সে যেন সাহস হারিয়ে ফেলেছে। মনে সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে। আবার তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। টপ টপ করে জল পড়তে থাকে দুই গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে। দুঃখে, লজ্জায় আর আত্মগ্লানিতে সে তাকাতেও পারছে না ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে।

শিউ-লানের মনের অবস্থা বুঝতে দেরী হয় না ফাদার ও'বেনিয়নের। তখনও তিনি স্থাণুর মতো চেয়ারে বসে আছেন। মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছেন মেঝের দিকে। তাঁর অবস্থা দেখে ভীষণ দুঃখ হয় শিউ-লানের। হঠাৎ সে একটা কাণ্ড করে বসে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ফাদারের পায়ের কাছে। ফাদারের হাঁটুর ওপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

"আমাকে সত্যের পথ দেখান্ ফাদার।" কাঁদতে কাঁদতে শিউ-লান বলে,—"পাষণ্ড হো-সান আমার দেহকে অপবিত্র করে দিয়েছে। এই অপবিত্র দেহ নিয়ে আপনার এবং মনসিনরের সামনে আমি দাঁড়াবো কেমন করে? আমাকে কি ভগবান ক্ষমা করবেন? আমার পাপ থেকে কি আমি মুক্তি পাবো?"

"তুমি কোনো পাপ করো নি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে নি।"

"আমি দেবতার স্বপ্ন দেখছিলাম।" শিউ-লান বলে,—"আমি চোখ বুজে দেবতার কথা চিন্তা করছিলাম। আমি—"

ফাদার ও'বেনিয়ন স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলেন—"আজ যা ঘটেছে তার জন্যে তোমার কোনো দোষ নেই। শয়তানটা জোর করে তোমার ওপর বলাৎকার করেছে। এটা তোমার পাপ বলে গণ্য হতে পারে না। পাপ করেছে হো-সান।"

ফাদার ও'বেনিয়ন শিউ-লানের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। "ভগবানের ক্ষমা তুমি লাভ করেছ। এবার তুমি তোমার মায়ের কাছে চলে যাও। এখানে আর তুমি থেকো না।"

শিউ-লানের হাত ধরে তুলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ফাদার ও'বেনিয়ন।

॥ নয় ॥

"তোমরা মেয়েদের সঙ্গে ব্যাভিচার করেছো বলে খবর পেয়েছি আমি।" হো-সান রুক্ষ স্বরে বললে।

রাত দুপুর। স্থান—রেড আর্মির হেড কোয়ার্টারস্। ফাদার ও'বেনিয়ন এবং মনসিনর ফিজগিবন দুখানা কাঠের টুলের ওপরে পাশাপাশি বসে আছেন। বেলা বারোটা থেকে একই অবস্থায়, একই জায়গায় ঠায় বসে আছেন ওঁরা। বারো ঘণ্টা আগে একদল সৈনিক হঠাৎ রেক্টরীতে হাজির হয়। মনসিনর তখন নিচের বসবার ঘরে একখানা চৌকির ওপরে শুয়েছিলেন। ফাদার ও'বেনিয়ন তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন। ঠিক এই সময়ই সৈনিকরা ঢুকে পড়লো ঘরে।

"তোমাদের এখনই জেলখানায় যেতে হবে।" সার্জেণ্ট বললে,—

"আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় নিয়ে যাবার জন্যে।"

"কে নির্দেশ দিয়েছে?" জিজ্ঞেস করেন ফাদার ও'বেনিয়ন।

"কার নির্দেশ, কি বৃত্তান্ত, সে সব কথা তোমাকে আমি বলতে রাজী নই।" সার্জেন্ট খেঁকিয়ে ওঠে,—"ভালোয় ভালোয় না গেলে হাতে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে।"

"আমাদের তো এখানেই নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।" ফাদার ও'বেনিয়ন অনুনয়ের সুরে বলেন—"হঠাৎ জেলখানায় নিয়ে যাবার হুকুম হলো কেন বলুন তো?"

"তা আমি জানিনে।" সার্জেন্ট বললে—"আমার কাজ হলো হুকুম তামিল করা। কর্নেল আমাকে যে হুকুম দিয়েছেন, তা আমাকে তামিল করতেই হবে। তোমাদের যদি কিছু জানবার থাকে তা কর্নেল সাহেবকে জিজ্ঞেস ক'রো।"

"কাকে? হো-সানকে?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ, তিনিই আমাদের কর্নেল।" সার্জেন্ট বললে।

"কিন্তু আমার সুপিরিয়র এখন অসুস্থ।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"ওঁর এই বৃদ্ধ বয়সে জেলখানার কষ্ট সহ্য করা ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাছাড়া এখন উনি ঘুমোচ্ছেন।"

"ঘুম ভাঙাতে দেরী হবে না আমাদের।" সার্জেন্ট চিৎকার করে বলল—"কি করে ঘুম ভাঙাতে হয় তা এখনই দেখতে পাবে।"

সার্জেন্টের চিৎকার শুনে মনসিনর ফিজগিবনের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি উঠে বসে তার দিকে তাকান।

"কি ব্যাপার! এখানে এত হট্টগোল কেন?" মনসিনর ক্রুদ্ধ স্বরে বলেন।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে সার্জেন্ট তার অধীনস্থ সৈনিকদের

দিকে তাকিয়ে হুকুম দেয়—"শয়তান দুটোর হাতে হাতকড়া পরাও।"

হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সৈনিকরা ওঁদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে জোর করে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো।

"কোমরে দড়ি বাঁধো।" সার্জেন্ট আবার হুকুম দিলো।

দড়ি সঙ্গে নিয়েই এসেছিলো ওরা। তাই কোমরে দড়ি বাঁধতে দেরী হলো না।

"এবার শয়তান দুটোকে নিয়ে চলো।" সার্জেন্ট বললে—"রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

সৈনিকরা ওঁদের টানতে টানতে রাস্তায় বের করে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো। পথচারীরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো সম্মানীয় মনসিনরের প্রতি সৈনিকদের অসম্মানজনক ব্যবহার। অনেকেই মনে মনে দুঃখিত হলো এতে, কিন্তু প্রতিবাদ করবার সাহস তাদের হলো না।

ওঁদের নিয়ে যাওয়া হলো রেড আর্মির হেড কোয়ার্টারসে। এই রকম নির্দেশই দেওয়া হয়েছিলো সার্জেন্টকে। ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করবার পর জেলখানায় পাঠানো হবে। হো-সানের সামনে ওঁদের দুজনকে হাজির করা হলে সে সার্জেন্টকে নির্দেশ দিলো—"এদের পাশের ঘরে নিয়ে বসাও। হাতকড়া আর দড়ি যেমন আছে তেমনি থাকবে।"

একটা কনকনে ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দুটো টুলের ওপরে বসিয়ে দেওয়া হলো ওঁদের। প্রত্যেকের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো তিনজন করে সশস্ত্র সৈনিক। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছিলো। শীতের প্রারম্ভে এই বৃষ্টিপাতের ফলে ঠাণ্ডাটা আরও কনকনে হয়ে উঠেছে। মনসিনর আর ফাদার ও'বেনিয়ন ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় ঠায় বসিয়ে রাখা হয়েছে ওঁদের।

ইতোমধ্যে হো-সান একবার ঘরে এসে দেখে গেছে ওঁদের। কিন্তু তখন সে কোনো কথা বলেনি ওঁদের সঙ্গে। আবার সে ঘরে ঢুকলো রাত বারোটার সময়। ওঁদের সামনে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললে—"তোমরা মেয়েদের সঙ্গে ব্যাভিচার করেছো বলে খবর পেয়েছি আমি।"

মনসিনরের আপাদ মস্তক জ্বলে উঠলো তার কথা শুনে। রুদ্র-দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন হো-সানের মুখের দিকে। তার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

ফাদার ও'বেনিয়নও হো-সানের দিকে তাকালেন।

"হো-সান," তিনি বললেন, "তোমার বৃদ্ধ শিক্ষকের দিকে একবার তাকাও! তুমি কি কনফুসিয়াসের উপদেশগুলি ভুলে গেছো? প্রভু যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ কি তোমার স্মরণ নেই? কনফুসিয়াস বলেছেন যে, শিক্ষককে পিতা মাতার মতো ভক্তি করতে হবে।"

হো-সানের চোখ দুটোতে ফুটে উঠল অবজ্ঞার হাসি। "কনফুসিয়াসকে আমি চিনি নে। আমার কোনো প্রভুও নেই। তোমরা যাকে প্রভু বলো, তাকেও আমি জানি নে।"

"তুমি তাঁদের দুজনকেই জানো।" মনসিনর হঠাৎ মুখ খুললেন, —"কিন্তু এখন তুমি তাঁদের অস্বীকার করছো।"

ফাদার ও'বেনিয়ন বার বার হো-সানকে অনুরোধ করতে লাগলেন মনসিনরকে মুক্তি দেবার জন্যে।

"হো-সান আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, মনসিনরকে অন্ততঃ এক কাপ গরম চা দাও। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, ঠাণ্ডায় উনি ঠকঠক্ করে কাঁপছেন।"

হো-সান কোনো উত্তর দিলো না, শুধু একবার তাকালো তাঁর দিকে।

"তোমার এই নির্যাতন উনি সহ্য করতে পারবেন না।" ফাদার

ও'বেনিয়ন অনুনয়ের সুরে বললেন—"মনসিনর মারা গেলে তুমি কি খুশী হবে? ওঁকে এইভাবে হত্যা করে তোমার কি কয়াদা হবে তা আমি বুঝতে পারছি নে।"

হো-সান একজন সৈনিকের দিকে তাকিয়ে মনসিনরকে চা দিতে ইঙ্গিত করলো। সৈনিকটি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা টি-পট আর একটা বাটি (bowl) নিয়ে এলো। বাটিতে চা ঢেলে মনসিনরের মুখে তুলে দিলো। মনসিনর ঢকঢক্ করে পান করে ফেললেন সেই চা।

চা পান করবার পর মনসিনরের দেহের কাঁপুনি একটু কমলো। হো-সান তখন ঘরের ভেতরে পায়চারি করছে। কিছুক্ষণ পায়চারি করবার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো সে। ধর্মযাজকদের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে গম্ভীর স্বরে বললে:

"তোমরা স্বীকার করো যে, তোমরা এখানে গুপ্তচর বৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছো।

"কখনও না।" মনসিনর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—"আমরা গুপ্তচর নই, এবং সে কথা তুমি ভালো করেই জানো!"

ধর্মযাজকদের পেছনে ছয়জন সৈনিক সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের রাইফেলগুলো তাক্ করা রয়েছে ওদের পিঠের দিকে। বেয়নেটের মুখগুলো প্রায় পিঠ ছুঁয়ে আছে।

"বুড়োটার তেজ দেখছি এখনও কমেনি।" মনসিনরের ঠিক পেছনে যে সৈনিকটি দাঁড়িয়ে ছিল তার দিকে তাকিয়ে হো-সান বললে—"ওর তেজ কমাবার ব্যবস্থা করো।"

মনসিনর অনুভব করলেন যে, তীক্ষ্ণধার কোনো অস্ত্র তাঁর পিঠের চামড়া ভেদ করেছে। ঠিকই বুঝতে পেরেছেন তিনি। হো-সানের ইঙ্গিতে সৈনিকটি তার রাইফেলের বেয়নেটটা প্রায় আধ ইঞ্চি ঢুকিয়ে দিয়েছে মনসিনরের পিঠে। দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে সেখান

থেকে। মনসিনর চোখ বুজলেন। তাঁর মনে হলো, এখনই হয়তো তাকে হত্যা করা হবে।

"ওরে খুনী!" ফাদার ও'বেনিয়ন চিৎকার করে উঠলেন হো-সানের দিকে তাকিয়ে—"পথের ধুলো থেকে তোকে কুড়িয়ে এনে যিনি সন্তানের মতো পালন করেছেন তাঁকে এইভাবে নির্যাতন করতে তোর বিবেকে বাধছে না?"

"চুপ করে থাকো, পিটার।' মনসিনর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—"ও যদি আমাকে নির্যাতন করে মনে আনন্দ পায় তাহলে তাই করুক। মরতে আমি ভয় পাইনে। প্রভু যীশুখ্রীষ্টকেও একদিন চরম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিলো অত্যাচারীদের হাতে। ওরা জানে না, কি ওরা করছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন ওকে ক্ষমা করেন।"

"কিন্তু আপনার এই নির্যাতন আমি যে সহ্য করতে পারছিনে, মনসিনর! ও কি মানুষ, না, মানুষের দেহধারী শয়তান?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"শয়তানের অত্যাচার থেকে প্রভু কি আমাদের রক্ষা করবেন না?"

"প্রভু আমাকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা ঠিকই করেছিলেন।"— মনসিনর বললেন,—"কিন্তু তুমিই সব মাটি করে দিয়েছো। তুমি যদি দুটো দিন আগেও আসতে তাহলে আমি এইভাবে নির্যাতিত হতাম না।"

"আমাকে ক্ষমা করুন, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,— "আমি আপনার এই নির্যাতনের জন্যে দায়ী।"

মনসিনর কিছু বলবার আগেই হো-সান গর্জন করে উঠলো— "এখানে বিদেশী ভাষায় কথা বলা চলবে না। কথা বলতে হলে চীনা ভাষায় বলতে হবে।"

এই সময় ও'বেনিয়ন তাঁর পিঠে যন্ত্রণা অনুভব করলেন। তাঁর পিঠেও বেয়নেট বিদ্ধ হয়েছে।

"ভগবান ওদের ক্ষমা করো।" যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে হো-সানের দিকে তাকিয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"ওরে শয়তান। তুই যদি আমাকে হত্যা করতে চাস তাহলে এখনই শেষ করে দে আমাকে।"

"চুপ কর্ শয়তান!" হো-সান চেঁচিয়ে উঠলো—"এখনও স্বীকার কর্, তোরা গুপ্তচর।"

"ওরে শয়তান। তুই কি ভেবেছিস্ যে, নির্যাতন করে আমাদের মুখ থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায় করবি?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমরা যে গুপ্তচর নই, সে কথা তুই ভালো করেই জানিস। দীর্ঘদিন রেক্টরীতে বাস করে মনসিনর ফিজগিবনকেও তুই খুব ভালো করেই চিনিস্। আর আজ তাঁকে নির্যাতন করে তাঁর মুখ থেকে মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাইছিস।"

ও'বেনিয়নের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হো-সান আবার পায়চারি করতে শুরু করলো। ঘরের মধ্যে একটা ডেস্ক, একখানা কাঠের চেয়ার আর ধর্মযাজকদ্বয় যে টুল দুটিতে বসে আছেন তাছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। দেওয়ালে একটা বড়ো সাইজের পোষ্টার আঁটা রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো পশ্চিমী সৈনিক গতায়ু হয়ে পড়ে আছে। নিচে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে—কোরিয়া।

পোস্টারখানার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো হো-সান। বাঘের মতো হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছবিটা দেখতে লাগলো সে। তারপর হঠাৎ ধর্মযাজকদের দিকে ফিরে তাকালো।

"শোন্ তুই শয়তান!" হো-সান গর্জন করে উঠলো,—"তোরা যে অপরাধ করেছিস, সেই অপরাধের জন্যেই তোরা আজ শাস্তি ভোগ করছিস। তোদের এই নির্যাতনের জন্যে তোরাই দায়ী। আমি এর জন্যে দায়ী নই। (You are at fault for what-ever you

suffer! It is not I who make you suffer. It is yourselves.) সত্যি কথা স্বীকার কর্—স্বীকার কর্ যে, তোরা গুপ্তচর। স্বীকার করলেই তোদের আমি ছেড়ে দেবো। আমি তোদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো।"

মনসিনর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন হো-সানের মুখের দিকে।

"এক সময় আমি মনে করতাম, তুমি আমার সবচেয়ে ভালো ছাত্র। আজ আমি বুঝতে পারছি, আমার সে অনুমান ছিলো ভ্রান্ত। তুমি কি কোনোদিন আমার মুখ থেকে মিথ্যে কথা শুনেছো? তোমার কি মনে নেই যে, একদিন তুমি পিচ গাছ হতে কাঁচা পিচ পেড়ে খেয়েছিলে এবং আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে দারোয়ানের ছেলের ওপরে দোষারোপ করেছিলে? কিন্তু আমি আমার স্টাডিতে বসে জানালা দিয়ে সবই লক্ষ্য করেছিলাম। আমি সেদিন নিচে নেমে এসে গাছের একটা ডাল দিয়ে তোমাকে মেরেছিলাম। তুমি মিথ্যে কথা বলেছিলে বলেই আমার কাছ থেকে মার খেয়েছিলে সেদিন। সে কথা কি তুমি ভুলে গেছো?"

"হ্যাঁ।" হো-সান চিৎকার করে বললে,—"আমি সব কিছু ভুলে গেছি—এমন কি, আপনার কথাও আমি ভুলে গেছি।"

"বেশ, তাহলে আজ শোনো," মনসিনর বললেন,—"তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই বলছি কথাটা। তুমি আমাদের মুখ থেকে মিথ্যে কথা বের করতে পারবে না। তুমি যদি তা ভেবে থাকো তাহলে তুমি মহা ভুল করেছো।"

হো-সান তার চেয়ারে গিয়ে বসলো। টেবিলের ওপর কয়েকখানা কাগজ ছিলো। কাগজগুলো সামনে টেনে নিলো সে। "এই রিপোর্ট তো মিথ্যে হতে পারে না। এই রিপোর্ট এসেছে আমাদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। মাও সে-তুঙ নিজে এতে সই করেছেন। তাঁর সিলমোহরও রয়েছে এতে। রিপোর্টে লেখা

আছে যে, সব ধর্মযাজকই আমেরিকার গুপ্তচর। এটা আমাদের সরকারী দলিল। সরকারী দলিল কখনও মিথ্যে হতে পারে না। তাছাড়া—"

মনসিনর বাধা দিলেন,—"তুমি আমার কাছে থেকে বছরের পর বছর লেখাপড়া করেছো। আমি কি কোনো দিন তোমাকে গুপ্তচর হতে বলেছি? তুমি যখন আমার চোখে ধুলো দিয়ে রেক্টরী থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়েছিলে, সে ব্যাপারেও কি আমি তোমাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করেছিলাম?"

"তা করেন নি ঠিকই," হো-সান বললে—"কিন্তু আমি যদি রেক্টরীতে ফিরে আসতাম তাহলে আপনি আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিতেন। আমিও হয়তো তা করতাম, যদি না আমি সত্যের আলোক দেখতে পেতাম। আপনি আমাকে আপনার ক্রীতদাসে পরিণত করতে চেয়েছিলেন—একথা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?"

মনসিনর সুস্পষ্ট চীনা ভাষায় উত্তর দিলেন—"তুমি জানো যে, তুমি মিথ্যে কথা বলছো। আমি তোমার মনকে জানি। হ্যাঁ, আমি ভালো ভাবেই জানি আজ তুমি নিজেকেই প্রতারণা করছো, কেন করছো, তা আমি ঠিক জানি নে। হয়তো কোনো বিশেষ কারণে তুমি ভীত হয়েছো। কিন্তু তুমি মিথ্যেবাদী হলেও আমাকে তুমি মিথ্যেবাদী বানাতে পারবে না। আমি তোমাকে ভয় পাই নে। শুধু তোমাকে কেন, তোমাদের কাউকেই আমি ভয় পাই নে।"

হো-সানের মুখ-চোখ রাগে লাল হয়ে গেল মনসিনরের কথা শুনে। সে কিছু বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বের হলো না। রাগে সে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো।

তার দিকে তাকিয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমাদের

মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা চলুক। রাগ করলে কোনো কাজই হবে না।” -

হো-সান তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট দুটি মুছে ফেলে পট থেকে চা ঢেলে নিলো বাটিতে। চা পান করে গলাটা ভিজিয়ে নিলো সে। এবার তার মুখ দিয়ে কথা বের হলো।

“আমি বন্ধুর মতোই ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম তোমাদের সঙ্গে।” হো-সান তিক্ত কণ্ঠে বললে—“ভদ্রতা বজায় রাখতে আমি চেষ্টা করেছি, তোমরাই বরং বন্য জন্তুর মতো ব্যবহার করেছো। গীর্জাকে সম্মান জানাবার জন্যে আমাদের ওপরে নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ এসেছে সোভিয়েট হতে। কিন্তু গীর্জা যারা চালায় তারা যদি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে আমরা কি করতে পারি?”

ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে সে আবার বলে,—“তুমি তোমার ঘরের মধ্যে কি করেছিলে তা কি তুমি জান না? রাস্তা থেকে আমি স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। তোমার ঘর হতেই শোনা গিয়েছিলো সে চিৎকার। আমি তখন রেক্টরীর সামনে দিয়ে একটা কাজে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ স্ত্রীলোকের চীৎকার শুনতে পাই আমি। মেয়েটি সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছিলো। আমি ছুটে যাই তার চিৎকার শুনে। তোমার ঘরে গিয়ে দেখতে পাই মেয়েটিকে তুমি তোমার বিছানার ওপরে শুইয়ে ফেলে তার সতীত্ব নষ্ট করতে চেষ্টা করছো।”

হো-সানের মুখ থেকে এই রকম নির্জলা মিথ্যে কথা শুনে ফাদার ও'বেনিয়ন একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো যে, মনসিনর হয়তো হো-সানের এই মিথ্যে কথাটি বিশ্বাস করবেন। শিউ-লান আর তাঁর সম্বন্ধে মনসিনর আগে থেকেই মনে সন্দেহ পোষণ করতেন। হয়তো সেই সন্দেহটা এবার বিশ্বাসে পরিণত হবে।

মনসিনর কিন্তু হো-সানের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলেন না। ওখানে কি ঘটেছিলো তা তিনি শিউ-লানের মুখ থেকে আগেই শুনেছিলেন। তিনি তাই রুদ্র দৃষ্টিতে হো-সানের দিকে তাকিয়ে বললেন—"নিজের অপরাধের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে লজ্জা হলো না তোমার? তুমি যে এতবড়ো মিথ্যেবাদী তা আমি কোনো দিন ভাবতেও পারিনি। কিন্তু তোমার কথা শুনে আজ আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার ভেতরে একসময় যে মনুষ্যত্ব ছিলো তা আর নেই। মনুষ্যত্ব, বিবেক, ধর্মবুদ্ধি—সবকিছু তোমার মন থেকে দূর হয়ে গেছে। এখন সেখানে বাস করছে এক কঠোর ধর্মদ্রোহী শয়তান।"

মনসিনরের কথা শুনে হো-সান চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকালো। মনসিনরের চোখের দিকে তাকাবার সাহস আর নেই। কোনো অপরাধী হাতে-নাতে ধরা পড়লে তার চোখ-মুখের অবস্থা যে রকম হয়, হো-সানের অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়ে পড়েছে। কিন্তু অপরাধী যখন ক্ষমতাশালী হয় তখন সে নিজের অপরাধকে চাপা দেবার জন্যে অন্য পন্থা গ্রহণ করে। হো-সানও তাই করলো। সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে সে হুকুম দিলো—"এই শয়তান পুরুত-দুটোকে এবার জেলখানায় নিয়ে যাও। জেলখানাই এদের উপযুক্ত স্থান। আগেই ওদের সেখানে পাঠানো উচিত ছিলো, কিন্তু ওদের প্রতি আমি অহেতুকভাবে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি।"

এই কথা বলেই হো-সান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সৈনিকরা তখন মনসিনর আর ফাদার ও'বেনিয়নের দেহের বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁদের নিয়ে চললো জেলখানায়।

॥ দশ ॥

জেলখানা।

অর্থাৎ রেড আর্মির 'মিলিটারী প্রিজন।' সাধারণ জেলখানার সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ। এ জেলখানা সাময়িক। আর্মি হেড কোয়ার্টারসের পাশের একটা বাড়িকে সাময়িকভাবে জেলখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখানকার নিয়ম-কানুনও সাধারণ জেলখানার নিয়ম-কানুনের চেয়ে আলাদা। যদিও এখানে একজন কারাধ্যক্ষ আছে, তবুও তার ক্ষমতা সাধারণ কারাধ্যক্ষের মতো নয়। একে কাজ করতে হয় স্থানীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের নির্দেশে সেনাবাহিনীর অধিনায়কই জেলখানার সর্বময় কর্তা। একটা চালু প্রবাদ আছে—'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম', ওখানেও তাই ; ওখানেও কর্তার ইচ্ছেয়ই সব কাজ হয়। কর্তা মানে রেড আর্মির স্থানীয় ইউনিটের অধিনায়ক, অর্থাৎ কর্নেল হো-সান। সে ইচ্ছে করলে যে কোনো লোককে ধরে এনে জেলখানায় ঢুকিয়ে দিতে পারে। বিচার-টিচারের দরকার নেই, কোনো ওয়ারেণ্টেরও দরকার নেই ; মুখের কথাই যথেষ্ট ! কথাই ওখানে আইন (word is law)।

এই আইনেই ধরে আনা হয়েছে মনসিনর ফিজগিবন আর তাঁর অনুসঙ্গী ফাদার ও'বেনিয়নকে।

জেলখানায় যখন ওঁদের নিয়ে আসা হলো তখন রাত একটা বেজে গেছে। সৈনিকরা ওঁদের দুজনকে একটা সেলে (cell) ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে চলে গেল। মনসিনরের অবস্থা তখন রীতিমত গুরুতর। 'দড়ি নির্যাতনও (The rope torture)

হওয়ায়, তাঁর তখন দাঁড়াবার মতো শক্তি নেই। তিনি তাই মেঝের ওপরে শুয়ে পড়লেন। ফাদার ও'বেনিয়ন তাঁর দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকালেন। ওদের এই নির্যাতন সহ্য করবার ক্ষমতা কি ওই ছোট্ট মানুষটির আছে। রোপ টর্চারের এই পদ্ধতিটি চীনের লাল ফৌজের এক নতুন আবিষ্কার। যাকে নির্যাতন করা হবে তার সারা দেহে দড়ি বেঁধে ক্রমাগত টাইট দিয়ে চলা হয়। এরফলে নির্যাতিত ব্যক্তির অবস্থা হয়ে ওঠে অসহনীয়। তার গায়ের মাংস হাড় থেকে আলাদা হয়ে যাবার মতো হয়; হাড়-গোড় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে।

মনসিনর চোখ বুজে পড়ে আছেন। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। হাত দুটি নাড়বার শক্তি নেই।

ফাদার ও'বেনিয়ন তাঁর পাশে বসে নিম্নকণ্ঠে বললেন—'মনসিনর আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি?"

মনসিনর মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, ও'বেনিয়নের কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না তাঁর। কিছুক্ষণ নির্জীবের মতো পড়ে থেকে অবশেষে তিনি বললেন,

"আমি—প্রার্থনা করতে পারছিনে।"

"আমি আপনার পক্ষে প্রার্থনা করবো" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমার নিজের জন্যে এবং আপনার জন্যে আমি প্রার্থনা করছি।"

প্রার্থনা শুরু করলেন ফাদার ও'বেনিয়ন। "ব্লেসেড ভার্জিন, প্রভু যীশুখ্রীষ্টের জননী—"

প্রার্থনা করতে বসে মনে হলো 'রোপ-টর্চার-এর কথা। চীনের সবাই জানে এই ভীষণ নির্যাতনের কথা। অনেক কনভার্টের মুখ থেকে এ কথা তিনি শুনেছেন। অনেকে মারাও গেছে এই অমানুষিক নির্যাতনের ফলে। যখনই তাঁদের হেড কোয়ার্টারসে

নিয়ে আসা হলো তখনই ফাদার ও'বেনিয়ন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এবার তাদের ওপরে চলবে 'রোপ-টর্চার।'

কোনো রকমে প্রার্থনা শেষ করে আবার তিনি মনসিনরের পাশে এসে বসলেন। তারপর তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন—"আজকের নির্যাতনই শেষ নির্যাতন নয়। এখন থেকে প্রতিদিনই নির্যাতন চলবে আমাদের ওপরে। আমাদের তাই আত্মরক্ষার জন্য আগে থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। ওরা যখন আপনাকে বাঁধবে তখন যতটা সম্ভব দেহকে স্ফীত করবেন। বাঁধা শেষ হলে দেহকে আবার সঙ্কুচিত করবেন। এর ফলে বাঁধনটি খুব টাইট হবে না। কিন্তু ওরা যেন আমাদের এই কৌশলটা বুঝতে না পারে।—"

মনসিনর কথা বললেন না। কথাগুলো তিনি শুনতে পেলো কি না সে বিষয়েও সন্দেহ হলো ফাদার ও'বেনিয়নের।

পরদিন আবার পূর্বোক্ত ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ওঁদের। হো-সান আগে থেকেই সেখানে বসে ছিলো। বন্দীদ্বয়কে তার সামনে হাজির করতেই সে হুকুম দিলো—বাঁধো ওদের।"

হো-সানের পাশে আরও একজন অফিসারকে দেখা গেল। হো-সানের পাশে আর একখানা চেয়ারে বসে আছে সে। লোকটির নাম চুং রেন। হো-সানের অধীনস্থ সেনানী। পদমর্যাদায় লেফ্‌টন্যাণ্ট।

গতকাল রাত্রে যেভাবে দুখানা টুলের ওপরে ওঁদের বসানো হয়েছিলো, আজও ঠিক সেইভাবেই বসানো হলো। তারপর ঠিক আগেরই মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো দুজনকে।

"টাইট," হো-সান বললে—"আরও টাইট করো।"

সঙ্গে সঙ্গে চুং রেন পোঁ ধরলো—"আরও, আরও টাইট করো।"

"ওরে খুনীর দল!" ফাদার ও'বেনিয়ন চিৎকার করে উঠলেন—"এভাবে তিলে তিলে হত্যা না করে একবারে শেষ কর্। আমাদের গুলি করে মেরে ফ্যাল তোরা।"

হো-সানের মুখে ফুটে উঠলো এক ধরণের বিজাতীয় হাসি। "না, না, সেটা বড়ো নির্দয় কাজ হবে। আমাদের সব সময় দয়ালু হতে বলা হয়েছে। আমি তাই নির্দয় হতে পারি নে। তাছাড়া, মেরে ফেললে তো সব শেষ হয়ে গেল।"

এই কথা বলে সৈনিকদের দিকে তাকালো সে। "কি করছো তোমরা! দড়িতে গিট দাও, হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে! এবার গলা বেড় দিয়ে শেষ প্রান্ত ধরে টানো।"

সৈনিকরা তখনই তামিল করলো হো-সানের হুকুম। ধর্মযাজকদ্বয়ের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়, ওদের দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। সৈনিকদের সে কি পাশবিক উল্লাস। এরপর তারা ওঁদের কনুই ধরে টেনে হাত দুটিকে পেছনের দিকে নিয়ে পূর্বোক্ত দড়ির প্রান্ত দ্বারা বেঁধে ফেললো। এমনভাবে বাঁধা হলো যে, হাতে একটু টান পড়লেই গলার ফাঁসে টান পড়ে। মনসিনর স্বভাবতই দুর্বল। দড়ির বাঁধনে তিনি এবার মৃতপ্রায় হয়ে পড়লেন। তাঁর গায়ের মাংস হাড় থেকে খুলে আসছে যেন। তাঁর কপাল আর গাল থেকে টস টস করে ঘাম ঝরছে তখন। ঘাম মুছবার জন্যে ঘাড়টা তুলতে গেলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গলার ফাঁসে টান পড়ায় থেমে গেলেন।

"নড়াচড়া করবেন না, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন ফিসফিস করে বললেন।

মনসিনর তাঁর কথা শুনতে পেলেন না। কিংবা শুনতে পেলেও তিনি কি বলছেন তা বুঝতে পারলেন না। প্রাণের দায়ে তিনি দেহটাকে নাড়া দিয়ে দড়ির বাঁধন আলগা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু নড়াচড়ার ফলে বাঁধনটি আরও টাইট হতে লাগলো। গলার

ফাঁস এঁটে গিয়ে তাঁর জিভ্ বেরিয়ে এলো। তার ঠোঁট দুটো কালো হয়ে গেল এবং মাথাটা বুকের ওপরে ঝুলে পড়লো।

"আমার জীবন শেষ হয়ে এসেছে—" ক্ষীণকণ্ঠে বললেন মনসিনর।

"হো-সান!" ফাদার ও'বেনিয়ন আর্তনাদ করে উঠলেন,—"ওঁর গলার ফাঁসটা আলগা করে দাও। উনি যদি মারা যান তাহলে তুমিই ওঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে।"

"আমি দায়ী হতে যাবো কিসের জন্য?" হো-সান বললে,—"এর জন্যে দায়ী উনি নিজে।"

"মনসিনর পাগল হয়ে যাবেন।" ফাদার ও'বেনিয়ন আর্তস্বরে বললেন। তাঁর নিজের অবস্থা গুরুতর, কিন্তু তিনি সহ্য করছিলেন। "এতে তোমার কি সুবিধে হবে?"

হো-সান এবার চুং রেনের দিকে তাকালেন। "ওদের এবার বটিকা প্রয়োগ করো। কথা বলানোর বটিকা? (Give them the pills. Give them talking pills.)

চুং একটা বোতল খুলে তার ভেতর থেকে দুটো বড়ি বের করে ফাদার ও'বেনিয়নের ঠোঁট দুটোর ভেতরে ঢুকিলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল বড়ির ক্রিয়া। ও'বেনিয়নের তালু শুকিয়ে গেল।

"এটা আবার কোন্ ধরনের নির্ধাতন? ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"এই বুঝি তোমার শিক্ষা? তুমি কি শুনতে চাও আমার কাছ থেকে? তুমি কি চাও, আমি মিথ্যে করে বলি যে, আমি আমেরিকার গুপ্তচর? প্রাণ গেলেও আমি সে কথা বলবো না। আমাদের কাছ থেকে মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায় করতে তুমি পারবে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সুমতি হোক। ভগবান তোমায় যেন ক্ষমা করেন।"

"ভগবানের করুণার একটা সীমা আছে, "মনসিনর বললেন,—
"ওরা যে পাপ করছে তার কোনো ক্ষমা নেই।"

"এ কথা বলবেন না, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—
"ভগবানের করুণার যদি সীমারেখা থাকতো তাহলে মানুষের কোনো আশাই থাকতো না।" তিনি চোখ বুজে প্রার্থনা করতে লাগলেন—
"হে পরমপিতা পরমেশ্বর! হে আমার করুণাময় ভগবান! এই পাপীকে তুমি ক্ষমা করো, ও যাদের ওপরে কর্তৃত্ব করছে সেইসব দুষ্কৃতকারীদেরও তুমি ক্ষমা করো। ওরা জানে না ওরা কি করছে। হে প্রভু যীশু! তোমার ওপরেও এমনিভাবে অত্যাচার করেছিলো দুষ্কৃতকারীরা।"

"ওরা জানে, শয়তানেরা কি করছে, তা ভালো করেই জানে।" মনসিনর বললেন।

"না, স্যার, ওরা তা জানে না," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—
যদি তা জানতো তাহলে এমন কাজ ওরা করতো না। ওরা এখনও মানুষ, এখনও ওরা শয়তানে পরিণত হয়নি।"

"তুমি সবাইকে নিজের মতো মনে করো, পিটার।" মনসিনর বললেন,—"কিন্তু ওরা তা নয়। ওরা শয়তানের প্রতিমূর্তি।"

"এমন কথা বলবেন না, স্যার।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—
"ওরা আমাদের ওপর যতই অত্যাচার করুক, তবুও ভগবানের কাছে ওদের জন্যে আমি প্রার্থনা করবো।"

ফাদার ও'বেনিয়নের কথায় বাধা দিয়ে চুং-রেন সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললে—"দাঁড়িয়ে দেখছো কি তোমরা? দড়ি টাইট দাও, আরও জোরে কসো। ওরা এখনও কথা বলতে পারছে।"

চুং-রেনের আদেশ পালনের জন্যে দুজন সৈনিক এগিয়ে এলো। হঠাৎ হো-সান রাগে ফেটে পড়লো।

"চুং-রেন!" সে চীৎকার করে উঠলো,—আমার সামনে

সৈনিকদের হুকুম করবার স্পর্ধা তোমার কোথা থেকে হলো? হুকুম করবার মালিক আমি, হ্যাঁ শুধু আমি।"

চুং-রেন বিস্মিত।

"আপনি কি দড়ি আরও টাইট করতে চান না?" সে জানতে চাইলো।

হো-সান এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর অনুচ্চস্বরে বললে—"না।"

কিছুক্ষণ কি চিন্তা করলো হো-সান। তারপর টেবিলের ওপরে হঠাৎ একটা মুষ্টাঘাত করলো।

"এদের বাঁধন খুলে দাও।" সে হুকুম দিলো,—"জেলখানায় নিয়ে যাও এদের।"

দড়ির বাঁধন খুলে দেওয়া হলো। মনসিনর এবং ফাদার ও'বেনিয়ন উঠে দাঁড়াতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না। মনসিনর মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন এবং ও'বেনিয়ন টলতে টলতে দেওয়ালের গায়ে গিয়ে পড়লেন। দুজনের অবস্থাই সাংঘাতিক। মনসিনর মৃতপ্রায়। ও'বেনিয়নও তথৈবচ। তবে মনসিনরের মতো তিনি মেঝেয় লুটিয়ে পড়েননি। কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছেন দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে। আর মনে হলো, তার দেহের হাড়গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাঁর নাক মুখ দিয়ে তখন ঘন ঘন শ্বাস বইছে।

মনসিনর বেহুঁসের মতো মেঝের ওপরে পড়ে আছেন। তাঁকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখে ফাদার ও'বেনিয়নের খুব দুঃখ হলো। তিনি ওঁকে কোলে তুলে নেবার জন্যে ফাদার ও'বেনিয়ন ধুকতে ধুকতে এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। কিন্তু নিচু হয়ে তিনি যখন মনসিনরকে ধরে তুলতে গেলেন, তখন তিনি নিজেই পড়ে গেলেন। তাঁকে ওইভাবে পড়ে যেতে দেখে হো-সান এগিয়ে এসে তাকে ধরে তুললেন। এরপর একজন সৈনিকের দিকে তাকিয়ে সে বললে:

"বৃদ্ধ লোকটিকে তুমি কোলে তুলে নাও।"

সৈনিকটি সঙ্গে সঙ্গে মনসিনরকে কোলে তুলে নিলো। হো-সান বললে—"চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে জেলখানায় যাচ্ছি।"

জেলখানায় আসবার পর ফাদার ও'বেনিয়ন হো-সানের দিকে তাকিয়ে বললে—"হো-সান, দয়া করে আমাকে ওঁর সঙ্গে থাকতে দাও। ওঁর যা অবস্থা তাতে একা সেলে থাকা সম্ভব হবে না ওঁর পক্ষে।"

হো-সান একটু চিন্তা করলো। তারপর সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললে—"ঠিক আছে। এঁদের দুজনকে একটা সেলেই রাখো।"

হো-সানের নির্দেশে সৈনিকরা মনসিনর এবং ফাদার ও'বেনিয়নকে একটা সেলে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো।

সেলের মধ্যে একটা বাঁশের অপরিসর মাচা ছাড়া আর কিছু নেই। ফাদার ওবেনিয়ন মনসিনরকে সেই মাচার ওপরে শুইয়ে দিয়ে নিজে তাঁর পাশে বসেন।

সারাটা রাত ও'বেনিয়ন মনসিনরের পাশে বসে রইলেন। কয়েকবার প্রার্থনাও করলেন। গলায় রোজারী (Rosary) ছিলো না। একজন সৈনিক ওটাকে তাঁর গলা থেকে খুলে নিয়ে মুকুটের মতো মাথায় পরেছিলো। রোজারীটা হারিয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন খুব দুঃখিত হয়েছিলেন, কারণ জিনিসটা ছিলো তাঁর মায়ের স্মৃতি-চিহ্ন। তিনি যখন বাড়ি থেকে চলে আসেন তখন তাঁর মা ওটা তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলো। তারপর থেকে প্রতিদিন প্রার্থনা করবার সময় ওটাকে তিনি ব্যবহার করতেন। কিন্তু আজ তাঁকে রোজারী ছাড়াই প্রার্থনা করতে হয়েছে।

রাত প্রায় একটা পর্যন্ত মনসিনর মৃতের মতো পড়ে ছিলেন। একটার ঘণ্টা বাজবার পর তিনি চোখ মেলে তাকালেন।

"তুমি কি এখানেই আছো নাকি আজ?" ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মনসিনর।

তাঁর জ্ঞান ফিরেছে দেখে ফাদার ও'বেনিয়ন খুশী হলেন।

"ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন," তিনি বললেন,—"আমি ভেবেছিলাম, আপনি হয়তো মারা গেছেন।"

"না, আমি মারা যাইনি।" মনসিনর বললেন,—"আমি এখন উঠে বসতে পারবো।"

এই কথা বলেই তিনি উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু চেষ্টা করেও উঠে বসতে পারলেন না তিনি। "না, এখনও আমি উঠতে পারছিনে। সকাল হলে উঠবো।"

কথাটা তিনি এমন ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন যে, ও'বেনিয়ন ভালো ভাবে শুনতে পেলেন না। তিনি তখন মনসিনরের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—"কি বললেন, স্যার? আপনার কথা আমি বুঝতে পারিনি।"

"জন্মভূমির কথা মনে হচ্ছে আমার।" মনসিনর ক্ষীণস্বরে বললেন,—"তুমি আমাকে আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা বলো, পিটার। আমি বুঝতে পারছি, জন্মভূমিতে আর আমি ফিরে যেতে পারবো না। জন্মভূমি মা-র কথা স্মরণ করতে করতেই আমি যেন শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে পারি।"

ফাদার ও'বেনিয়ন মনসিনরের পাশে বসলেন। "আমারও আজ স্বদেশের কথা মনে হচ্ছে, স্যার। দেশ মাতৃকার কথা মনে হওয়ায় আমার চোখে জল এসে পড়ছে। আমিও হয়তো আর ফিরে যেতে পারবো না আয়ার্ল্যাণ্ডে। হয়তো এই জেলখানাতেই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতে হবে আমাদের।"

"আমাকে তুমি কাউন্টি উইকনোর কথা বলো।" মনসিনর বললেন,—"ছেলেবেলাটা ওখানেই আমার কেটেছে। ডাবলিনে যাবার আগে পর্যন্ত উইকনো-তেই আমি ছিলাম।"

ফাদার ও'বেনিয়ন একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন। "আমি চাষী পরিবারের ছেলে। প্রাসাদবাসীদের কথা আমি ঠিকমত বলতে পারবো না। আমার মা বাবা বাস করতেন একটা কুঁড়ে ঘরে। সামান্য কিছু জমি-জমা ছিলো আমাদের। সেই জমি চাষ করেই কোনো রকমে সংসার চলতো আমাদের। বাবার সঙ্গে আমিও ক্ষেতে কাজ করতাম। এক জোড়া মুরগী, দুটো শূয়ার এবং একটা গাইও ছিলো আমাদের। ক্ষেতে আমরা আলুর চাষ করতাম। খুবই গরিব ছিলাম আমরা। শুধু আলু সেদ্ধ আর বাঁধা কপি সেদ্ধ খেয়েই দিন কাটাতে হতো আমাদের। মাংস আসতো কালে ভাদ্রে। পায়ে একজোড়া জুতোও ছিলো না আমার। খালি পায়েই থাকতাম আমি। কিন্তু যত কষ্টেই থাকি না কেন, স্বদেশের কথা মনে পড়লে এখনও আমার চোখে জল এসে পড়ে। এখানেও আকাশে চাঁদ সূর্য ওঠে, এখানেও তারা ওঠে আকাশে, কিন্তু স্বদেশের আকাশের চাঁদ সূর্য তারা যেন আরও সুন্দর। রাতের বেলা ভাইদের পাশে বসতাম আমি। খড় বিছানো শয্যায় কম্বল গায়ে দিয়ে শুতাম আমরা।"

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন ফাদার ও'বেনিয়ন। তারপর কি মনে করে হেসে উঠলেন। "শেষ রাতের দিকে শূয়ারের বাচ্চারা এসে দরজায় ধাক্কা মারতো। ঠাণ্ডায় বাইরে থাকতে না পেরে ঘরের ভেতরে ঢুকতে চাইতো ওরা। বাবা উঠে দরজা খুলে ওদের ঘরের ভেতরে নিয়ে আসতেন। এর জন্যে মার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর ঝগড়া হতো। মা শূয়ারের বাচ্চাগুলোকে দু-চোখে দেখতে পারতেন না। বাবা বলতেন—"কিছুদিন পরে তো ওদের আমরা

খেয়েই ফেলবো। সুতরাং ওরা যদি একটু যত্ন আত্তি পায় তো পাক না।"

ও'বেনিয়নের কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন মনসিনর। ও'বেনিয়নও তখন মেঝের ওপরে শুয়ে পড়েন।

সেলের মধ্যে কোনো ঘড়ি ছিলো না। দিন রাত বুঝা যেতো সূর্যের আলো দেখে। প্রভাতে সূর্য উঠলে সেলের ভেতরটা আলোকিত হতো, আবার সূর্য অস্ত গেলে আঁধার হয়ে যেতো ঘরটা। মনসিনরের একটা সোনার ঘড়ি আর সোনার চেন ছিলো। ফাদার ও'বেনিয়নেরও ছিলো একটা রূপোর হাত-ঘড়ি। ছটো জিনিসই সৈনিকরা কেড়ে নিয়েছে ওঁদের কাছ থেকে।

মনসিনর প্রায় সব সময় ঘুমিয়েই কাটান। ফাদার ও'বেনিয়ন কিন্তু জেগেই থাকেন। কারারক্ষীরা ওঁদের যে খাবার খেতে দেয় তাতে মনসিনরের ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেও ও'বেনিয়নের ক্ষিদে দূর হয় না। সারা দিনে ওঁদের খেতে দেওয়া হয় ছুই ডাব্বা ভাত আর সামান্য একটু ঘ্যাট। এই খাদ্য খেয়ে ও'বেনিয়নের মতো সবল মানুষের পক্ষে দিন কাটানো কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু কঠিন হলে কোনো উপায় নেই। মাপা ভাত আর মাপা ঘ্যাট ছাড়া একটুও বেশী দেওয়া হয় না ওঁদের। মাঝে মাঝে শিউ-লানের কথা মনে হয় ও'বেনিয়নের। মেয়েটি এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে কে জানে? হয়তো তার ওপরেও চলছে অকথ্য অত্যাচার। কিংবা হো-সান হয়তো এখনও তার ওপরে বলাৎকার চালিয়ে যাচ্ছে। শিউ-লানের কথা মনে হতেই তিনি শিউরে উঠলেন। কী সর্বনাশ। আবার নারীর চিন্তা! মন থেকে তার চিন্তাকে দূর করে দিতে চাইলেন ফাদার ও'বেনিয়ন, হাঁটু গেড়ে বসে মেরী মাতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলেন তিনি।

দিনের পর দিন কাটতে লাগলো জেলখানার অপরিসর সেলে।

হো-সান আর তাঁদের হেড-কোয়ার্টারসে নিয়ে যাচ্ছে না। নির্যাতনও চলছে না অনেকদিন যাবৎ। তবে কি ওর মনের পরিবর্তন হয়েছে? ফাদার ও'বেনিয়ন যেদিন এই সব কথা চিন্তা করছিলেন। সেই দিনই ছয়জন সৈনিক এসে হাজির হলো ওঁদের নিয়ে যাবার জন্যে। সেল থেকে টেনে বের করে ওঁদের নিয়ে যাওয়া হলো হেড কোয়ার্টারসে। আবার সেই নির্যাতনের কক্ষে এনে আগের মতোই পাশাপাশি ছুটো টুলের ওপর বসিয়ে দেওয়া হলো ওঁদের। একটু পরেই চুংরেন এসে হাজির হলো সেখানে। তাকে দেখেই ফাদার ও'বেনিয়নের বুকটা কেঁপে উঠলো। এ লোকটার মনে দয়া-মায়ার লেশ নেই। নির্যাতন করতে পারলেই সে খুশী হয়। তার মুখটা যেন শয়তানের মুখ। নিষ্ঠুরতা আর ক্রুরতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে সে মুখে। ছেলেবেলা থেকেই সে নিষ্ঠুর। লেখাপড়া শেখার সুযোগও সে পায়নি। ওর বাবা ছিলো ভিখারী। সুতরাং ছেলেবেলাটা ওর কেটেছে অনাহারে আর অর্ধাহারে। চুরি করতেও সে রপ্ত হয়ে পড়েছিলো ছেলেবেলা থেকেই। মনসিনর ওকে ভালো করেই চেনেন। এক সময় তিনি ওর বাবাকে সাহায্য করেছেন খাদ্য আর জামা-কাপড় দিয়ে। ছেলেটা কিন্তু সাহায্য-টাহায্যের ধারও ধারতো না। সারাদিন সে রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করে বেড়াতো আর সুযোগ পেলেই এটা-সেটা চুরি করতো। মনসিনর মাঝে মাঝে ওকে রেষ্টরীতে নিয়ে এসে পেট ভরে খাওয়াতেন। জামা-কাপড়ও দিতেন মাঝে মাঝে। সেদিনের সেই ছেলেটিই আজ লাল ফৌজের অফিসার। এই কাজ পেয়ে ও যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে। সৈনিকের উর্দ্দী পরে আর কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে ও ভাবছে—'হাম ক্যা হমু রে?'

"হো-সান কোথায় দয়া করে বলবেন কি?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করেন চুং-রেনকে।

"তিনি অসুস্থ।" অল্প কথায় উত্তর দেয় সে।

মনসিনর এবং ফাদার ও'বেনিয়ন ঠিক আগের মতোই টুলে বসে আছেন। তাঁদের প্রত্যেকের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন করে সশস্ত্র সৈনিক। চুং-রেন একটা রিপোর্ট লিখছে। লেখা শেষ হলে হাত থেকে কলম নামিয়ে রেখে মনে মনে লেখাটা একবার পড়ে নিলো। তার মুখে ফুটে উঠলো ক্রুর হাসি। রিপোর্টটা একটা খামের ভেতরে ঢুকিয়ে খামের মুখটা বন্ধ করলো সে। তারপর একজন সৈনিককে ডেকে বললে—"এটা এখনই হেড কোয়ার্টাসে নিয়ে যাও। জেনারেলের হাতে দেবে এটা

লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ধর্মযাজকদের দিকে তাকালো সে। মনসিনর তার চোখে প্রতিহিংসার আগুন লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তাতে তিনি মোটেই ঘাবড়ালেন না।

"হো-সান অসুস্থ হয়েছে এটা একটা সু-খবর," তিনি বললেন,—"আমি আশা করি তার মনে অনুশোচনা না আশা পর্যন্ত তার অসুখ সারবে না।—তার অবস্থা কি গুরুতর? অবস্থা গুরুতর হলেই ভালো হয়। গুরুতর অসুখই মানুষের মনকে ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনে। খবরটা শুনে আমি খুশী হয়েছি। এখানে আসার পর এই প্রথম একটা সু-খবর শুনতে পেলাম আমরা।"

চুং-রেনের মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। "হ্যাঁ, অবস্থা গুরুতরই বলা চলে, ব্যাপারটা তিনি আমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন। তাঁর ফুসফুসের অবস্থা খারাপ—গতরাত্রে তিনি রক্ত বমি করেছিলেন। এখন আর এটা লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।"

ফাদার ও'বেনিয়ন আঁতকে উঠলেন খবরটা শুনে। "আমি তার কাছে একবার যেতে চাই।" তিনি বললেন।

"কি ব্যাপার? ওঁর কাছে যাবার কি দরকার?" চুং-রেন জিজ্ঞেস করলো—"আপনি যদি ভেবে থাকেন যে, মৃত্যুর পূর্বে আপনি ওঁকে ধর্মকথা শুনাবেন, তাহলে মহা ভুল করেছেন আপনি।"

"না, আমি ওকে ধর্মকথা শুনাতে চাইনে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমি ওকে দেখলে বুঝতে পারতাম, তার বর্তমান অবস্থায় আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কিনা।"

ঠিক এই সময় ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। একটি বালক ঘরে ঢুকলো। চুং-রেনের সামনে এসে সে বললে—"কর্নেল হো-সান আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। পাদ্রী দুজনকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।"

ফাদার ও'বেনিয়ন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মনসিনরের দিকে তাকালেন।

"শুভ লক্ষণ বলেই মনে হচ্ছে।" মনসিনর মৃদুস্বরে বললেন।

"কি বলছেন আপনারা?" চুং-রেন জানতে চাইলো।

"তুমি কি ইংরেজী জানো না?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন, যদিও তিনি জানতেন যে ইংরেজী ভাষা ও জানে না।

"বিদেশী ভাষা জানবার প্রয়োজন বোধ করিনে আমি।" চুং-রেন উচ্চৈস্বরে বললে।

"আমিও তাহলে প্রয়োজন বোধ করিনে আমার কথাগুলোকে অনুবাদ করে শুনাতে।" মনসিনর সতেজে বললেন।

তাঁর হাব-ভাব দেখে চুং-রেন মনে মনে রেগে গেল। পাদ্রীদের হো-সানের কাছে পাঠাবার ইচ্ছে তার ছিলো না। সে ভেবেছিলো যে, হো-সানের অনুপস্থিতিতে সে খুশিমতো নির্যাতন চালাবে ওঁদের ওপরে। কিন্তু হো-সানের নির্দেশ সে অমান্য করতে পারলো না। হো-সান তার ওপরওয়ালা। তার নির্দেশ পালন না করে তার উপায় নেই। সে এই অনিচ্ছা সত্বেও রাজী হলো ওঁদের হো-সানের ঘরে পাঠাতে। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে তাকে ওঁদের নিয়ে যেতে বললে।

হো-সানের ঘরে ঢুকতেই ওঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সে একটা

কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার অবস্থা দেখে অসুখটা গুরুতর বলেই মনে হলো ওঁদের।

ফাদার ও'বেনিয়ন এগিয়ে এসে তার বিছানার পাশে বসে স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন—"আগে আমাকে খবর দাওনি কেন, হো-সান ?"

"তুমি আমার ওপরে যতোই অত্যাচার করো না কেন, আমি তোমাকে এখনও আমার ছেলের মতই স্নেহ করি।" মনসিনর বললেন—"এক সময় তুমি আমাকে পিতার মতোই ভক্তি করতে, কিন্তু আজ তুমি আমাকে ভুলে গেছো। তাই বোধহয় তোমার অসুখের খবরটা আমাকে জানাওনি।"

"আমি কারো লোক-দেখানো বাৎসল্যের ধার ধারি নে।" হো-সান বললে—"আপনাদের অনুকম্পা লাভের জন্যে আমি আপনাদের ডেকে পাঠাইনি।"

"তোমার মনে আঘাত দেবার জন্যে মনসিনর একথা বলেন নি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"নিজের মনের দুঃখটাই তিনি প্রকাশ করেছেন। উনি যে কতো দয়ালু, সে কথা তুমি নিশ্চই জানো। মানুষের দুঃখ-কষ্ট উনি সহ্য করতে পারেন না।"

"আমি ওর শেষকৃত্য করবার জন্যে প্রস্তুত আছি।" মনসিনর বললেন।

ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে হো-সান বললে—"ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে থামতে বলুন তো। ওঁকে বলে দিন যে, আমার পরলোকের পথ সুরু করবার জন্যে ওঁকে আমি ডেকে আনি নি।"

এরপর একটু থেমে সে আবার বললে—"আমার অসুখের সম্বন্ধে চুং-রেন কিছু বলেছে কি ?"

"হ্যাঁ, তিনি বলেছেন যে, তোমার ফুসফুসের অবস্থা খারাপ। গতরাত্রে তুমি রক্তবমি করেছো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন, "অসুখটা কি, হো-সান ?"

"নিউমোনিয়া।" হো-সান বললে—"গতরাত্রে এমন প্রবলভাবে আমি কাশতে থাকি যে, কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে।"

কথা বলতে বলতে আবার সে কাশতে শুরু করে, একখানা রুমাল নিয়ে মুখের ওপরে চেপে ধরে সে। কাশি থামলে সে যখন রুমালখানা সরিয়ে আনে তখন দেখা যায় যে, রুমালে রক্ত লেগে আছে। এতক্ষণ হো-সান চীনা ভাষায় কথা বলছিলো। এবার সে ইংরেজীতে বললে—"পেনিসিলিন ইনজেকশন নিতে পারলে আমি আরোগ্য লাভ করতে পারতাম। আপনাদের ওখানে পেনিসিলিন আছে কি?"

"আমাদের ওপরে যে দাওয়াই তুমি প্রয়োগ করেছিলে, "মনসিনর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—"সেই দড়ির দাওয়াইটা নিজের ওপরে প্রয়োগ করলেই তো পারতে। তাহলে নিশ্চয়ই তুমি ভালো হয়ে যেতে।"

হো-সান চীনা ভাষায় বললে—"তোমার মুখ থেকে আর একটা কথা বের হলেই আমি তোমাকে গুলি করবো।"

ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকালো সে। "পেনিসিলিন আছে কি রেক্টরীতে?"

ও'বেনিয়ন তাকালেন মনসিনরের দিকে। "ওখানে পেনিসিলিন আছে কি?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"না", মনসিনর বললেন—"ওর সাঙ্গপাঙ্গরা রেক্টরীর ডিসপেন্সারীটা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলেছে। ঔষধের শিশিগুলো ভাঙবার সময় ওরা বলেছিলো যে, ওগুলো নাকি ধর্মীয় ম্যাজিক (religious magic)। সবকিছু শেষ না করা পর্য্যন্ত ওরা ক্ষান্ত হয়নি।"

হো-সান আবার কাশতে শুরু করে। কাশির ধমকে তার

সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলে—"আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে ফাদার।"

"এটা তোমার পাপের শাস্তি।" মনসিনর বলে ওঠে—"ঈশ্বরের বিচারেই তোমার এ শাস্তি। পাপীকে তিনি এইভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন।"

"আমার কথা বলছো!" হো-সান চেঁচিয়ে ওঠে—"চুপ করো, নইলে—"

"নইলে গুলি করবে, এই তো?" মনসিনর বললেন—"করো না গুলি।"

"এই দু'জন পাদ্রীকে এখনই জেলখানায় রেখে এসো।" প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলো হো-সান।

প্রহরীদের জমাদার (Head guard) এগিয়ে আসছিলো। ফাদার ও'বেনিয়ন হাত তুলে তাকে নিরস্ত হতে বললে। তারপর হো-সানের দিকে তাকিয়ে বললেন—"শোনো হো-সান, টুং আন মিশনে পেনিসিলিন আছে। তুমি যদি মনসিনর ফিজগিবনকে ক্ষমা করো এবং ওঁর ওপরে নির্যাতন করবে না বলে কথা দাও তাহলে আমি ওখানে গিয়ে পেনিসিলিন নিয়ে আসতে পারি। মনসিনর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, উনি এখন স্বদেশে ফিরে যেতে চান। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 'ফর্লোলীভ-ও পেয়েছেন, কিন্তু এখান থেকে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই তুমি ওঁকে গ্রেপ্তার করে রেক্টরীতে বন্দী করে রাখো। আমি তোমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, এই বৃদ্ধ পাদ্রিটিকে তুমি একটু শান্তিতে থাকতে দাও। ওঁকে স্বদেশে যেতে দাও, যাতে উনি ওঁর পূর্বপুরুষদের সমাধির পাশে স্থান লাভ করতে পারেন।"

হো-সান আজ কমিউনিস্ট হলেও চৈনিক ঐতিহ্য তার মনে এখনও বিদ্যমান আছে। চীনের ঐতিহ্য হলো অন্তিমে পূর্বপুরুষদের

সমাধির পাশে স্থানলাভ করা। তার মনটা তাই একটু নরম হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয় যে, সে একজন কমিউনিষ্ট।

"পূর্বপুরুষরা তো গত হয়েছেন। তাঁদের পাশে স্থান লাভ করুন বা না করুন, তাতে কি আসে যায়!"

"এ কথা তুমি বলতে পারো না, হো-সান।" ফাদার ও'বেনিয়ন দুঃখিত স্বরে বললেন,—"তুমি কি তোমাদের মহান ঐতিহ্য ভুলে গেছো? ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।"

"ভগবান বলে কিছু নেই। আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করবো।" হো-সান বলে।

একটু থেমে সে আবার বলে—"টুং আন এখান থেকে দুশো মাইল দক্ষিণে। সীমান্ত থেকে ওখানকার দূরত্ব খুব বেশী নয়। আমি যদি আপনাকে ওখানে যেতে দিই তাহলে আপনি আর ফিরে আসবেন না।

"আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি ফিরে আসবো।" ফাদার ও'বেনিয়ন দৃঢ়স্বরে বললেন—"আমি কখনও মিথ্যে কথা বলিনে। তাছাড়া আমার ফিরে আসার ওপরে যখন তোমার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে, সেক্ষেত্রে আমার কথাটা তোমাকে মেনে নিতেই হবে। আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি এখানে ফিরে আসবে।"

"কার জীবন রক্ষার জন্যে তোমার এ ব্যাকুলতা, ও'বেনিয়ন?" মনসিনর তিক্ত স্বরে বললেন—"যে ব্যক্তি অকারণে আমাদের বন্দী করেছে এবং অকারণে আমাদের ওপরে নির্যাতন চালাচ্ছে তার জীবন রক্ষার জন্যে তোমার এ ব্যাকুলতা কেন?"

"মানুষ ভুল করে, স্যার। ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"হো-সানের মন থেকে দয়া মায়া প্রভৃতি গুণাবলী বিদায় নিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি নে। তাছাড়া, সে যাই করুক না কেন, আমি তাকে ছোটো ভাইয়ের মতোই ভালোবাসি। আমি তার জীবন রক্ষার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতে কসুর করবো না।'

ফাদার ও'বেনিয়নের মুখ থেকে ওই রকম দৃঢ়তাব্যঞ্জক কথা শুনে মনসিনর চুপ করে গেলেন।

ওঁদের মধ্যে যতক্ষণ কথা হচ্ছিলো, হো-সান ততক্ষণ চোখ বুজে ওঁদের কথাগুলো শুনছিলো। এবার সে চোখ মেলে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল—"ঠিক আছে, আমি এ ঝুঁকি নেবো। আপনি এখনই যাত্রা করুন। রেক্টরীর যে গাড়িখানা আমি পার্টির নামে বাজেয়াপ্ত করেছিলাম, সেই গাড়িতে করেই আপনি যান। আমি আপনাকে দুদিন সময় দিচ্ছি। দুদিনের মধ্যে আপনি যদি ফিরে না আসেন তাহলে মনসিনর ফিজগিবনকে আমি হত্যা করবো। আমার এ কথার কোনো নড়চড় হবে না জেনো।"

"গাড়িটা কোথায় আছে, হো-সান?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করলেন।

"এখানেই আছে।" "হো-সান বলল,—"আপনি যাতে গাড়িটা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। খরচের জন্যে কিছু টাকাও আপনাকে দিতে বলছি। আপনি এখনই রওনা হয়ে যান।"

প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে সে আবার বললে—"এই বুড়োটাকে জেলখানায় নিয়ে যাও, আর এঁকে নিচে নিয়ে গিয়ে গাড়িটা দিয়ে দাও। অফিস থেকে প্রয়োজনীয় টাকাও এঁকে দিতে বলবে।"

তিনজন প্রহরী মনসিনরকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। প্রধান প্রহরী ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বললে—"আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

॥ এগার ॥

এক ঘণ্টার মধ্যেই ও'বেনিয়ন বেরিয়ে পড়লেন গাড়ি নিয়ে। যাবার আগে মনসিনরের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। তাঁকে বললেন—"আপনি ঘুমোতে চেষ্টা করুন, স্যার। যতক্ষণ পারেন ঘুমিয়ে কাটাবেন। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবো।"

"ঘুমোতে আমি পারবো না, পিটার।" মনসিনর বলেন—"তোমার ফিরে আসার ওপরে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। তুমি যদি সময় মতো ফিরে আসতে না পারো তাহলে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করবে।"

"আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবো, স্যার।" ফাদার ওবেনিয়ন বললেন—"আমি আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমি ফিরে আসতে পারবো।"

মনসিনরের হাত ধরে তাঁর কাছে বিদায় চাইলেন ফাদার ও'বেনিয়ন। তাঁর দুই চোখ তখন অশ্রুপূর্ণ, মনসিনরের চোখও জল এলো তাঁকে বিদায় দিতে।

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসলেন ও'বেনিয়ন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গে কোনো গার্ড যাচ্ছে না। এতে তিনি মনে মনে খুশীই হলেন। চালকের আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন তিনি। এবার আর এঞ্জিন কোনো রকম বেগ দিলো না। ফাদার ও'বেনিয়ন বুঝতে পারলেন যে, সেনা-বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা গাড়িটাকে ভালোভাবে মেরামত করেছে ইতিমধ্যে। ট্র্যাঙ্কের তেলও তিনি মেপে দেখলেন যথেষ্ট পরিমাণ তেল রয়েছে ট্র্যাঙ্কে। তিনি তখন এক মুহূর্তও দেরী না করে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়িটা শহর ছাড়িয়ে গ্রাম্য পথে এসে পড়লো।

তখনও শীত শেষ হয়নি। কিন্তু যদিও আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা ছিলো, তবুও ফাদার খুশী মনেই চালাতে লাগলেন গাড়ি। গমের ক্ষেতের ওপর পাখির দল উড়ে বেড়াচ্ছে, আকাশ চমৎকার নীল, গাড়ি চলছে দক্ষিণ দিকে। বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে লাগছে তাঁর মুখে। মুক্ত প্রকৃতির এই মুক্ত হাওয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন ফাদার ও'বেনিয়ন। এখন আর তিনি জেলখানার সেলে আবদ্ধ নন। এখন তিনি নিজের ইচ্ছেয় যেখানে খুশী যেতে পারেন। কেউ তাঁকে বাধা দেবে না। আজ তিনি মুক্ত।

"এ কি লজ্জাকর চিন্তা তোমার, পিটার ও'বেনিয়ন। তুমি কি তোমার শ্রদ্ধেয় মনসিনরকে ভুলে গেছো? তিনি আজ কারাগারের সেলের মধ্যে পচচেন, আর তুমি কিনা মুক্তির আনন্দে সব কিছু ভুলে গেছো! তুমি পেনিসিলিন নিয়ে ফিরে না এলে তাঁর ভাগ্যে কি ঘটবে তা কি তুমি জানো না?"

গভীর লজ্জার সঙ্গে এই কথাগুলো মনে হলো ফাদার ও'বেনিয়নের। তাঁর মনটা দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বাইরে আসবার আনন্দে তিনি এমনই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, মনসিনরের কথা তিনি সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিলেন। তাছাড়া, সত্যি কথা বলতে কি, মনসিনরের উগ্র ব্যবহার আর উগ্রতম কথাবার্তা তাঁকে কিন্তু ওঁর প্রতি কিছুটা বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিলেন বৈকী? হো-সানের সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বললেন, তাও খুব সংযত ছিলো না। হো-সান যে ওঁকে গুলি করে হত্যা করেনি, অথবা ওকে হত্যা করার নির্দেশ দেয় নি, এটা তার পক্ষে মহানুভবতাই বলতে হবে। মানুষকে অকারণে তিক্ত করে তোলাই ওঁর স্বভাব। ধর্মযাজকের পক্ষে এটা নিঃসন্দেহে দোষনীয়। হো-সান আজ যাদের সঙ্গে রয়েছে, যে চিন্তাধারা তার মনকে আচ্ছন্ন করেছে, তাতে ধর্মের কোনো স্থান নেই। ধর্ম সমাজে কমিউনিস্টরা যে ব্যাখা করে তা হলো, ওটা

জনসাধারণের কাছে আফিংয়ের নেশার মতো। ধর্মের আফিং খাইয়ে জনসাধারণকে নেশাগ্রস্ত করে রাখে প্রতিক্রিয়াশীলরা। হো-সান আজ এই চিন্তাধারাতেই অভ্যস্থ। এইজন্যেই সে বলেছিলো যে, ভগবান বলে কিছু নেই। কিন্তু তবুত তার মন থেকে মানবিক গুণাবলী পুরোপুরিভাবে তিরোহিত হয়ে যায়নি।

ফাদার ও'বেনিয়নের মনের মধ্যে উপরোক্ত কথাগুলি বার বার এমনভাবে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিলো যে, অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দেবার মতো সময় বা ইচ্ছে তাঁর ছিলো না। হঠাৎ কি মনে করে পেছনের দিকে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন যে, গাড়িতে আরও একজন মানুষ রয়েছে, এবং সে মানুষটি হলো শিউ-লান। সে হাসি মুখে তাকিয়েছিলো ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে। লক্ষ্য করছিলো তাঁর গাড়ি চালানোর কৌশল।

শিউ-লানকে গাড়িতে দেখে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলেন ফাদার ও'বেনিয়ন। কখন এবং কিভাবে ও গাড়িতে উঠে এসেছে তা তিনি বুঝেই উঠতে পারলেন না।

"তুমি কিভাবে গাড়িতে এসে হাজির হলে?" ফাদার ও'বেনিয়ন বিরক্তি চেপে বললেন—"তোমাকে যে এখানে দেখতে পাবো তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

ফাদার ও'বেনিয়নের এই প্রশ্নের উত্তরে শিউ-লান যা জানালো তার সারমর্ম হলো, তিনি যখন গাড়িটা জেলখানার সামনে রেখে জেলের ভেতরে চলে যান, সেই সুযোগে সে চুপি চুপি গাড়িতে উঠে পেছনের সীটের নীচে লুকিয়ে থাকে। সে বুঝতে পেরেছিলো যে, ফাদার কোনো দূর অঞ্চলে যাচ্ছেন। হয়তো হো-সানই তাঁকে পাঠাচ্ছে কোনো বিশেষ কাজের জন্যে। হো-সানকে সে বিশ্বাস করে না। হয়তো ফাদারকে বিপদে ফেলবার জন্যেই এটা তার নতুন মতলব। এই কথা ভেবেই সে গাড়িতে উঠে লুকিয়ে থাকে।

শিউ-লানের কথা শুনে ও'বেনিয়ন বলেন—"আমার মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখছি।"

"না, ফাদার, আপনি স্বপ্ন দেখছেন না, "শিউ-লান বললে,—"আমি আপনার সঙ্গে যাবার উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেছি। এতে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"তোমার মধ্যে বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে দেখছি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"তার মানে?" শিউ-লান বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—"আমি কি আগের চেয়েও কুৎসিত হয়ে গেছি?"

"না, তুমি যথেষ্ট সুন্দরী," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—শুধু সুন্দরই নও," তুমি তরুণী। আমি তোমার মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছি তা হলো, তুমি আমার চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেছো। আগে তুমি কথায় কথায় হাসতে, কিন্তু এখন তোমার মুখে আর হাসি নেই। সে যাই হোক, তুমি এই গাড়িতে এসে খুবই অন্যায় করেছো। আমি এখন কি করবো সেই কথাই ভাবছি।"

ফাদার ও'বেনিয়নের কথা শুনে শিউ-লানের চোখে জল এসে গেল। "আমাকে সঙ্গে নিতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে এখানেই আমাকে নামিয়ে দিন। তাতে আমার ভাগ্যে যা হবার হবে।" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বললে শিউ-লান।

"না, আমি তোমাকে নামিয়ে দিতে চাইনে, "ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে একই গাড়িতে যাচ্ছো, এ কথাটা যদি কেউ হো-সানের কানে তুলে দেয়, অথবা মনসিনর যদি কারো কাছ থেকে শুনতে পান কথাটা, তাহলে আমার অবস্থা রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়বে। নিজে কোনো দোষ না করেও আমাকে দোষের ভাগী হতে হবে। যাই হোক, ও নিয়ে এখন আর চিন্তা করে

লাভ নেই। তুমি আসায় একদিক দিয়ে বরং ভালোই হয়েছে। আমি এখন টু-আন মিশনে যাচ্ছি। ওখানে তুমি তোমার মায়ের কাছে থাকতে পারবে। দুশো মাইল পথ হেঁটে যাওয়া তোমার খুবই কষ্টকর হতো। তাছাড়া পথে বিপদাপদও ঘটতে পারতো। আমি তোমাকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবো।"

"না, মায়ের কাছে আমি থাকবো না," শিউ-লান বললে,—"তাহলে নানা লোকে নানা কথা বলবে। আমি আপনার সঙ্গেই আবার ফিরে আসবো।"

"আমার তো মনে হয়, মায়ের কাছে থাকাই তোমার উচিত।" "ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমরা এখন জেলখানায় বন্দী। এ অবস্থায় তোমাকে কে দেখবে?"

"দেখবেন ভগবান।" শিউ-লান বললে,—"কিন্তু আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা কি করেছেন? এত দূরের পথে যেতে হলে সঙ্গে খাবার নিয়ে আসা দরকার। খাবার জিনিস এনেছেন কি সঙ্গে?"

"না, আমার সঙ্গে টাকা আছে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"খিদে পেলে পথে কোনো সরাইখানা থেকে খেয়ে নেওয়া যাবে।"

"তার দরকার হবে না।" শিউ-লান বললে,—"আমি যথেষ্ট খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনার জন্যেই এনেছি। আমি যে আপনার সঙ্গে আসতে পারবো তা ভাবিনি। তাই আপনার জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করে এনেছিলাম। গার্ডরা যদি আমাকে বাধা দিতো তাহলে তাদের ঘুষ দিয়ে খাবারের ঝুড়িটা আপনার কাছে পাঠাতাম। ঝুড়িটা আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।"

আমার প্রতি তোমার এই অনুকম্পার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।" ফাদার বললেন,—"কিন্তু কি দরকার ছিলো এত সব করবার?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শিউ-লান অন্য কথা পাড়লো।" হো-সান নাকি খুব অসুস্থ?"

"হ্যাঁ, তুমি এ খবর কার কাছ থেকে শুনলে ?"

"যার কাছ থেকেই শুনি, খবরটা কি সত্যি ?"

"হ্যাঁ, খবরটা সত্যিই।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"সে গুরুতর অসুস্থ। নিউমোনিয়া হয়েছে তার। বাঁচে কিনা সন্দেহ।"

"ওর মতো শয়তানের না বাঁচাই ভালো।" শিউ-লান বললে,—"ও মরে যাক এটাই আমি চাই।"

"আমি কিন্তু তা চাইনে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"ওর জন্যে পেনিসিলিন আনতেই আমি যাচ্ছি।"

"সে কি! যে লোক আপনাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে, তাকে বাঁচাবার জন্যে আপনার এত ব্যগ্রতা কেন ?"

"ও আমাদের ওপরে অত্যাচার করলেও আমরা ওকে শত্রু বলে মনে করি নে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—খ্রীষ্টানরা কাউকেই শত্রু বলে মনে করে না। আমাদের প্রভুর নির্দেশ হলো, 'কেউ যদি তোমাকে এক গালে চপেটাঘাত করে তাহলে অন্য গালটা তার দিকে এগিয়ে দেবে।"

"আপনি যাই বলুন না কেন, আমি ওর মৃত্যুই চাই।" শিউ-লান বললে।" ও আমার চরম সর্বনাশ করেছে। ও—"

শিউ-লানের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। তার চোখ দুটি জলে ভরে যায়। আর কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হয় না। ও'বেনিয়নের একবার ইচ্ছে হয়, ওর মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু ওকে স্পর্শ করবার মতো সাহস তাঁর হয় না। "তোমার মানসিক অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, শিউ-লান। আমি যদি মেয়ে হতাম তাহলে আমার মনের অবস্থাও বোধ হয় তোমার মতোই হতো।"... আকাশের দিকে তাকান ও'বেনিয়ন। "মাতা মেরী, তুমি নিশ্চয়ই ওপর থেকে আমাদের লক্ষ্য করছো। হে সর্বজ্ঞ মাতা, তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমাদের এই সাক্ষাৎকার নিতান্তই আকস্মিকভাবে হয়েছে।

ও যে আসবে তার বিন্দু-বিসর্গও আমি আগে থেকে জানতাম না। আমাকে তুমি ক্ষমা করো মা।"

মনে মনে এই প্রার্থনা করবার পর ফাদার ও'বেনিয়নের মনের বল ফিরে আসে। তিনি যে একজন ধর্মযাজক এ কথা বার বার তাঁর মনে হতে থাকে।

"আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে যেতে বলেছিলাম, সে কথা তুমি শোনো নি কেন?"

"না, আমি তাঁর কাছে যাইনি।" পেছনের সীটে বসে ফাদার ও'বেনিয়নের পিঠের দিকে তাকিয়ে ছিলো শিউ-লান। বাতাসে তার চুলগুলো উড়ছিলো।

ও'বেনিয়ন ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

"কিন্তু কেন?" ও'বেনিয়ন একটু রুক্ষ স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন।

"তিনি তাহলে আমাকে বাধ্য করতেন হো-সানকে বিয়ে করতে।"

কথাটা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। আর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে। ও'বেনিয়নের মনে পড়ে যায় মনসিনরের সাবধানবাণী। 'মেয়েদের চোখের জল দেখে কখনও নিজের কর্তব্য পথ হতে বিচ্যুত হবে না। মেয়েদের ওটা একটা অস্ত্র।'

"হো-সানের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় কি করে?" ও'বেনিয়ন গাড়ি থামিয়ে বলেন,—"আমার মনে পড়ছে, তুমি গেটে সেন্টিকে বলেছিলে যে, হো-সান তোমাকে রেক্টরীতে আসতে অনুমতি দিয়েছে।"

শিউ-লান চোখ তুলে ও'বেনিয়নের দিকে তাকায়। "আমি তাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম।"

"তুমি দেখছি আমাকে বিপদে ফেলবে।" ও'বেনিয়ন বললেন,—

"তুমি আজ পর্যন্ত যা যা করেছো, এটা হল তার মধ্যে নিকৃষ্টতম। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার মতো একজন তরুণীকে নিয়ে আমি এক গাড়িতে যাচ্ছি কেন, তার উত্তরে আমি কি বলবো? ভগবান আমাকে রক্ষা করুন।"

"আমি আবার লুকিয়ে পড়বো।" শিউ-লান বললে,—"কেউ যাতে আমাকে আপনার সঙ্গে দেখতে না পায় তার জন্যে আমি আগে থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করবো।"

"মানুষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারলেও ভগবানের চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না।" ফাদার ও'বেনিয়ন গম্ভীরভাবে বললেন,—"সুতরাং তোমার কি এখন আমার পাশে বসা উচিত? এতে তবুও একটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পাববো। হো-সানের সঙ্গে তোমার পরিচয় ছিলো না এবং তুমি যে মিথ্যে কথা বলেছিলে, সে কথাটা সে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিলো। আর সেই জন্যই সে তোমার সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার করেছিলো।"

শিউ-লান নিঃশব্দে সামনের সীটে এসে বসলো। ও'বেনিয়ন বললেন—"দয়া করে একটু দূরে সরে বসো।"

ফাদার ও'বেনিয়নের কথাটা শুনে মনে মনে দুঃখিত হলো শিউ-লান। কিন্তু মুখে কিছু না বলে বাঁ পাশে যতটা সম্ভব সরে বসলো। ও'বেনিয়ন আবার চালিয়ে দিলেন গাড়ি। তাঁর দৃষ্টি তখন সামনের রাস্তার দিকে। শিউ-লানের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না তিনি। মাইলের পর মাইল এইভাবেই চললো। ও'বেনিয়ন তখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। শিউ-লানের উপস্থিতি তিনি ভুলে যেতে চান। কিন্তু যতই তিনি ওকে ভুলতে চেষ্টা করছেন ততই ও যেন ওঁর মনের আসনে চেপে বসছে। ফাদার ও'বেনিয়ন তখন ওকে একজন পাপী বলে মনে করতে চাইলেন। পাপী যেমন পাপের ভয়ে ভীত হয়ে ধর্মযাজকের কাছে আসে ঈশ্বরের অনুগ্রহ

লাভের আশায়। শিউ-লানও এই উদ্দেশ্যেই এসেছে তাঁর কাছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ও তো নিজের পাপের জন্যে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে আসেনি। ও'বেনিয়ন বুঝতে পারেন, ওর মন থেকে এখনও কু-ভাব দূর হয়নি। ও তাঁকে যে কোনো পুরুষ মানুষের মতো মনে করে। ওর মনে এখনও দুর্বলতা রয়েছে ওঁর প্রতি। কিন্তু কি করা যায় ওকে নিয়ে! জোর করে তো গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া চলে না। সেটা হবে অমানুষের মতো কাজ। না, এমন কাজ তিনি করতে পারেন না।

ফাদার ও'বেনিয়ন যখন শিউ-লানের কথা চিন্তা করছেন। শিউ-লানও তখন ওঁর কথাই ভাবছে। মাঝে মাঝেই সে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওঁর দিকে। ও'বেনিয়ন কিন্তু ওর দিকে আদৌ তাকাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি তখন সামনের রাস্তার দিকে। কিন্তু তা সত্বেও শিউ-লান বুঝতে পারে ওঁর মনের কথা। মনে মনে খুশি হয় সে। নিজেকে বিজয়িনী মনে হয় তার। ও'বেনিয়ন ভালো করেই জানেন যে। শিউ-লান তাঁর পাশেই রয়েছে। তার দিকে না তাকালেও তার উপস্থিতি তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

শিউ-লান তার নিজের কথাই চিন্তা করছে। ফাদার ও'বেনিয়ন তাকে তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে বলেছিলেন বটে। কিন্তু সে তা করেনি। ইচ্ছে করেই করেনি। মনসিনর আর ফাদার ও'বেনিয়নকে জেলখানায় নিয়ে যাবার পরেও রেক্টরীতেই সে থেকে যায়। ওখানেই আত্মগোপন করে থাকে সে। তার এই অজ্ঞাত বাসের সময় রেক্টরীর দরোয়ান তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তার জন্যে খাবারও এনে দিয়েছে সে। এ কাজ সে করেছে সৈনিকদের চোখে ধুলো দিয়ে। মাঝে মাঝে শিউ-লানের ইচ্ছে হতো ও'বেনিয়নের ঘরটা দেখে আসবার জন্যে। কিন্তু সে রাতের সেই ঘটনাটার পর ও ঘরে যেতে তার ভয় হতো। মনে হতো

ওখানে গেলে হো-সান হয়তো আবার এসে তাকে বলাৎকার করবে। হো-সানের কথা মনে হতেই ওর চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হতো। ও এখন পুরোপুরি শয়তানে পরিণত হয়েছে। শয়তানটা তার কুমারী জীবনের পবিত্রতা চিরতরে নষ্ট করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতো শিউ-লান। ফাদার ও'বেনিয়ন যেভাবে চোখ বুজে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন, ঠিক সেইভাবে সেও প্রার্থনা করতো।

"হে জগৎজিতা, ওদের ক্ষমা করো। ওরা জানে না কি ওরা করছে।" প্রার্থনার সময় সর্বনাম পদটাকে ও একটু বদলে নিতো। বহুবচনের পরিবর্তে একবচন শব্দ ব্যবহার করতো সে।

গাড়িটা ইতোমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় চলবার সময় বার বার লাফিয়ে উঠেছে গাড়িটা। অনেকক্ষণ এইভাবে চলবার পর শিউ-লানের ঘুম পেয়ে যায়। ঘুমের চোখে সে একবার ও'বেনিয়নের গায়ের ওপরে পড়ে।

"দরজার দিকে সরে বসো।" কঠিন স্বরে ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন, "আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।"

ও'বেনিয়নের কথা শুনে ঘুম ছুটে যায় শিউ-লানের। মনে মনে লজ্জিত হয়ে দরজার দিকে সরে বসে। আর যাতে ঘুম না আসে তার জন্যে সে সোজা হয়ে বসে। আরও দশ মাইল পার হয়ে যায়। ও'বেনিয়ন একটা কথাও আর বলেন নি। শিউ-লানও চুপ করে থাকে। তবে চুপ করে থাকলেও মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকিয়েছে ফাদারের দিকে।

হঠাৎ কি ভেবে সে বলে উঠে—"আমরা কি নিস্পাপ নই?" (Are we not innocent ?)

"নিশ্চয়ই আমরা নিস্পাপ।" ফাদার ও'বেনিয়ন দৃঢ়স্বরে বলেন, —"অন্ততঃ আমার নিজের সম্বন্ধে এ কথাটা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি।"

"হ্যাঁ।" শিউ-লান দুঃখিত স্বরে বলে,—"আপনার দোষেই আমরা নিস্পাপ রয়েছি।" (It is altogether your fault that we are innocent.)

"ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন।" ও'বেনিয়ন বলেন,—"তোমাকেও তিনি সাহায্য করবেন, অবশ্যি তুমি যদি তাঁর সাহায্য চাও।"

"কেন আমি সাহায্য চাইবো?" বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে শিউ-লান।

প্রশ্নটা খুবই তাতপর্যপূর্ণ। এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন তা বুঝে উঠতে পারেন না, ফাদার ও'বেনিয়ন।

"প্রশ্নটা কি ঠিক হলো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

"কেন নয়।" শিউ-লান নির্লিপ্ত স্বরে বলে,—"আমি কি কোনো পাপ করেছি যে। ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো?"।

"পাপ তুমি নিশ্চয়ই করেছো।" ও'বেনিয়ন বললেন,—"এবং তুমি তা ভালো করেই জানো।"

"এবার আমার বক্তব্যটা শুনবেন কি, দয়া করে?"

"না, তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে।"

"আপনি শুনতে না চাইলেও আমাকে বলতে হবে। শিউ-লান বললে,—আমার মন আমাকে যা করিয়েছে তাই আমি করেছি। মনকে নিয়ন্ত্রন করবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"তুমি পাপ করছো, এটা ভাবতে চেষ্টা ক'রো না কেন?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

ও'বেনিয়নের কথা শুনে শিউ-লান একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—"আপনি বড্ড নিষ্ঠুর।"

ও'বেনিয়ন শিউ-লানের দিকে তাকালেন।" নিষ্ঠুরতার কি দেখলে আমার মধ্যে?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমি যা

বলছি। যাই বলেছি ধর্মযাজক হিসেবে। তুমি ভুলে যেও-না যে, আমি একজন ধর্মযাজক।"

"আপনি আমাকে পাপী বলে মনে করেন। আপনার ধারনা, আমি একজন দুঃখী মেয়ে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল শিউ-লান।

"তুমি ভুল করছো। আমি তোমাকে পাপী মনে করিনে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"আপনার এই রকমই মনে করা উচিত।" শিউ-লান বললে,—"সত্যিই আমি ভালো মেয়ে নই। আমাকে কেউ পরিচ্ছন্ন করতে পারবে না। আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আমি একেবারে মাটি হয়ে গেছি। আমার অবস্থা এখন গাছতলায় ঝরেপড়া বাসি ফুলের মতো। দেবতার পূজার এ ফুল লাগবে না। পৃথিবীর সবাই আমাকে ঘৃণা করবে। আমি নিজেও নিজেকে ঘৃণা করছি।"

ও'বেনিয়ন ব্রেক টেনে গাড়িটা থামিয়ে ফেলেন।

"আমি তোমাকে ঘৃণা করিনে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"আমার চোখে তুমি পবিত্র, সুন্দর-এবং নিষ্পাপ।···হ্যাঁ, নিষ্পাপ!"

শিউ-লান তার মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেয়। তার চোখের পাতা তখনও জলে ভেজা। কিন্তু এবার তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

"দয়া করে আর একবার বলুন, ফাদার।" শিউ-লান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে,—"আপনার কথা শুনে আমি মনে শান্তি পাচ্ছি।"

ফাদার ও'বেনিয়ন গীয়ার টেনে গাড়িটা আবার চালিয়ে যান।

"শোনো শিউ-লান, তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো। আমি তোমাকে অপবিত্র মনে করিনি। এই কথাটাই শুধু বলতে চেয়েছিলাম।"

"আপনি তাহলে বলতে চান যে, আপনি যা বলেছেন তা আপনি বলতে চাননি?"

"না, তা ঠিক নয়। আমি যা বলতে চেয়েছি তা-ই আমি বলেছি।" ফাদার ও'বেনিয়ন কিছুটা তিক্তস্বরে বললেন,—"তুমি নিজেকে যতোটা বোকা বলে আমাকে বুঝাতে চাইছো, আসলে তুমি তা নও। মানুষের কথাকে তুমি নিজের মতো করে বলে কথা ঘুরাবার কৌশল তুমি ভালো করেই জানো।"

"আপনি আশ্চর্য মানুষ।" মৃদুস্বরে শিউ-লান বলে।

ও'বেনিয়ন মনে মনে ভীত হয়ে ওঠেন। পাশে বসে একজন সুন্দরী যুবতী নারী তাকে টেনে নিতে চাইছে পাপের পথে। ও তাঁকে প্রলুব্ধ করছে। এ প্রলোভন বড়ো কঠিন প্রলোভন। তিনি তাঁর হাত দিয়ে বুকের ওপরে ক্রশ আঁকেন। তারপর সামনের গমের ক্ষেতের দিকে তাকান।

"তুমি আমাকে পুরুষ মানুষ বলে মনে করো না।" তিনি গম্ভীরভাবে বললেন।

"কিন্তু আপনি তো পুরুষ মানুষই। "শিউ-লান সওয়াল করতে চেষ্টা করে,—"আমি যখন আপনার দিকে তাকাই—"

"আমার দিকে তুমি তাকিও না।" ফাদার ও'বেনিয়ন দৃঢ়স্বরে বলেন।

"আমি যখন আপনার কথা চিন্তা করি। শিউ-লান তার কথাটা ঘুরিয়ে নেয়।

"আমার কথা তুমি চিন্তা করবে না।" ও'বেনিয়ন বলেন,—"তবুও যদি করো। তাহলে শুধু ধর্মযাজক হিসেবেই আমার কথা মনে করবে।"

"কিন্তু আপনি তো সব সময় ভালোবাসার কথা বলেন।" শিউ-লান বলে।

"হ্যাঁ বলি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"সে ভালোবাসা পার্থিব ভালোবাসা নয়। সেটা হলো ভগবানকে ভালোবাসা, পৃথিবীর সব মানুষকে ভালোবাসা।

"নারী কি পৃথিবীর মানুষদের বাইরে?" শিউ-লান বলে,—"কোনো নারীকে কি আপনি ভালোবাসেন না?"

"হ্যাঁ, বাসি বৈকি।" ও'বেনিয়ন বলেন,—"তিনি হলেন আমাদের প্রভুর মাতা, ঈশ্বরানুশ্রিতা ভার্জিন মেরী।"

শিউ-লান এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে সে। তারপর ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে,—"আমাকে কি আপনি ভার্জিন মেরী বলে ভাবতে পারেন না?"

"না," ও'বেনিয়ন দৃঢ় স্বরে বলেন,—"তা পারিনে।"

"হায়, আমি এখন কি করবো তাহলে?" শিউ-লান জিজ্ঞেস করে।

"আমি তা জানি নে।" তিনি বলেন।

এরপর অনেকক্ষণ আর কোনো কথা নেই উভয়ের মধ্যে। ফাদার ও'বেনিয়নের দৃষ্টি তখন সামনের রাস্তার দিকে। শিউ-লান তখন কাঁদছে। টপ টপ করে জল পড়ছে তার দু চোখ দিয়ে। ও'বেনিয়ন কিন্তু একবারও তার দিকে তাকাচ্ছেন না।

"আপনি এখন কি চিন্তা করছেন ফাদার?" মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলো শিউ-লান।

"আমি এখন হো-সানের কথা চিন্তা করছি।" ফাদার বললেন।

"ও শয়তানের কথা আপনি চিন্তা করবেন না।" শিউ-লান বলে।

"আমি নিশ্চয়ই তার কথা চিন্তা করবো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমি এখন বুঝতে পারছি যে, আসলে সে খুব খারাপ লোক নয়। হ্যাঁ,—তোমার প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার করা সত্বেও আমি বলতে চাই যে, হো-সান আসলে খুব খারাপ লোক নয়। কিন্তু এ কথাটা তোমাকে আমি ঠিক বুঝাতে পারবো না।"

"হ্যাঁ, আমাকে আপনি এটা কিছুতেই বুঝাতে পারবেন না।"

শিউ-লান অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে—"হো-সান ভালো। হ্যাঁ, ভালো বলেই সে আপনাদের রেক্টরীতে নজরবন্দী করে রেখেছিলো। ভালো বলেই সে গোপনের প্রার্থনা-সভা বন্ধ করে দিয়েছে। ভালো বলেই সে আপনার গাধাটা চুরি করতে গিয়েছিলো। এবং ভালো বলেই আপনাদের বন্দীসালায় আটকে রেখে আপনাদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। আমার ওপরে বলাৎকারের কথাটা না হয় না-ই বললাম।"

কথা বলতে বলতে শিউ-লানের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে থাকে।

"শোনো শিউ-লান।" ফাদার ও'বেনিয়ন গম্ভীরস্বরে বলেন,—"ওর প্রতি আমার মনে কোনো রকম দুর্বলতা নেই। তবে একটা কথা তুমি সব সময় মনে রেখো যে, কোনো সুন্দরী যুবতী যদি কোনো পুরুষ মানুষকে প্রলুব্ধ করে তাহলে তার পক্ষে সেই প্রলোভন জয় করা রীতিমত কঠিন হয়ে পড়ে।"

"আপনি কি তাহলে বলতে চান যে, আমি ওকে প্রলুব্ধ করেছিলাম?" শিউ-লান উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে।

"তুমি হয়তো জানো না কখন তুমি কোনো পুরুষ মানুষকে প্রলুব্ধ করছো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"কোনো সৎ এবং শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যখন খারাপ হয়, তখন সে হয় শয়তানের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কিন্তু অবশেষে তার মনে শুভ বুদ্ধি আবার ফিরে আসে। হো-সানের বেলাতেও এই ব্যাপারটাই ঘটেছে। সুতরাং—"

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ তিনি চুপ করে যান।

"সুতরাং বলে থামলেন কেন, ফাদার?" শিউ-লান বলে,—"কি বলতে চাইছিলেন খুলে বলুন।"

"আমার ইচ্ছে, হো-সানকে তুমি বিয়ে করো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"কি বললেন।" শিউ-লান উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে,—"আমি বিয়ে করবো ওই শয়তানকে। না, না, তা কখনও হবে না, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব, শিউ-লান?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, এতে সব সমস্যার সমাধান হবে। তুমি যদি ওকে বিয়ে করো তাহলে তোমার প্রভাবে ওর ভেতরের পশুটা পালিয়ে যাবে। তোমার সুন্দর চেহারা, বিশেষ করে তোমার ওই অনিন্দ্য সুন্দর চোখ দুটি ওকে পুরোপুরি জয় করতে পারবে।"

"না, ফাদার, আমি তা পারবো না।" শিউ-লান বলে,—"আপনি জানেন না। ও আজ আর মানুষ নয়, ও এখন পুরোপুরি শয়তানে পরিণত হয়েছে।"

"না, ও এখনও—পুরোপুরি শয়তানে পরিনত হয়নি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন, "ও আজ যে মতাদর্শকে অভ্রান্ত বলে মনে করছে, সেই মতাদর্শই ওকে সামগ্রিকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ও এখন কার্লমার্কস আর লেনিনের মতবাদ গ্রহণ করে কমুউনিষ্ট ভাবধারা গ্রহণ করেছে। কমুনিজমে ভগবান এবং ধর্ম বলে কিছু নেই। এর মূল কথা হলো, মুষ্টিমেয় লোক অগনিত গরীব মানুষদের শোষণ করে চলেছে। কমুউনিষ্টরা এই পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন করতে চায়।"

"এটা তো খারাপ কিছু নয়," শিউ-লান সন্দিগ্ধ স্বরে বলে,—"এর সঙ্গে অত্যাচার আর লাম্পট্যের সম্পর্ক কোথায় তা তো বুঝতে পারছিনে।"

"এটা বুঝা একটু কঠিন।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"আমি নিজেও এ সমন্ধে খুব বেশী পড়াশুনা করিনি। তবে ওদের ধর্মবিদ্বেশকে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারিনে। ভগবান আছেন। তিনিই সব কিছুর নিয়ন্তা। হো-সানও একদিন ওটা স্বীকার

করবে, করতে বাধ্য হবে। ভগবানকে অস্বীকার করে কেউ কোনো মহৎ কাজ করতে পারে না।"

"এ সব কথা আমি ভালো বুঝিনে ফাদার।" শিউ-লান বলে—"আপনি আমাকে শুধু বলে দিন, এখন আমি কি করবো।"

"এখন তুমি চিত্তশুদ্ধির জন্যে প্রার্থনা আর উপবাস করবে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"প্রার্থনা আর উপবাসের ফলে প্রত্যেক মানুষেরই চিত্তশুদ্ধি হয়।"

"আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, ফাদার।" শিউ-লান বলে,—"আমার চিত্ত কি অশুদ্ধ হয়ে গেছে?"

"না, এ কথা আমি আমার নিজের সম্বন্ধে বলছিলাম।" ফাদার ও'বেনিয়ন বিব্রত ভাবে বললেন।

শিউ-লান হঠাৎ চুপ করে গেল। তারপর কি ভেবে বললে—"আমি কি নান হতে পারিনে, ফাদার? তাহলে আমি আপনার কাছাকাছি থাকতে পারবো। নান হয়ে আমি অনাথ ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করতে পারবো। এবং সেইসব ছেলেমেয়েদের আপনি আমাদের মহান ধর্ম শিক্ষা দিতে পারবেন।"

"না," ফাদার বললেন,—"তুমি শুধু এই জন্যে নান হতে পারবে না। মেয়েরা নান হয় ভগবানের কাছে যাবার জন্যে; কোনো মানুষের কাছে যাবার জন্যে নয়।"

"যে ভগবানকে কেউ দেখতে পায়নি তাঁকে ভালোবাসা রীতিমত কঠিন।" শিউ-লান বলে—"আমি যদি আপনাকে ভালবাসতে পারি, মানে আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো আমি ভগবানকে ভালোবাসতে পারবো।"

"না, আমাকে ভালোবাসতে তুমি পারবে না।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"তুমি সব সময় আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে। তোমার কাছাকাছি থাকা আমার চলবে না।"

শিউ-লান বুঝতে পারে যে, ফাদার ও'বেনিয়ন তাকে মনে মনে ভালোবাসেন, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে এবং ধর্মীয় অনুশাসনের ভয়ে তিনি মুখে সে কথা প্রকাশ করতে চান না।

শিউ-লান তখন ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা আপনি যদি ধর্মযাজক না হতেন, তাহলে তো আমাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসতে পারতেন। তাই না?"

"কি হলে কি হতো বা হতে পারতো না, সে কথা চিন্তা করে কোনো লাভ নেই," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমি ধর্মযাজক, এবং চিরদিন ধর্মযাজকই থাকবো। তবে তোমার কথা ভুলবো না।"

ফাদার ও'বেনিয়নের কথাগুলো শিউ-লানের কানে যেন মধুবর্ষণ করে। সে তাই ফাদারের দিকে তাকিয়ে বলে,—"আর আমার কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, ফাদার।"

"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।" ফাদার ও'বেনিয়ন প্রায় আত্মগতভাবেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

সেই রাত্রেই টুং-আন পৌঁছে গেলেন ফাদার ও'বেনিয়ন। একটা সরাইখানার সামনে এসে গাড়ি থামালেন তিনি। ওখান থেকে তিনি কিছু খেয়ে নিতে চাইলেন। শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—"তুমিও কিছু খেয়ে নাও এখানে। গীর্জায় এখন কোনো খাবার পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।"

শিউ-লান বিনাবাক্যব্যয়ে নেমে এলো গাড়ি থেকে। ফাদার ও'বেনিয়ন তাকে সঙ্গে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকলেন। রাত তখন প্রায় দুপুর। অত রাত্রে একজন সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে একজন বিদেশী পাদ্রী সাহেবকে সরাইখানায় ঢুকতে দেখে সবাই তাকালো তাঁর দিকে।

তাদের চোখে কৌতূহলের দৃষ্টি। ফাদার ও'বেনিয়ন সোজা সরাইখানার মালিকের সামনে এসে বললেন—"দুজনের মতো খাবার হবে কি এখানে?"

"তা হবে বৈকি। আপনারা বসুন। আমি এখনই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" সরাইখানার মালিক বিনীতভাবে বললে।

ফাদার ও'বেনিয়ন তখন শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—"তুমি মেয়েদের সঙ্গে ওই টেবিলে গিয়ে বসো।"

শিউ-লানকে এই রকম নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে গিয়ে বসলেন পুরুষদের মধ্যে।

শিউ-লানকে খাবার পরিবেশন করা হলে তার পাশের মেয়েটি বললে—"তুমি বুঝি ওই বিদেশী লোকটার উপপত্নী?"

"না," শিউ-লান বললে,—"উনি একজন ধর্মযাজক।"

শিউ-লানের কথা শুনে মেয়েরা আড় চোখে ফাদার ও'বেনিয়নকে একবার দেখে নিলো। তারা জানে যে, ধর্মযাজকরা কখনও বিয়ে করেন না, অথবা কখনো উপপত্নীও রাখেন না।

একটি মেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো—"তোমার সঙ্গে ওই ধর্মযাজকের সম্পর্ক কি? তুমি তো তরুণী আর সুন্দরী। ওঁর সঙ্গে জুঠলে কেমন করে?"

"আমি আর উনি একই ধর্মাবলম্বী।" শিউ-লান বললে,—"উনি টুং-আন আসছেন শুনে আমি ওঁর কাছে প্রার্থনা জানাই যে, উনি যেন দয়া করে আমাকে ওঁর গাড়িতে করে এখানে পৌঁছে দেন। আমার বাড়ি এই অঞ্চলেই।"

কথাটা ডাহা মিথ্যে। ওর বাড়ি, মানে ওর মায়ের বাড়ি টুং-আনে নয়। কিন্তু ওর কথাটা মেয়েরা বিশ্বাস করলো। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আবার ওঁরা গাড়িতে গিয়ে বসলেন। এবার শিউ-লান বসলো পেছনের সীটে।

গীর্জায় পৌঁছে ফাদার ও'বেনিয়ন শিউ-লানকে হাসপাতালের মেট্রনের কাছে রেখে এলেন। তাকে তিনি বলে এলেন যে, আজকের রাতটা ওকে যেন হাসপাতালেই রাখা হয়। ফাদার ও'বেনিয়ন হাসপাতাল থেকে চলে গেলে শিউ-লান মেট্রনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলো। কথায় কথায় ও তাকে বললে যে, পথে সে একদল দুর্বৃত্তর কবলে পড়েছিলো। সেই সময় ফাদার গাড়ি করে সেই পথ দিয়ে আসছিলেন। শিউ লান চীৎকার করে ওঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ফাদার তখন দয়া করে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছেন।

এটাও ডাহা মিথ্যে কথা। কিন্তু এমনভাবে সে কথাগুলো বললে যে, মেট্রন তার কথা অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

রাত ভোর হতে ফাদার তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিলেন। তারপর শিউ-লানের কাছে খবর পাঠালেন প্রস্তুত হবার জন্যে। যে জন্যে তিনি এসেছিলেন সে কাজ রাত্রেই সিদ্ধ হয়েছে। ডিসপেনসারীতে তিনি প্রয়োজনীয় পেনিসিলিন পেয়ে গেছেন। পেনিসিলিনের অ্যাম্পুলগুলো সযত্নে পকেটে নিয়ে গীর্জা থেকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। শিউ-লানও বেরিয়ে এলো হাসপাতাল থেকে।

গাড়িতে উঠবার আগে ফাদার ও'বেনিয়ন আর একবার শিউ-লানকে অনুরোধ করলে তার মায়ের কাছে যেতে। কিন্তু শিউ-লান তাতে রাজী হলো না। অগত্যা আবার তাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন ফাদার ও'বেনিয়ন।

॥ বারো ॥

গভীর রাত্রে রেক্টরীর পেছনে এসে গাড়ি থামালেন ফাদার ও'বেনিয়ন। শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে তিনি বললেন—"তুমি কি এখানেই নেমে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ, আমি ওই বাঁশগুলোর সাহায্যে সহজেই ভেতরে ঢুকতে পারবো।" শিউ-লান বললে।

"তা হয়তো পারবে," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু এখানে একা থাকা কি ঠিক হবে তোমার পক্ষে?"

"কেন হবে না।" শিউ-লান বললে,—"এখানকার দরোয়ান আমাকে সব রকমে সহায়তা করে। আমার কোনো অসুবিধে হবে না এখানে।"

"আমার কিন্তু মনে হয়, এখানে থাকার চেয়ে তোমার মায়ের কাছে যাওয়াই উচিত।"

"আমি তো আপনাকে বলেছি যে, ওখানে আমি যাব না।" শিউ-লান বললে।

"এখানে তুমি কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে? ওরা যদি জানতে পারে তুমি এখানে লুকিয়ে আছো তাহলে তোমার নিশ্চয় বিপদ হবে। তার চেয়ে তোমার মায়ের কাছে যাওয়াই উচিত।"

"অত দূরের পথ একা একা যেতে-সাহস হয় না আমার," শিউ-লান বলে,—"তাছাড়া দুশো মাইল হেঁটে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"হেঁটে যাবে কেন?" ফাদার ওবেনিয়ন বলেন,—"আমার গাধাটায় চড়ে যেতে পারবে।"

"গাধা তার পিঠে কোন মেয়েকে নেয় না, এটা কি আপনি জানেন না ?"

"তাই তো; কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"তুমি তাহলে এবার ভেতরে যাও, আমি হো-সানের কাছে যাচ্ছি।"

যখন ফাদার ও'বেনিয়ন হো-সানের কাছে হাজির হলেন তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। হো-সান তাঁকে দুই দিন সময় দিয়েছিল। কিন্তু দুই দিন, শেষ হবার আগেই তিনি হাজির হলেন তার কাছে।

হো-সান তখন বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করছিলো। ও'বেনিয়নকে দেখে সে বিস্মিত কণ্ঠে বললে—"আপনি তাহলে সত্যিই ফিরে এলেন !"

"আমি ফিরে আসবো বলে কথা দিয়েছিলাম," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"সে কথা আমি রেখেছি।"

হো-সানের বিছানার ওপড়ে বসে পড়লেন ফাদার।

"আমি কিন্তু ভাবতেও পারিনি যে, আপনি আবার এখানে ফিরে আসবেন।" হো-সান বললে,—"আমার মনে হচ্ছে, জেলখানার ওই বুড়ো পাদ্রীর জীবন রক্ষার তাগিদেই আপনি ফিরেছেন। আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনি না ফিরলে বুড়োকে হত্যা করা হবে; এই কারণেই আপনি ফিরেছেন, তাই না ?"

"মনসিনরের জন্যে আমি চিন্তিত ছিলাম ঠিকই," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু তিনি যদি এখানে না থাকতেন তাহলেও আমি ফিরে আসতাম।"

"কার জন্যে ?" হো-সান জিজ্ঞেস করে।

"তোমার জন্যে।" ওবেনিয়ন বলেন।

"আপনি আমাকে এই কথা বিশ্বাস করতে বলছেন!" হো-সান বলে।

"বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। "ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"আমি কখনও মিথ্যে কথা বলিনে। যাই হোক এবার কাজের কথা শোনো। আমি পেনিসিলিন নিয়ে এসেছি।"

হো-সান মনে মনে খুশী হলো কথাটা শুনে। ফাদার ও'বেনিয়ন যে তার জীবন রক্ষার জন্যে চারশো মাইল পথ যাতায়াত করে পেনিসিলিন নিয়ে আসবেন, এটা সে ভাবতেও পারেনি। সে ভেবেছিলো যে টুং-আন থেকে ও'বেনিয়ন আর ফিরবেন না। জায়গাটা সীমান্ত অঞ্চলের কাছাকাছি। সীমান্ত রক্ষারও তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ওখান থেকে সীমান্ত পার হয়ে পালিয়ে যাওয়া খুবই সহজ। মনসিনরের জীবন রক্ষাই যদি এঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তাহলে পেনিসিলিন না আনতেও পারতেন। ফিরে এসে বলতে পারতেন যে, পেনিসিলিন পাওয়া যায় নি। এইসব কথা চিন্তা করে হো-সান বললে—"আপনার এই মহানুভবতার জন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ; যাই হোক ইনজেকশান দেবার কি ব্যবস্থা হবে বলুন তো? ইনজেকশান কি আপনিই দেবেন?"

"হ্যাঁ, আমিই দেবো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,— "হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি। এখন শুধু দরকার একটু অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল বা রেকটিফায়েড স্পিরিট।"

"ও জিনিস তো এখানে পাবেন না; দেশী মদে কাজ হবে কি?" হো-সান জিজ্ঞেস করলো।

"অগত্যা তাতেই কাজ চালাতে হবে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"তুমি কাউকে দিয়ে একটু মদ আনিয়ে দাও। ওটা এখনই পাওয়া যাবে কি?"

"তা যাবে। আপনি একটু বসুন, আমি এখনই এক বোতল ধেনো মদ আনিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে একজন গার্ডকে ডাকলো হো-সান। গার্ড এলে তার দিকে তাকিয়ে হো-সান বললে—"তুমি এক বোতল মদ এনে এঁকে দাও।"

গার্ড চলে যেতেই ফাদার ও'বেনিয়ন পেনিসিলিনের অ্যাম্পুল ডিস্টিল্ড ওয়াটারের অ্যাম্পুল আর সিরিঞ্জ-বাক্সটা পকেট থেকে বের করে হো-সানের মাথার কাছের টেবিলের ওপরে রাখলেন। ছোটো এক বাণ্ডিল বরিক কটনও নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ওটাও বের করে টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন। এরপর তিনি বাথরুমে গিয়ে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক বোতল ধেনো মদ নিয়ে ফিরে এলো গার্ড। ফাদার ও'বেনিয়ন তখন ইনজেকশান দেবার তোড়জোড় শুরু করলেন। সিরিঞ্জে সূঁচ ফিট্ করে মদের সাহায্যে ভালো করে পরিস্কার করে নিলেন। এরপর সিরিঞ্জে ডিস্টিল্ড ওয়াটার নিয়ে সেটাকে পেনিসিলিনের শিশির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। শিশিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ঝাঁকানি দিতেই পেনিসিলিনের গুড়োগুলো জলের সঙ্গে মিশে গেল। এরপর সিরিঞ্জে ঔষধ ভরতি করে নিয়ে তুলোর বাণ্ডিল থেকে কিছুটা তুলো নিয়ে সেটাকে মদে ভিজিয়ে হো-সানের হাতের ওপরের দিকে একটা জায়গা ঘসে পরিষ্কার করে সেখানে সূঁচ ঢুকিয়ে ইনজেকশান দিলেন। সূঁচটাকে টেনে বের করে নিয়ে আর একবার মদের সাহায্যে সিরিঞ্জটাকে পরিস্কার করে নিয়ে সূঁচ খুলে সিরিঞ্জটাকে বাক্সে ঢুকিয়ে রাখলেন।

ইনজেকশান দেবার কাজটা ফাদার ও'বেনিয়ন ভালোই জানেন। এটা তিনি শিখেছিলেন আয়ারর্ল্যাণ্ডে থাকতেই। ধর্মযাজক হিসেবে অ্যাবিতে ঢুকবার পর তাঁকে নানাভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেইসব শিক্ষার মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যাও অন্যতম।

প্রায় এক বছর হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে থেকে ড্রেসিং এবং ইনজেকশন দেবার কাজ তিনি ভালোভাবেই শিক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, ছোটো-খাটো রোগের চিকিৎসা যাতে তিনি নিজেই করতে পরেন সে শিক্ষাও তাঁকে দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে যখন টুং-আন মিশনে পাঠানো হয়, তখন ওখানে তিনি একটি ক্লিনিক খুলে রোগীদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করতে থাকেন! দশ শয্যার একটি হাসপাতালও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ওখানে। এই কারণেই তিনি সুদক্ষ ডাক্তারের মতো ইনজেকশন দিতে পারলেন হো-সানকে।

ইনজেকশন দেওয়া হয়ে গেলে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে হো-সান বললে—"আমার আরোগ্যের গ্যারান্টি দিতে পারেন কি?"

"না, গ্যারান্টি আমি দিতে পারি নে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"এটা ভগবানের হাতে। ভগবানের দয়া হলে তুমি নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ করবে।"

হো-সান্ অস্থিরভাবে বিছানার ওপরে এপাশ-ওপাশ করছিলো। ফাদার ও'বেনিয়ন তার বিছানার পাশে একটা টুলের ওপরে বসে তাকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি জানেন যে, অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গেই হয় না। ইনজেকশনের ক্রিয়া শুরু হবে ঘন্টা খানেক পর থেকে। তিনি তাই টুলে বসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন হো-সানের আরোগ্যের জন্যে। তাঁকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে হো-সান বললে—"আমার অসুখের এখনও উপশম হয় নি। আমার মনে হচ্ছে ইনজেকশনে কাজ হবে না।"

"ইনজেকশনের সঙ্গে সঙ্গেই কি অসুখ সেরে যাবে!" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"অন্ততঃ পাঁচটি ইনজেকশন তো লাগবেই।"

"কিন্তু আমার শরীরের যন্ত্রণা তো বেড়ে গেছে ইনজেকশন দেবার পর।"

"এটা তোমার মানসিক প্রতিক্রিয়া।"

ফাদার ও'বেনিয়ন চেয়ার থেকে উঠে বাসিনের ভেতরে এক কলসী ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। তারপর সেই জলে একখানা তোয়ালে ভিজিয়ে জলটা নিংড়ে নিয়ে সেই তোয়ালে দিয়ে হো-সানের মুখ এবং হাত ভালো করে মুছে দিলেন।

"আপনি আমার জন্যে এতসব করছেন কেন বলুন তো?" হো-সান বললে,—"আপনি তো আমাকে ঘৃণা করেন।"

"কে বললে আমি তোমাকে ঘৃণা করি?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমি তোমাকে আদৌ ঘৃণা করিনে। বরং আমি তোমাকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসি।"

"ভালোবাসা!" হো-সান তিক্ত হাসি হেসে বললে,—"খ্রীষ্টানরা সব সময় এই কথাটাই বলে থাকে বটে।"

ফাদার ও'বেনিয়ন আর একবার ভিজে তোয়ালে দিয়ে হো-সানের কপাল আর ঘাড়টা মুছে দিচ্ছিলেন। মুছতে মুছতে তিনি বললেন—"ভগবানের প্রতি তোমার যদি এখনও বিশ্বাস থাকে তাহলে তুমি আমার কথাটা নিশ্চয়ই বুঝবে? ভালোবাসাই মানুষের মন থেকে হিংসা, দ্বেষ এবং ঘৃণাকে দূর করে দেয়।"

"আমি কারো ভালোবাসা চাইনে।" হো-সান কিছুটা রুক্ষ স্বরে বললে—"আমাকে কর্তব্য পালন করতে হবে। এবং সে কর্তব্য, হলো রাষ্ট্রের প্রতি আমার কর্তব্য।"

ফাদার ও'বেনিয়ন তোয়ালেখানা আর একবার ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে হো-সানের মুখ-হাত মুছে দিচ্ছিলেন। মুছাতে মুছাতে তিনি বললেন :

"রাষ্ট্র বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছো? আসলে ওটা কিছুই নয়। ওটা একটা মানসিকতা, একটা কল্পনা—মনহীন, হৃদয়হীন একটা কল্পনার বস্তু ওটা—আসলে ওটা হলো মানুষের সৃষ্ট একটা

সংগঠন (organization)। তুমি যদি ভগবানকে স্মরণ করতে না চাও, তাহলে নিজের মা বাপকে স্মরণ করো। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করো, তোমার শৈশবকালে তাঁরা কি রকম ভালোবাসতেন তোমাকে।"

"ভালোবাসতেন! ফুঃ! তাঁরা আমাকে পথের ধুলোয় ফেলে রেখে সরে পড়েছিলেন।" হো-সান তিক্তকণ্ঠে বললে।

ছেলেবেলার কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে হো-সানের। সে চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে তার শৈশবকালের কথা। পথের ধারে দাঁড়িয়ে সে তার মা বাবার জন্যে কাঁদছিলো। শত শত অচেনা নরনারী তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছিলো না। সব কথা ভালোভাবে মনেও পড়ে না তার। শুধু মনে পড়ে, সে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কয়েক বছর পরে মনসিনর তাকে দুজন চাষীর সঙ্গে পরিচিত করে দেন। একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক। ওরা তাকে বলেছিলো যে, ওরা তার বাপ মা। ওরা তাকে আলিঙ্গনও করেছিলো। ওদের চোখে জলও দেখেছিলো সে। কিন্তু হো-সানের মনে কোনো রকম ভাবান্তর দেখা দেয়নি।

"আমার মনে হয়, তাঁরা তোমাকে পরিত্যাগ করেননি।" ফাদার ও'বেনিয়ন স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন,—"তাঁরা তোমাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তখনকার বিরাট উদ্বাস্তুর ভীড়ে এটা অস্বাভাবিক ছিলো না। অথবা এমনও হতে পারে যে, তাঁরা খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। তোমাকে খুঁজবার মতো মনের অবস্থা তাঁদের ছিলো না। এই অবস্থায় মনসিনর তোমাকে পথ থেকে এনে লালন-পালন করেন। পরবর্তীকালে তোমার খোঁজ পেয়ে তাঁরা তোমার কাছে ফিরে এসেছিলেন।"

হো-সান তাঁর কথাগুলো চুপ করে শুনে গেল। তারপর মা-বাবা

কেন এবং কিভাবে তাকে হারিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আজ তার কোনো মাথাব্যথা নেই। হয়তো তাঁরা ওর খোঁজ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত রেক্টরীতে তার সন্ধান পেয়েছিলেন। হো-সান ভালোভাবেই জানে যে, অনেক বাপ মা-ই খেতে না পেয়ে সন্তান পরিত্যাগ করেছিলো তখন। বৌদ্ধ মন্দির হতে যে সামান্য পরিমান খাদ্যশস্য ডোল হিসেবে দেওয়া হতো তাতে তাদের নিজদেরই পেট ভরতো না। খিদের জ্বালা বড়ো জ্বালা। খিদের জ্বালায় মানুষ হারিয়ে ফেলে দয়া মায়া স্নেহ এবং ভালোবাসা। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সন্তান বিক্রির ইতিহাসও তার অজানা নয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বুভুক্ষু মানুষদের যে ডোল দিতেন তার পেছনেও স্বার্থ ছিলো। সামান্য ডোল দিয়ে তারা শত শত নরনারীকে তাঁদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চাইতেন। গরিব মানুষদের এইভাবে 'এক্সপ্লয়েট' (exploit) করার ইতিহাস শুধু চীনে নয়, সারা দুনিয়াতেই এটা দেখতে পাওয়া যায়।

হো-সানকে ভাবতে দেখে ফাদার ও'বেনিয়ন আবার বলেন—"পৃথিবীতে অন্য রকম ভালোবাসাও আছে। এটা হলো নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা। যে নারীকে একদিন তুমি বিয়ে করবে এবং যে তোমাকে উপহার দেবে তোমার বংশধর—তাকে এবং তার সন্তানকে তুমি নিশ্চয়ই ভালোবাসবে। তার সন্তান হবে তোমারও সন্তান। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। রাজনৈতিক মতাদর্শ এখানে অচল। সুতরাং ভালোবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ভালোবাসা না থাকলে মানুষের জীবন হয়ে উঠে মরুভূমির মতো।"

হো-সানকে এই সব কথা বলতে গিয়ে তাঁর নিজের কথা মনে হয়। তিনি হো-সানকে যে সব কথা বলছেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো রকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। ধর্মযাজকের কাজ নেবার পর

বিবাহ ও নারী সঙ্গলাভের কথা মন থেকে চিরতরে বিদায় করে দিতে হয়েছে তাঁকে। এইমাত্র হো-সানকে তিনি যে কথা বললেন, তাঁর নিজের হৃদয়ও ঠিক সেইভাবে মরুভূমি হয়ে গেছে। নইলে···

আর তিনি নতুন কিছু বলতে পারলেন না। হো-সান তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে তার বুকের ওপরে একটা কাল্পনিক ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দ্রুতপদে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ তের ॥

মনসিনর ফিজগিবন তাঁর সেলে বসে ছোট্ট একখানা ধর্মগ্রন্থ পড়ছিলেন। বইখানা তিনি তাঁর জামার হাতার ভেতরে লুকিয়ে এনেছিলেন। বেলা তখন প্রায় দশটা। এই সময় শিউ-লান একটা ঢাকা দেওয়া ঝুড়ি হাতে করে তাঁর সেলের ভেতরে প্রবেশ করলো। ঝুড়িটা খুলে তার ভেতর থেকে দুটি বড়ো সাইজের পাত্র বের করে টেবিলের ওপরে রাখলো। একটাতে রয়েছে মাংসের কারি এবং অন্যটায় রয়েছে ভেজিটেবল স্ট্যু। পাত্র দুটো টেবিলের ওপরে রাখবার পর সে মনসিনরের দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে বললে— "খাবারগুলো আমি নিজের হাতে রান্না করে এনেছি, স্যার। আপনি দয়া করে গ্রহণ করলে আমি বাধিত হবো।"

মাংসের কারির সুগন্ধ নাকে আসায় মনসিনর বেজায় খুশী হলেন। অনেকদিন তিনি ভালো খাবার খেতে পাননি। জেল-খানায় তাঁকে লুপসী জাতীয় যে খাদ্য দেওয়া হয় তা যেমন বিস্বাদ, তেমনি দুর্গন্ধ। ওই বিশ্রী খাবার খেয়েও তাঁর শরীর ভেঙে পড়েনি। এখনও তিনি যথেষ্ট পরিমানে খেতে পারেন। ভালো খাবার পেলে তো কথাই নেই। তখন তিনি গোগ্রাসে খেতে থাকেন। চিরদিনই

তিনি ভোজনবিলাসী। ভালো খাবার দেখলে তাঁর জিভে জল এসে যায়। তাই শিউ-লান যখন গরম গরম মাংসের কারী আর ভেজিটেবল স্যুপ টেবিলের ওপরে সাজিয়ে দিলো, তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

"বৎসে! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করুন এবং বিপদাপদ হতে রক্ষা করুন। কি কি খাবার এনেছো, বৎসে? না, না, বলবার দরকার নেই, আমি খুলে নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছি। আহা! মুরগীর মাংস! টাট্‌কা বাঁধা কপির স্যুপ! দইও এনেছো দেখছি। কী আশ্চর্য! মদও এনেছো! তোমাকে যে কি বলে আশীর্বাদ করবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি নে। আজ বোধহয় বৃহস্পতিবার। তাই নয়? বার ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার। লালফৌজ একটা ক্যালেণ্ডারও রাখেনি এ ঘরে।"

শিউ-লান মৃদু হেসে বললে,—"আপনি খেতে শুরু করুন, স্যার।"

"হ্যাঁ, খাচ্ছি।" হঠাৎ ও'বেনিয়নের কথা মনে হলো তাঁর। তিনি তাঁকে কথা দিয়ে গেছেন যে, বৃহস্পতিবারেই তিনি ফিরে আসবেন। মনসিনয়রের মনে হলো, হয়তো এখনই তিনি এসে পড়বেন। কিন্তু তাঁর জন্যে তিনি অপেক্ষা করতে চাইলেন না।

"ফাদার ও'বেনিয়নের জন্যে আমি অপেক্ষা করবো না," মনসিনর বললেন,—"তার অপেক্ষায় থেকে খানা ঠাণ্ডা করবার কোনো মানে হয় না। গরম থাকতে থাকতেই আমি খেতে চাই।"

এই কথা বলেই তিনি খেতে বসে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যুপ আর মাংসের পাত্র খালি হয়ে গেল। এবার তিনি দইটা খেতে লাগলেন। খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর মুখের তৃপ্তিভরা ভাব লক্ষ্য করে শিউ-লান ভাবলো, এখনই তার বক্তব্য পেশ করবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। মনসিনর তখন মদের পাত্র হাতে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে মদ পান করছেন। শিউ-লান তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ্য করছে।

"মনসিনরকে !"—কি বলতে গিয়ে থেমে গেল সে।

"আমাকে কিছু বলতে চাও?" মনসিনর স্নেহ পূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি আপনার কাছে স্বীকারোক্তি করতে চাই।" মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে শিউ-লান বললে।

পুরুষ মানুষের, বিশেষ করে ধর্মযাজকদের মনে কি ভাবে অনুকম্পার ভাব সৃষ্টি করা যায় তার কলাকৌশল ভাল করেই জানে শিউ-লান। সে মাথা নিচু করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন সঙ্কোচে তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হচ্ছে না। এতে তার সুন্দর মুখখানা যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তার আনত চোখ দুটোতে ফুটে উঠেছে লজ্জার চিহ্ন।

"তুমি নির্ভয়ে স্বীকারোক্তি করো, বৎসে !" মনসিনর বললেন,—"আমি তোমাকে মুক্তি দেবো। (I will grant you absolution) তুমি আমাকে যে রকম আনন্দ দিয়েছো তাতে তোমাকে অদেয় কিছু নেই আমার। তুমি যদি ঘোরতর পাপের কাজও করে থাকো তবুও সে পাপ তোমাকে আর স্পর্শ করবে না।"

"আমি জ্ঞানত কোনো পাপ করিনি, স্যার," শিউ-লান মৃদুস্বরে বললে, "আমি আজ আপনার কাছে যে স্বীকারোক্তি করতে যাচ্ছি তা পাপ হতে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে নয়।"

মনসিনর বিস্মিত হলেন তার কথা শুনে, পাপ করে নি, অথচ স্বীকারউক্তি করতে চায়—এ আবার কি কথা! এ রকম কথা মনসিনর আগে কোনোদিন শোনেননি। তিনি তাই শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে বললেন—"তুমি হয়তো মনে করছো যে তুমি কোনো পাপ করোনি। কিন্তু পাপ না করলে স্বীকারোক্তি করার কোনো প্রয়োজনই হয় না। তুমি স্বীকারোক্তি করতে চাইছো এর একমাত্র অর্থ হলো কোনো না কোনো ভাবে তোমার দ্বারা এমন কোনো কর্ম

অনুষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মের চোখে যা পাপ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু বৎসে! তুমি যদি অনুতপ্তা হয়ে স্বীকারক্তি করো, তাহলে ভগবানের আশীর্বাদে তুমি সে পাপের ফলভোগ করবে না।"

"আমি অনুতপ্ত হইনি স্যার" শিউ-লান বললে—"অনুতাপ করবার মতো কোনো কাজ আমি করিনি। (I have nothing to repent of)

"তোমার মনে তাহলে কোনো পাপ-চিন্তা এসে স্থানলাভ করছে বোধ হয়।" মনসিনর বললেন।

"না মনসিনর।" শিউ-লান বললে—"আমার মনে কোনো পাপ চিন্তা নেই। আমি আজ সুখী। আমার সারা দেহ-মনে আজ আমি সুখ অনুভব করছি।"

"তাই যদি হয়," মনমিনর বললেন, "অর্থাৎ তুমি যদি কোনো পাপ না করে থাকো, কোনো পাপ চিন্তা যদি তোমার মনে এসে স্থানলাভ না করে থাকে, এবং তোমার মনে যদি সুখ অনুভব করো তাহলে স্বীকারোক্তির কি প্রয়োজন?"

শিউ-লান এবার চোখ তুলে তাকালো মনসিনরের মুখের পানে।

"প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যখন মেরীমাতার দেহের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর মনের মধ্যে স্বর্গীয় সুখের যে অনুভূতি জেগেছিলো, আমার মধ্যেও ঠিক তেমনি অনুভূতি জেগেছে স্যার।" শিউ-লান বলল, "আমার দেহেও পবিত্র আত্মা প্রবেশ করেছে।"

মনসিনর আঁতকে ওঠেন কথাটা শুনে। "চুপ করো।" তিক্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, "মেরী মাতার সঙ্গে তুমি নিজেকে তুলনা করতে চাও, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়!"

"কিন্তু আমার অবস্থা তো ঠিক তাঁরই মতো।" শিউ-লান জোরের সঙ্গেই বলে কথাটা।

"তুমি তাহলে বলতে চাও……" মনসিনর মুখে আটকে যায় কথাটা।

"হ্যাঁ," শিউ-লান মাথা নত করে বলে,—"আমার গর্ভে সন্তান এসেছে।"

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান মনসিনর। এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কী ভয়ঙ্কর কথা! মেয়েটি অন্তঃস্বত্তা! কার দ্বারা—কে করতে পারে এ কাজ? —তবে কি……"

ঠিক এই মুহূর্তে ফাদার ও'বেনিয়ন প্রবেশ করেন সেলের মধ্যে। কর্তব্য কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে খুশীর ভাব। তাঁর সদানন্দময় মুখে পাপের অথবা অনুশোচনার কোনো চিহ্নই নেই। মনসিনর কিন্তু তাঁকে দেখেই মনে মনে জ্বলে উঠলেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি ও'বেনিয়নের মুখের দিকে তাকালেন।

"ফাদার ওবেনিয়ান!" অস্বাভাবিক কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

"কি বলছেন, মনসিনর?" তাঁর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

"ঠিক সময়েই তুমি এসে পড়েছো," মনসিনর আগের মতোই উচ্চকণ্ঠে বলেন—"হ্যাঁ ঠিক সময়েই তুমি এসেছো!"

"শিউ-লান এখানে কেন?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করলেন।

"ও আমার কাছে এসেছে একটা দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করতে।" রুক্ষকণ্ঠে মনসিনর বললেন।

"কি হয়েছে বলুন তো!" ফাদার ও'বেনিয়ন সংযতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

"তুমি ওকে দেখে ভয় পাচ্ছো, তাই না?" মনসিনর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন।

এতক্ষন ওঁরা ইংরেজীতে কথা বলছিলেন। এবার ও'বেনিয়ন শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে চীনা ভাষায় বলেন।

"মনসিনরকে তুমি কি বলেছো, শিউ-লান?"

"আমি শুধু বলছি যে, আমায় দেহ মনের অবস্থা এখন মেরী মাতার মতো। এই কথা শুনেই উনি রেগে গেছেন।" শিউ-লান বললে।

শিউ-লান কি বলতে চায় তা বুঝতে দেরী হলো না ফাদার ও'বেনিয়নের। গর্ভে সন্তান এলে চীনা মেয়েরা মনে মনে সুখানুভব করে, তা তিনি জানেন।

"এটা কি করে সম্ভব!" ফাদার ও'বেনিয়ন বিস্মিত কণ্ঠে বলেন,—"এখন তাহলে তুমি কি করতে চাও?"

এমন করুণ ভাবে তিনি কথাগুলো বললেন যাতে মনসিনরের মনে হলো যে, ও'বেনিয়ন নিজের পাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

"ও কি করবে সে কথা পরে হচ্ছে," মনসিনর সাপের মতো ফোঁস করে ওঠেন,—"আমি জানতে চাই, তুমি এখন কি করবে, হতভাগ্য ধর্মযাজক। (wretehed prist.)

ফাদার ও'বেনিয়নের মনে কোনো রকম সন্দেহ বা ঘোরপ্যাঁচ ছিলো না। তিনি তাই মনসিনরের রাগের কারণ অনুধাবন করতে পারলেন না। হয়তো শিউ-লান ওঁকে এমন কিছু বলেছে, যার ফলে মনসিনর তাঁর ওপরে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। হয়তো ও বলেছে যে, ওঁর সঙ্গে একই গাড়িতে ও টু-আন পর্যন্ত গিয়েছিলো। তিনি যে হো-সানের জন্যে পেনিসিলিন আনতে টু-আন মিশনে যাচ্ছিলেন সে কথা ও হয়তো দরোয়ানের কাছ থেকে শুনতে পেয়েছিলো। ও হো-সানের মৃত্যু কামনা করেছিলো। তিনি যাতে হো-সানের জীবন রক্ষা না করেন সে অনুরোধও ও করেছিলো। কিন্তু তাঁকে ও প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি। ও তখন তাঁকে প্রলোভনের জাল

ফেলে ওর মনের বাসনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলো। এবং সেই উদ্দেশ্যেই ও গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে ছিলো।

হায় হতভাগিনী! ও জানে না যে, ধর্মপ্রাণ ও'বেনিয়নকে ও পাপের পথে টেনে নিতে পারবে না। ও নানাভাবে চেষ্টা করেছে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে। হো-সান মরুক এটাই ও চেয়েছিলো। এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ও প্রেমের ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলো তাঁকে। কিন্তু এ ব্যাপারে অকৃতকার্য হয়ে আজ ও এসেছে মনসিনরের কাছে। প্রেমের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ও এখন বিষধর সাপিনীর মতো তাঁকে দংশন করতে এসেছে। ফাদার ও'বেনিয়ন ওকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কোনো মেয়ে যখন কোনো পুরুষের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাতা হয় তখন সে হয়ে ওঠে আরও উদ্দাম। তার মনের প্রেম বা ভালোবাসা তখন রূপান্তরিত হয় অসীম ঘৃণায়। সে তখন সেই পুরুষকে ধ্বংস করতে চায়। এই পন্থাই হয়তো ও গ্রহণ করেছে।

ও জানে যে, ফাদার ও'বেনিয়ন মনসিনরকে ভয় করেন। ও আরও জানে যে, মনসিনর একটু লোভী প্রকৃতির। ভালো খাবার পেলে তিনি খুশী হয়ে ওঠেন। এই কথাটা জানা থাকায় ও আজ ভালো ভালো খাবার এনে মনসিনরকে খাইয়ে খুশী করেছে। এই খাবার ও সহজে এবং সোজা পথে আনতে পারেনি। ও কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে খাবার নিয়ে মনসিনরের সেলে ঢুকেছে। এই ভাবেই ও ওর মতলব হাঁসিল করতে চেয়েছে। ফাদার ও'বেনিয়নকে ও পেতে চায়। কিন্তু ও যখন বুঝতে পারে যে, যতদিন তিনি ধর্মযাজক থাকবেন ততদিন ওর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, তখন ও মনে মনে একটা সাংঘাতিক মতলব স্থির করে। ওর মনে হয়, ও যদি কোনো রকমে মনসিনরকে বুঝাতে পারে যে, ফাদার ও'বেনিয়নের দ্বারাই সে গর্ভবতী হয়েছে, তাহলে তিনি ওর দেহ থেকে ধর্মযাজকের পোশাক

কেড়ে নিয়ে ওঁকে দূর করে দেবেন। এবং তারপর ও'বেনিয়ন পরিণত হবেন সাধারণ মানুষে। এরপর ওকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে আর কোনো বাধা থাকবে না ওঁর। এই রকম দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হয়েই ও ওর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। এবং তাতে অনেকটা সাফল্যও অর্জন করেছে। মনসিনরকে ও বুঝাতে পেরেছে যে, ও'বেনিয়ন ধর্মযাজক হবার উপযুক্ত নয়।

ফাদার ও'বেনিয়ন যখন চুপ করে দাঁড়িয়ে এইসব কথা চিন্তা করছেন, তখন মনসিনর স্থির দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করছেন।

মনসিনর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকালেন।

"বার বার তোমাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি এই মেয়েটার সঙ্গে মিলিত হয়েছো," মনসিনর ক্রুদ্ধস্বরে বললেন,— "শুধু তাই নয়, তুমি এর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করেছো। তুমি কি জান না, এ মহাপাপের শাস্তি কি? তুমি ধর্মযাজক থাকবার উপযুক্ত নও!"

"থামুন!" অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন ফাদার ও'বেনিয়ন। মনসিনর ভাবতেও পারেননি যে, তার সামনে দাঁড়িয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন এই রকম অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি তাই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান তাঁর দিকে। "তুমি কি বলতে চাও—তুমি দোষী নও?" মনসিনর আমতা আমতা করে বলেন কথাগুলো।

"হ্যাঁ, এই কথাই আমি বলতে চাই।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"তাহলে কার দ্বারা এটা হয়েছে?" মনসিনর বললেন—"কে ওর গর্ভস্থ সন্তানের পিতা?"

"যে-ই হোক না কেন, আমি নই।' ও'বেনিয়ন দৃঢ় স্বরে বললেন।

"মুখে অস্বীকার করলেই হবে না," মনসিনর কঠিন হয়ে উঠলেন,—"তোমাকে বলতে হবে, কার দ্বারা এটা হয়েছে। আমার মন বলছে। তুমি এটা জানো। ওই মেয়েটা সব সময় তোমার পেছনে ঘুরঘুর করতো। তুমিও ওকে আস্কারা দিতে! এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

ফাদার ও'বেনিয়ন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন শিউ-লানের দিকে।

"শোনো শিউ-লান!" ফাদার ও'বেনিয়নের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক-ভাবে দৃঢ়। "আমি নানাভাবে তোমাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে এসেছি এতদিন। আমি জানতাম, তুমি আমাকে পেতে চাইতে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তুমি দুশো মাইল পথ ভেঙে এখানে এসে হাজির হয়েছিলে। এখানে এসে তুমি নানা রকম ছল-ছুতা করে রেক্টরীতে ঢুকেছিলে। তুমি ভেবেছিলে, তোমার প্রলোভনে আমি ভুলে যাবো। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝেছিলে। অন্য কোনো যুবক হলে তাকে হয়তো তুমি সহজেই তোমার মুঠোর মধ্যে আনতে পারতে। কিন্তু আমাকে তুমি জয় করতে পারোনি। আমি তোমাকে ধর্মপথে আনতে চেয়েছিলাম। এবং এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমি সদয় ব্যবহার করতাম। আমার সেই সদয় ব্যবহারকে মনসিনর ভুল বুঝেছিলেন। তিনি আমাকে বার বার তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। আমার তখনই উচিত ছিলো তোমাকে রেক্টরী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তোমার প্রতি স্বাভাবিক অনুকম্পা বশতঃ তা আমি করিনি। এটাই আমার পাপ। আর একটা পাপ আমি করেছি, মনসিনরের সন্দেহ থেকে তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। অন্য কোনো পাপ আমি করিনি। কিন্তু যে পাপ আমি করেছি তার জন্যেও আমি শাস্তি লাভের যোগ্য। এর জন্যে মনসিনর আমাকে যে শাস্তি দেবেন তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করবো।"

একটু থেমে ফাদার ও'বেনিয়ন আবার বললেন—"শোনো

শিউ-লান ! তুমি জেনেশুনে পরের পাপের বোঝা আমার ওপরে চাপাতে এসেছো। তুমি হয়তো ভেবেছিলে যে, ভালো ভালো খাবার খাইয়ে মনসিনরকে তুমি বশ করতে পারবে, তারপর তাঁকে যা বলবে তাই তিনি বিশ্বাস করবেন। তোমার গর্ভে কার সন্তান এসেছে সে কথা তুমি ভালোই জানো। আমাকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমারই বিছানার ওপরে কে তোমাকে বলাৎকার করেছিলো তা তো তোমার ভুলে যাবার কথা নয়। আর আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করবো না। আমি আজ প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করবো। নিজেকে তোমার ষড়যন্ত্র-জাল থেকে মুক্ত করবার জন্যেই এটা আমাকে করতে হবে।"

এই পর্যন্ত বলে মনসিনরের দিকে তাকালেন ফাদার ও'বেনিয়ন। "শুনুন মনসিনর, ওর গর্ভস্থ সন্তানের পিতা হো-সান। আমার সামনেই সে ওর ওপরে বলাৎকার করেছিলো। আমি যাতে তাকে বাধা দিতে না পারি সেই উদ্দেশ্যে সে তার সৈনিকদের সাহায্যে আমাকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছিলো চেয়ারের সঙ্গে।"

এরপর সে রাত্রের প্রতিটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশ করেন ফাদার ও'বেনিয়ন। অবশেষে তিনি বলেন,—"এই ঘটনাটা ঘটেছিলো প্রায় দুমাস আগে, আমাদের দুজনকে জেলখানায় নিয়ে আসবার অব্যহিত পূর্বে।"

ফাদার ও'বেনিয়ন এমন জোরের সঙ্গে এবং এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে ঘটনাটা বিবৃত করেন যে, মনসিনর তাঁর কথা অবিশ্বাস করবার মতো কোনো কারণই খুঁজে পেলেন না। তিনি ভালো করেই জানেন, পাপী কখনও এমন জোর দিয়ে কথা বলতে পারে না। শিউ-লানের হাব-ভাব দেখেও তিনি এটা বুঝতে পারেন। ফাদার ও'বেনিয়ন যখন শিউ-লানকে তার কু-কর্মের কথা বলছিলেন, তখন সে মুখের ওপরে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।

"যাক! আর কিছু আমি শুনতে চাইনে।" মনসিনর বললেন,—"এ সব কথা শোনাও পাপ। আমি বেশ বুঝতে পারছি, হো-সানই এই অপকর্মের কর্তা। ও এখন পুরোপুরি শয়তানে পরিণত হয়েছে। ভগবান ওকে ক্ষমা করবেন না।"

একটু থেমে মনসিনর আবার বললেন,—"আমি যাবো শয়তানটার কাছে। আমি তার সঙ্গে কথা বলবো। আমি তাকে আদেশ করবো এই মেয়েটাকে বিয়ে করতে। তার মধ্যে যদি সামান্যতম মনুষ্যত্ব থাকে, তাহলে আমার আদেশ সে অমান্য করতে পারবে না।"

মনসিনরের মুখ থেকে এই কথা শুনে শিউ-লান আর চুপ করে থাকতে পারলো না। মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে তীব্র প্রতিবাদের সুরে বললে,—"না, না, এমন কাজ আপনি করবেন না। হো-সানকে আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না,—না কিছুতেই না। ও নরকে গিয়ে পচে মরুক! (Let him burm in hell!)"

কথাগুলো বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে দুই ধর্মযাজক একে অপরের দিকে তাকালেন। এ ব্যাপারেও ও'বেনিয়নই প্রথমে মুখ খুললেন। শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—"ওকে বিয়ে না করলে তোমার সন্তানের পরিচয় কি হবে সে কথাটা ভেবে দেখেছো কি? তোমার সন্তান যদি পুরুষ হয়, তাহলে লোকে তাকে জারজ পুত্র বলে ঘৃণা করবে। আর সে যদি মেয়ে হয়, তাহলে জীবনে তার বিয়ে হবে না। জারজ কন্যাকে বিয়ে করতে হবে, না হয় আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার অবসান করতে কোনো ছেলেই এগিয়ে আসবে না; ফলে হয় তাকে বেশ্যাবৃত্তি করে জীবন ধারণ করতে হবে, না হয় আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার অবসান করতে হবে। তোমার নিজের অবস্থাও হবে অসহনীয়, সমাজে তোমার স্থান হবে না। সবাই

তোমাকে ঘৃণা করবে। তোমাকে দেখে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নেবে সবাই। আমি জানি, হো-সান ধর্মদ্রোহী, অত্যাচারী, কিন্তু সে লাল ফৌজের একজন অধিনায়ক। সে আজ ক্ষমতাবান। আমার মনে হয় সে হয়তো তোমাকে বিয়ে করতে অরাজী হবে না। তাছাড়া, তার সঙ্গে কথা বলে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে তো মনে হয়, সে এখনও অমানুষে পরিণত হয় নি।"

"আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছিনে, ও'বেনিয়ন," মনসিনর বললেন,—"ও এখন পুরোপুরি শয়তান। ওর চাল-চলন, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম সবই শয়তানের মতো।"

"এমন কথা বলবেন না, মনসিনর।" ফাদার ও'বেনিয়ন অনুনয়ের সুরে বলেন,—"ধর্মযাজক হিসেবে আপনার মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু সদ্‌গুণ আছে। হো-সানের মধ্যেও কিছু সদ্‌গুণ নিশ্চয়ই আছে।"

"আমি তা মনে করিনে।" মনসিমর বললেন,—"তার সম্বন্ধে আমার কি ধারণা সে কথা তার মুখের ওপরেই বলবো আমি। সে যদি এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজী হয় তাহলে বুঝবো যে, এখনও তার মধ্যে কিছু পরিমাণ সদ্‌গুণ আছে। আমি আজই যাবো তার কাছে।"

"বেশ, তাহলে তাই করুন।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমিও তাহলে শিউ-লানের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবো। ওর অমতে তো আর বিয়ে হতে পারে না।"

ওঁদের কথাবার্তা চলছে বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষের ঘটকের মতো। কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে আবার অন্য কথা পাড়লেন মনসিনর।

"আজকের এই ঘটনা তোমার সারাজীবনের শিক্ষা হয়ে থাকবে," মনসিনর বললেন,—"তুমি যদি আগে থেকে আমার উপদেশ মতো চলতে এবং এই মেয়েটার কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে তাহলে

এই রকম ঘটনা ঘটতে পারতো না। তোমার কাছ থেকে কিছুটা আস্কারা পেয়েছিলো বলেই ও তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করে রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত এসেছে। তুমি যদি ওর দিকে না তাকাতে, অথবা ওর সঙ্গে কথা না বলতে, তাহলে ও কিছুতেই তোমার পেছনে ধাওয়া করতো না। ও তোমার মধ্যে পাপের গন্ধ পেয়েছিলো। মেয়েদের ঘ্রানশক্তি শিকারী কুকুরের ঘ্রানশক্তির চেয়েও বেশী। পুরুষ মানুষদের মনের কথা ওরা সহজেই বুঝতে পারে। সুতরাং এটাই তোমার প্রথম পাপাচার। এ পাপাচার হতে এখনও আমি তোমাকে মুক্তি দিইনি।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, মনসিনর।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার অবচেতন মনে এমনি একটা গোপন কামনা হয়তো এসে বাসা বেঁধেছিলো। ধর্মযাজক হিসেবে আমার এটা আগেই বোঝা উচিত ছিলো। এ ব্যাপারে আমি ভুল করেছিলাম। হ্যাঁ মহা ভুল করেছিলাম আমি। আমি ভেবেছিলাম ওকে পবিত্র ধর্মে দীক্ষা দিলে ওর মন থেকে যাবতীয় কলুষ দূর হয়ে যাবে ; কিন্তু এখন দেখছি তা যায়নি। তাছাড়া ও যে মতলবটা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলো, সেটা যদি সফল হতো তাহলে আমাকে আপনি ছেঁড়া জুতোর মতো পথের ধারে ফেলে দিতেন। ভগবানের অসীম করুণা, তাই এ যাত্রা আমি রক্ষা পেয়ে গেছি।"

"যাকগে, ও কথা এখন বাদ দাও।" মনসিনর বললেন,—"নোংরা কথা এবং নোংরা কাজ উভয়ই এক।"

এই কথা বলে মনসিনর তাঁর বিছানার ওপর বসে পড়লেন। এতক্ষণের উত্তেজনায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। জামার হাতা দিয়ে মুখ মুছে তিনি আবার বললেন :

"শোনো, ও'বেনিয়ন, তোমার সাথে এখন হো-সানের সম্পর্ক

খুব ঘনিষ্ঠ। তুমি যখন খুশি তার কাছে যেতে পারো। আমি তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার সঙ্গে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা তুমি করে দাও। আমার মনে হয়, তোমার কথা সে রাখবে।"

"আমি নিশ্চয়ই তাকে বলবো, মনসিনর।" ফাদার ও'বেনিয়ন বিনীতভাবে বললেন,—"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি এখনই তার কাছে যেতে পারেন। সেলের দরজা তো খোলাই রয়েছে। কারারক্ষীরাও আপনার দিকে আর আগের মতো কড়া নজর দিচ্ছে না। হয়তো আমাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যাবে না বলেই আমাদের প্রতি কড়া নজর দিচ্ছে না।"

"না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এখান থেকে যাবো না"; মনসিনর দৃঢ় স্বরে বললেন,—"আমি বন্দী, সুতরাং বন্দীর মতোই ব্যবহার করবো আমি। বে-কসুর মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত জেলখানার সমস্ত নিয়ম-কানুন আমি মেনে চলবো। যাই হোক, এবার তুমি এখান থেকে যাও। ওই মেয়েটাকেও যেতে বলো এখান থেকে।"

শিউ-লান আগে থেকেই যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ছিলো। মনসিনরের কথা শুনে সে তাড়াতাড়ি বাসনগুলো হাতে নিয়ে সেল থেকে বেরিয়ে গেল।

শিউ-লান চলে গেলে ফাদার ও'বেনিয়ন মনসিনরকে জিজ্ঞেস করলেন,—"আপনি কি আজই হো-সানের সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"হ্যাঁ, সম্ভব হলে আজই আমি তার সঙ্গে দেখা করবো।" মনসিনর বললেন।

"ঠিক আছে, দেখি কতদূর কি করা যায়।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু আমার মনে হয়, অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করাই ভাল, ধরুণ সে যদি অনুমতি না দেয়, তাহলে পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে। তা ছাড়া আপনি তো আর জেলখানা থেকে পালিয়ে

যাচ্ছেন না। হো-সানের সঙ্গে কথা বলে আপনি তো এখানেই আবার ফিরে আসবেন।"

"কথাটা মন্দ বলোনি," মনসিনর বললেন,—"ঠিক-আছে, আমি বিষয়টা নিয়ে আর একবার ভেবে দেখি, তুমি তাহলে এখন এসো। তোমার হয়ত এখনো আহারাদি হয়নি।"

"না, এখনও আমার আহারাদি হয়নি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"তবে আমার কাছে টাকা আছে। বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিতে পারবো।"

এই কথা বলেই ও'বেনিয়ন বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

মনসিনর যখন হো-সানের কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন সে ঘুমোচ্ছে। সে এখন দ্রুত আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলছে। পেনি-সিলিনের ক্রিয়ায় তার শরীর থেকে রোগের বীজাণু দ্রুত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আজই সকালে সে অন্নপথ্য গ্রহণ করেছে। তিন বাটি ভাতের ফেন আর চারটে ডিম সে আজ খেয়েছে। খাওয়ার পরেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ মনসিনরের ডাক শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল।

"হো-সান!"

চোখ মেলেই মনসিনরকে দেখতে পেলো সে। তিনি তখন তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

"আপনি জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেন কেমন করে?" কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো হো-সান।

"বেরিয়ে আসতে একটুও অসুবিধে হয়নি আমার।" মনসিনর বললেন—"দরজায় তালা নেই, তাছাড়া ভাঙা দরজা মেরামত করাও হয়নি। কিন্তু তবুও আমি জেলখানার নিয়ম-কানুন মেনে চলেছি।"

"কিন্তু আমি হুকুম দিয়েছিলাম, আপনাকে সব সময় পাহারাধীনে

রাখতে হবে।" হো-সান বললে, "কারারক্ষীরা ওখান থেকে পালিয়ে গেছে নাকি ?"

"না পালিয়ে যাবে কেন ?" মনসিনর বললেন,—"কারারক্ষীরা বহাল তবিয়তেই তাদের কর্তব্য পালন করছে, অর্থাৎ কার কাছ থেকে দু-পয়সা আমদানী করা যায় সেই চেষ্টায় আছে। তারা এখন কারো হুকুমের তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তারা তাদের কর্তব্য পালন না করলেও আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। আমি তোমাদের জেলখানার নিয়ম-কানুন মেনে চলেছি এবং যতদিন না সসম্মানে মুক্তি পাচ্ছি ততদিন নিয়ম-কানুন মেনেই চলবো।"

"তা তো বুঝলাম," হো-সান শ্লেষের সুরে বললে,—"কিন্তু এখানে আপনার শুভাগমনের কারণটা জানতে পারি কি ?"

"আমি এখানে এসেছি, মৃত্যুপথযাত্রী রুগীর প্রাক-পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে। তোমার কাছে আজ আমি এসেছি পুরোহিত রূপে।"

হো-সান হেসে উঠলো এই কথা শুনে। "আমার কোনো পুরুত নেই এবং পুরুত আমি চাইও না।"

"তুমি না চাইলেও আমাকে আসতে হয়েছে।" মনসিনর বললেন —"ভগবানের নির্দেশে আমি এসেছি।"

"ভগবান টগবান আমি মানি নে," হো-সান পূর্ববৎ শ্লেষের সুরে বললো,—"আপনি এবার মানে মানে এখান থেকে বিদেয় হতে পারেন।"

এই কথা বলেই খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো সে। কিন্তু অসুস্থ শরীরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে বিছানার ওপরে বসে পড়লো।

"শোনো, হো-সান," মনসিনর যথাসম্ভব কোমল স্বরে বললেন— "একদিন আমি ছিলাম তোমার শিক্ষক এবং ধর্মপিতা (Spiritual

father); সেই পুরানো সম্পর্কের সূত্র ধরেই আজ তোমার কাছে এসেছি।"

"ওসব কথা ভুলে যান আপনি।" হো-সান বললে,—"ধর্ম বাপ-টাপ কেউ নেই আমার, আমি কাউকে মানিনে।"

"তুমি না চাইলেও আমি এসেছি।" মনসিনর বললেন,—"আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে।"

"তুমি তো ভারী বিরক্ত করছো দেখছি। তুমি যদি নিজে থেকে চলে না যাও তাহলে আমি গার্ডদের দিয়ে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেবো।" হো-সান অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে।—"যত সব উঠ্‌কো ঝামেলা। বুড়ো ব্যাটা মরবার আর জায়গা পেলে না।"

এতক্ষণ মনসিনর ভদ্রভাবেই কথা বলছিলেন হো-সানের সঙ্গে। কিন্তু তার কাছ থেকে অভদ্র ব্যবহার পেয়ে তিনি আর ভদ্রতা বজায় রাখতে পারলেন না। তাঁর মনের মধ্যে এতক্ষণ যে চাপা বিক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছিলো, হো-সানের অভদ্র ব্যবহারে তা হঠাৎ দাবানলের মতো জ্বলে উঠলো। নিজেকে আর তিনি স্থির রাখতে পারলেন না। তাঁর ভেতরের আইরিশ সত্তা আগ্নেয়গিরি-নিসৃত লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে এলো।

"ওরে শয়তানের লেজুড়।" তিনি গর্জে উঠলেন,—"ওরে নোংরা কুকুর, তুই কি করেছিস তা কি তুই জানিস নে? তুই—তুই একটা মেয়েকে বলাৎকার করেছিস।"

মনসিনরের কথা শুনে হো-সান হো হো করে হেসে উঠলো। "তোর বুঝি আপশোষ হচ্ছে, তাই না? আমার জায়গায় তুমি হলে বোধ হয় ভালো হতো। কি বলো!"

"ওরে শয়তান! এই বুঝি তোর শিক্ষা!" মনসিনর অগ্নিমূর্তি হয়ে বললেন,—"আমি কি তোকে এই শিক্ষা দিয়েছিলাম। তোর মধ্যে আমি একসময় যে ধর্মপ্রবণতা দেখেছিলাম, আজ দেখছি সে

জিনিস তুই তোর মন থেকে দূর করে দিয়েছিস তুই এখন। পাপকেও ভয় পাস নে দেখছি।'

পাপ! হো-সান শ্লেষের সঙ্গে বলল—"পাপ বলে পৃথিবীতে কোন কিছু নেই। ওটা আছে শুধু তোদের মতো ধর্মযাজকদের কল্পনায়। পাপ নিয়েই তোদের কারবার। পাপই তোদের জীবিকা।"

এই সময় বাইরে থেকে কে দরজায় করাঘাত করলো। মনসিনর এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলো একজন আর্দালী। সে ঘরে ঢুকে হো-সানকে সেল্যুট করে দাড়লো।

"কমাণ্ডার," সে বলল,—"আপনার মাননীয় পিতা আর মাননীয় মাতা আপনার গ্রামের বাড়ি থেকে এসেছেন। ওঁরা শুনতে পেয়েছেন যে, আপনি অসুস্থ। আপনার জন্যে এক ঝুড়ি ডিম আর মুরগীর মাংসের সুপ নিয়ে এসেছেন।"

হো-সান হাত দিয়ে ইসারা করে বলল—"ওঁদের এখান থেকে চলে যেতে বলো। আমার কোনো পিতা-মাতা নেই। পার্টিতে আসবার পর আমি ওদের অস্বীকার করেছি, ওরাও তা জানে। কিন্তু তা সত্বেও কেন ওরা এসেছে? ওদের বলে দাও, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন যেন ওরা আমার কাছে না আসে।"

আর্দালী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"তুমি কি আমার কথা শুনতে পাওনি" হো-সান খেঁকিয়ে উঠলো,—"তোমাকে যা বলা হলো সেই মতো কাজ করগে।"

"ঠিক আছে, কর্ণেল।" নিম্নকণ্ঠে কথাটা বলে সেল্যুট করে চলে গেল সে।

মনসিনর ফিরে এলেন হো-সানের বিছানার পাশে। বাপ-মার প্রতি হো-সানের ব্যবহার দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে তাঁর মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিলো, তার পরিবর্তে তাঁর মনে দেখা দিয়াছে অনুকম্পা।

"এ তোমার কি ব্যবহার হো-সান? মনসিনর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—"পিতা মাতাকে সম্মান দেবার কথাও কি তুমি ভুলে গেছ? তুমি কি ষষ্ঠ অনুশাসন স্মরণ করতে পারো? তুমি যে একদিন ধর্মযাজক হবে বলে মনে করতে। আজ বোধ হয় তা আর তোমার মনে নেই।"

হো-সান মনসিনরের দিকে তাকালো। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে বললে—"যোসেফ ডানিও ঠিক এমনি কাজই করেছিলেন।"

এই কথা বলেই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সে।

"আমার হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছেন আপনি, সুতরাং হো-সানকে আমি বিয়ে করতে পারিনে।"

কথাগুলো ফাদার ও'বেনিয়নকে বললে শিউ-লান। রেক্টরীর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বসে কথা হচ্ছিলো দুজনের মধ্যে। শিউ-লানের সঙ্গে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যেই ফাদার ও'বেনিয়ন ওখানে এসেছেন। তাঁকে রেক্টরীর ভেতর ঢুকতে দেখে গার্ডরা রীতিমত বিস্মিত হয়। তাদের ধারণা ছিলো যে পাদ্রীদ্বয়কে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। গার্ডরা সন্দিগ্ধভাবে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকাচ্ছে দেখে তিনি মৃদু হেসে তাদের বলেন যে, হো-সানের নির্দেশে তাঁকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন হো-সানের চিকিৎসা করছেন। এ খবর গার্ডরা আগেই পেয়েছে। ওরা তাই ফাদার ও'বেনিয়নকে বাধা দিলো না। তিনি সোজা শিউ-লানের ঘরে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বসলেন। তিনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন তা বুঝতে দেরী হলো না শিউ-লানের। ও'বেনিয়ন প্রথমেই কাজের কথা শুরু করলেন। শিউ-লানকে তিনি বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তার বর্তমান অবস্থায় হো-সানকে বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। শিউ-লান চুপ করে তাঁর কথাগুলো শুনবার পর অবশেষে

উপরোক্ত মন্তব্য করলো। তার কথার উত্তরে ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমাকে ভালোবাসা উচিত নয়।"

"আমি তা জানি," শিউ-লান বললে,—"কিন্তু তবুও আমি আপনাকেই ভালোবাসি। আমি নানাভাবে চেষ্টা করেছি আপনার চিন্তাকে মন থেকে দূর করে দিতে, কিন্তু আমি তা পারিনি। মনকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি।"

আজ আর সে কোন রকম ছলা-কলার আশ্রয় না নিয়ে সরাসরি তার মনের কথা প্রকাশ করলো ও'বেনিয়নের কাছে আর তার মুখখানা আজ যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সে মুখে ফুটে উঠেছে একটা দুশ্চিন্তার ভাব। তার ফোলা ফোলা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন বুঝতে পারেন যে তিনি আসবার আগে ও কাঁদছিলো।

ফাদার ও'বেনিয়ন আজ তার কর্তব্য স্থির করে এসেছেন। তাঁর মনে আজ আর কোনো রকম দুর্বলতা নেই। তিনি চান, শিউ-লান তার নিজের ভালোর জন্যে হো-সানকে বিয়ে করুক। শিউ-লানের ওপরে তাঁর কোন রাগ নেই। রাগের পরিবর্তে তাঁর মনে স্থান লাভ করছে অনুকম্পা। ও যে তাঁর সর্বনাশ করতে চেষ্টা করেছিলো সে কথাও তিনি ভুলে গেছেন। অসহায় নারীর প্রতি করুণা আর অনুকম্পার জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি যখন ডাবলিনে প্রথম ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করেন সেই সময় ওখানকার প্রধান গির্জার একজন বৃদ্ধ ধর্মযাজক নবাগতদের ক্লাস নিতেন। এ ক্লাসে একদিন 'ভালবাসা' কথাটার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,—"ভালোবাসা হলো এক ধরনের 'ইমোশন'। এই ইমোশনকে ভগবদ্ভক্তিতেও রূপান্তরিত করা যায়। ভালোবাসা নারীর হৃদয়কে দৃঢ় করে, তার মনকে টেনে নিয়ে যায় যাকে যে ভালোবাসে তার দিকে। পুরুষের বেলাতেও প্রায় একই অবস্থা দেখা যায়। পুরুষ নারীকে ভালোবাসে

প্রধানত কাম প্রবৃত্তির তাড়নায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অন্য রকমও দেখা যায় সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবাসা অথবা মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা, অথবা বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসা এই শ্রেণীতে পড়ে। তবে সে ভালোবাসা যে রকমই হোক না কেন, তাকে পাত্রান্তরিত করা যায় এবং ভগবদ্ভক্তিকেও রূপান্তরিত করা যায়। এটাই হলো ধর্মযাজকের কর্তব্য।"

ফাদার ও'বেনিয়নের মনে পড়ে যায় তাঁর জ্ঞানী শিক্ষকের সেই ব্যাখ্যা। কিন্তু শিউ-লানের ক্ষেত্রে কি ভাবে এটাকে প্রয়োগ করা যায় এটাই হলো সমস্যা। বৃদ্ধ শিক্ষক কি জানতেন না যে প্রেমিকা নারী কি রকম একগুঁয়ে হতে পারে? তবুও তিনি আর একবার শিউ-লানকে বুঝতে চেষ্টা করেন।

আমার মধ্যে তুমি যা দেখছো, তা আমি নই, (What you see in me is not myself) যে ব্যক্তিটিকে তুমি ভালোবাসো বলে মনে করো সে ব্যক্তিও আমি নই, আমি যাঁর আরাধনা করি সেই ভগবানের অংশ। প্রকৃত ভালবাসা যে কি বস্তু তা তুমি আজ পর্যন্ত দেখোনি। তুমি দেখেছ শুধু নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা আর অমানুষিকতা। এবং যেহেতু আমার মধ্যে এই সব দোষ বিদ্যমান নেই। সেইজন্যেই তুমি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছো। কিন্তু আমি যদি ধর্মযাজক না হতাম তাহলে আমার মধ্যেও দেখা যেতো এই সব দোষ। মানুষ হিসেব আমি নিজেকে অপর মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করিনে। হো-সান আজ যেখানে রয়েছে। সেখানে যদি আমি থাকতাম তাহলে আমি হয়তো তার চেয়েও বেশী খারাপ হয়ে পড়তাম। সে আজ যে মতাদর্শক অভ্রান্ত বলে ধরে নিয়েছে। সেই মতাদর্শের জন্যেই বাইরে থেকে তাকে নিষ্ঠুর এবং অমানুষ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি সদ্‌গুণ দেখতে পেয়েছি। যে কোন কারণেই হোক তার মনের সেই সদ্‌গুণ আজ চাপা পড়ে গেছে। আগুনের ওপরে যেমন ছাই

চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। তার মনের সদ্‌গুণের আগুনের ওপরেও সেইভাবে ছাই চাপা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সেই গুণাবলী মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসতে চায়। সে আজ নিজের মনের সঙ্গেই লড়াই করছে। এবং এইজন্যেই মাঝে মাঝে তাকে নিষ্ঠুর আর অমানুষ বলে মনে হয়। আমার বিশ্বাস, তুমি যদি ওকে বিয়ে করো, তাহলে ওকে সৎপথে টেনে আনতে পারবে। ভালবাসার জন্যেই এটা সম্ভব হবে। আমার মনে হয় হো-সানও আজ ভালবাসার কাঙাল।"

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শিউ-লানের মনের ওপরে কোনো রকম দাগ কাটতে পারলো কি না তা বুঝতে পারলেন না ফাদার ও'বেনিয়ন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, শিউ-লান শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে সে মুখ খুললো।

"সে কি এবং কেমন তাতে আমার কি আসে যায়? কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে শিউ-লান বললে,—"আমি শুধু আপনার কথাই চিন্তা করতে পারি। আপনি আমার সর্বস্ব।" নিজের মনের ভাব গোপন না রেখেই কথাগুলো বললে সে।

ফাদার ও'বেনিয়ন উঠে দাঁড়ালেন। "শোনো শিউ-লান" তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন,—তুমি যদি আবার এই কথা আমাকে বলো তাহলে আর কোনদিন আমাকে তুমি দেখতে পাবে না। এমন কি, ধর্মযাজক হিসেবও নয়। সুতরাং তোমাকে এখনই এটা স্থির করতে হবে। আমি তোমার কাছে ধর্মযাজক ছাড়া আর কিছু নই।"

শিউ-লান বুঝতে পারলো যে, ফাদার ও'বেনিয়ন যা বলছেন তাই সত্যি, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়েছেন। তিনি এখন তার কাছে ধর্মযাজক ছাড়া আর কিছু নন।"

শিউ-লান আরও বুঝতে পারে যে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই ফাদার ও'বেনিয়ন এ সব কথা বলছেন কিন্তু তাঁর কথায় সে আদৌ

সান্ত্বনা পায় না। তার মনে হয় এই বিশ্বসংসারে সে আজ সম্পূর্ণ একা। নিজেকে ছাড়া আর তার কেউ নেই। না আরও একজন আছে—সে হলো তার গর্ভের সন্তান। সন্তান? সে ছাড়া আর কেউ তার নেই? এই কথা মনে হতেই তার মধ্যে দেখা গেল মাতৃত্বের রূপ। তার ছলা-কলা, চাল-চলন সব কিছু রূপান্তরিত হয়ে গেল মাতৃত্বে সুমহান অনুভূতিতে। সে তখন ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকালো। এখন আর তার মধ্যে আগের মতো উত্তেজনা নেই।

"হো-সানের কথাটা একবার ভেবে ছাখো," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"সে যুবক, সে সুন্দর এবং শক্তিমান। আজ তাকে অমানুষ বলে মনে হলেও ভালোবাসার দ্বারা তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনা যাবে। ভালোবাসার শক্তি যে কত বিরাট তা হয়তো তুমি জান না।"

শিউ-লান তার হাতের আঙুলগুলো মটকালো। তারপর ঠোঁট কামড়ে ধরলো। সে এবার কথা বলতে চেষ্টা করছে।

"আমি চেষ্টা করবো," সে বলল, "নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করবো।"

"তাহলে অবশ্যই তুমি কৃতকার্য হবে।" ফাদার ও'বেনিয়ন মৃদুস্বরে কথাটা বলে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

কয়েক মাস পরের কথা।

ইতোমধ্যে শীত গিয়ে বসন্ত এসেছে, এবং বসন্ত শেষ হয়ে শুরু হয়েছে। ধর্মযাজকদ্বয়ের অবস্থাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁরা এখন আর জেলখানায় বন্দী নন। হো-সান তাঁদের আবার

রেক্টরীতে এসে বাস করতে অনুমতি দিয়েছে। এখনও তাঁরা নজরবন্দীই রয়েছেন। তবে পাহারার কড়াকড়ি অনেকটা হ্রাস করা হয়েছে। এখনও তাঁদের প্রায়ই হেড কোয়ার্টার্স-এ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে। হো-সান এখন সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করেছে। কিন্তু কেন যেন আগের চেয়েও বেশী নিষ্ঠুর হয়েছে সে।

এই বিষয়টা নিয়েই সেদিন কথা হচ্ছিলো মনসিনর আর ফাদার ও'বেনিয়নের মধ্যে।

"হো-সান আগের চেয়েও বেশী নিষ্ঠুর হয়েছে," মনসিনর বললেন —"কিন্তু কেন যে এটা হয়েছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

"আমার মনে হয় লেফ্‌টেন্যাণ্ট চুংয়ের প্রভাবেই এটা হয়েছে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"চুং মনে মনে আশা করেছিলো যে হো-সান মারা যাবে; এবং সে মারা গেলে চুংই হবে কর্ণেল। কিন্তু হো-সান আরোগ্যলাভ করায় চুংয়ের মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। সে এখন আগের মতোই হো-সানের অধীনস্থ অফিসার। হো-সানের এই আরোগ্যলাভের ব্যাপারে আমাদের অবদান আছে তা সে ভালো করেই জানে। এবং তা জানে বলেই সে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ তুলছে হো-সানের কানে। সে হয়তো এমন কথাও বলেছে যে, হো-সান আমাদের প্রতি অহেতুক দয়া প্রদর্শন করছে। আমার মনে হয় এই কারণেই হো-সান আমাদের প্রতি আগের চেয়েও বেশী নিষ্ঠুর হয়েছে।"

"তুমি দেখছি এখনও হো-সানের পক্ষে ওকালতি করছো।" মনসিনর বললেন,—"কিন্তু আমার ধারণা চুং-য়ের চেয়েও ও বেশী সাংঘাতিক। চুং লেখাপড়া জানে না, ছেলেবেলায় সে ভিখারীর ঘরে লালিত-পালিত হয়েছে, সুতরাং তার কাছ থেকে কোনোরকম সুবিচার বা সুবিবেচনা আশা করা যায় না। কিন্তু হো-সান যথেষ্ট

শিক্ষিত। কোন্‌টা ন্যায় এবং কোন্‌টা অন্যায় তা সে ভালো করেই জানে। কিন্তু তা জেনেও যখন সে আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখাচ্ছে তখন বুঝতে হবে যে, চুংয়ের চেয়েও সে ভয়ানক।"

একটু থেমে মনসিনর আবার বললেন,—"তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে, তুমিও কমিউনিষ্ট হয়ে গেছো।"

ফাদার ও'বেনিয়ন এর উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একজন বয়স্ক চীনা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকলো। তার পরণে নীল রঙের সুতির জ্যাকেট এবং পায়জামা।

"আপনারা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" সে বললে।

স্ত্রীলোকটি হলো শিউ-লানের মা। মেয়ের পেটে সন্তান এসেছে শুনে সে তার কাছে এসেছে। গত দুই মাসে মনসিনর ও ফাদার ও'বেনিয়ন শিউ-লানকে দেখেন নি। মনসিনরের নির্দেশে সে তার মায়ের সঙ্গে কম্পাউণ্ডের পূব দিকের কুটিরে বাস করছে। তার মা এখন মেয়ের দেখাশুনা এবং ওঁদের রান্নার কাজ করছে।

"আমাকে কিছু বলতে চাও কি?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে।

"আমার মেয়ের একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে।" মৃদু হেসে সে বললে।

"তাই নাকি! কবে?" মনসিনর জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ থেকে আট দিন আগে।" স্ত্রীলোকটি বললে,—"আমাদের দেশের প্রথা হলো, আট দিন পার না হলে সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলা হবে না।"

স্ত্রীলোকটি একখানা লাল রুমালে বেঁধে কি যেন নিয়ে এসেছে। পোটলাটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে রুমালের গিট খুলে ফেললো সে। তার ভিতরে চারটে ডিম।

"আমাদের এই সামান্য উপহার দয়া করে গ্রহণ করুন।" স্ত্রীলোকটি বললে, "আমার দৌহিত্রকে আপনারা আশীর্বাদ করুন।"

ফাদার ও'বেনিয়ন ডিমগুলো হাতে তুলে নিলেন। "আমরা তোমার দৌহিত্রকে আশীর্বাদ করছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ও দীর্ঘজীবন লাভ করুক। এবার আমিও তোমার দৌহিত্রকে সামান্য কিছু উপহার দিচ্ছি।"

এই বলে পকেট থেকে দুটো মার্কিন ডলার বের করলেন তিনি। ডলার দুটো অনেক কষ্টে নিজেদের প্রয়োজনের জন্যে রেখেছিলেন। এবার তিনি ডলার দুটিকে একখানা কাগজে মুড়ে স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়ে বললেন,—"আমাদের কাছে দেবার মতো আর কিছুই নেই। আমরা যদি আগের মতো স্বাধীনভাবে থাকতে পারতাম তাহলে আরও বেশী কিছু দিতে পারতাম।"

স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে কাগজের মোড়কটি নিয়ে বললে—"এটা আমি মেয়ের হাতে দেবো। সে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে আপনার কাছ থেকে এই উপহার পেয়ে।"

একটু থেমে স্ত্রীলোকটি আবার বললে—"শিউ লান প্রার্থনা জানিয়েছে যে, আপনি যেন দয়া করে তার ছেলেটিকে এবার দেখে আসেন।"

ফাদার ও'বেনিয়ন মনসিনরের দিকে তাকিয়ে বললেন— "আপনি আমাকে ওর কাছে যেতে অনুমতি দেবেন কি?"

"নিশ্চয়ই দেবো।" মনসিনর বললেন—"তুমি ছেলেটিকে দেখে এসো। আর শোনো, ছেলেটিকে বাপ্তাইজ করতে হবে।"

মনসিনরের অনুমতি পেয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন স্ত্রীলোকটির সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কম্পাউণ্ড পার হয়ে শিউ-লানের কুটিরে এসে হাজির হলেন তিনি। শিউ-লান ছেলেকে কোলে করে বিছানার ওপরে বসেছিলো। তার ধারণা হয়েছিলো যে, ফাদার ও'বেনিয়ন নিশ্চয়ই তার কাছে আসবেন। সে তাই পোশাক পরিবর্তন করে সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরী হয়েছিলো।

ফাদার ও'বেনিয়ন এগিয়ে এসে শিউ-লানের সামনে দাঁড়ালেন। শিউ-লান ম্লান হাসি হেসে বললে—"আপনাকে দেখে আমি যে কী খুশী হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিনে।"

ফাদার ও'বেনিয়ন শিশুটিকে দেখে খুশী হলেন।

"সুন্দর ছেলে," তিনি বললেন,—"আর বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে ? এটাই স্বাভাবিক নাকি ?"

"মোটেই না," শিউ-লান বললে—"ও একটু অস্বাভাবিক ভাবেই হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। মা বলেন, ওকে নাকি তিন মাসের শিশুর মতো দেখায়।"

"হ্যাঁ সেই কথাই আমি বলি," মা বললে।

শিউ-লান সলজ্জ মুখে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকায়। "আপনার সাহায্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। আপনি আপনার নিজের রেশন হতে বেশিরভাগ আমার জন্যে পঠিয়েছেন। আমি জানি, এর জন্যে আপনাকে অর্ধাহারে থাকতে হয়েছে।"

"ও সব কথা এখন থাক" ফাদার ও'বেনিয়ন অন্য কথা পাড়লেন, "ওর চোখ দুটি এমন সুন্দর আর বড়ো বড়ো হয়েছে যে—"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই একজন সৈনিক ওখানে এসে তাঁর হাত ধরে ফেললো। শিউ-লান ভয় পেয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে দিয়ে সৈনিকটির দিকে তাকালো।

"কোন্ সাহসে তুমি আমার ঘরে ঢুকেছো ?" শিউ-লান চিৎকার করে বললে,—"তুমি দস্যুর মতো ব্যবহার করছো।"

সৈনিকটি হো হো করে হেসে উঠলো। সে শিশুটির গালে একটা টোকা দিয়ে সে বললে—"এই রকম চোখ আমি একজন বিশেষ লোকের দেখেছি।" সে তখন ফাদার ও'বেনিয়নের মুখের দিকে

তাকিয়ে বললে—"আপনাকে এখনই হেড কোয়ার্টার্স্-এ যেতে হবে। এটা আমাদের কমাণ্ডারের আদেশ।"

"আমি নিশ্চয়ই তাঁর আদেশ পালন করবো," ফাদার ও'বেনিয়ন শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে বললেন,—"আমি ফিরে এসে তোমার ছেলেকে বাপ্টাইজ করবো।"

"আপনি সব সময়েই অপরের কথা চিন্তা করেন।" শিউ-লান নিম্নকণ্ঠে কথাগুলো বলে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকালো। ফাদার ও'বেনিয়ন আর কিছু না বলে সৈনিকটির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

॥ পনের ॥

হো-সান একখানা বড়ো টেবিলের পেছনে বসে গম্ভীরভাবে কি যেন লিখছে। তার বাঁ দিকে বসে আছে তার সহকারী চুংয়েন। ফাদার ও'বেনিয়নকে তাদের সামনে একটা কাঠের বেঞ্চির ওপরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর হাত দুখানা পিঠ মোরা করে বাঁধা। গলাটাও আগের মতোই বাঁধা। দুজন সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ঠিক পেছনে। বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁকে এভাবে বাঁধা হয়নি। কিন্তু আজ তিনি হেড কোয়ার্টাস্-এ ঢুকতেই হো-সান সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে তাঁকে বেঁধে ফেলতে বললে। ফাদার ও'বেনিয়ন বুঝতে পারলেন যে, হো-সান তাকে নির্যাতন করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে।

লেখা শেষ হলে হে-সান ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে।

"এখনও স্বীকার করো যে, তুমি একজন গুপ্তচর।" হো-সান বলল। এটা একটা পুরানো অভিযোগ পুরোনো পচা এবং মিথ্যে।

"দশ হাজার বার তুমি আমাকে এই কথা বলেছো," ফাদার ও'বেনিয়ন দৃঢ় স্বরে বললেন,—"এবং দশ হাজার বারই আমি তোমাকে বলছি যে, এ অভিযোগ ডাহা মিথ্যে। আমি গুপ্তচর নই।"

হো-সান টেবিল থেকে টি-পট তুলে নিয়ে বাটিতে চা ঢাললো। তারপর নিঃশব্দে চা পান করতে লাগলো। চা পান শেষ হলে সে সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলো, "ওর পিঠে বেয়নেটের খোঁচা দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা ফাদার ও'বেনিয়নের পিঠে বেয়নেটের মুখ ঠেকালো। ফাদার ও'বেনিয়ন ভাবলেন এবার তার পিঠে বেয়নেট বিঁধবে। তিনি তাই যন্ত্রণা সহ্য করবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, বেয়নেট তাঁর পিঠে বেঁধেনি। সৈনিকরা আলতো ভাবে তাদের বেয়নেটর মুখ তাঁর পিঠে ঠেকিয়ে রেখেছে মাত্র। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি বিস্মিত হলেন। কিন্তু পিঠে বেয়নেট না বিঁধলেও দড়ির বাঁধনের জন্যে তাঁর নড়াচড়া করবার শক্তি ছিলো না।

হো-সান তার গলাটা একটু পরিস্কার করে নিয়ে কোমল স্বরে বললে,—"শুনুন পাদ্রী মশাই, আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে এখনও স্বীকার করুন যে, আপনি একজন গুপ্তচর। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে, আমেরিকান ধর্মযাজকরা সবাই গুপ্তচর এবং তারা সবাই তাদের গর্ভমেন্টের নির্দেশে গোপন ক্রিয়া-কলাপ চালাচ্ছে। আমি মনে করি, আপনিও এই কাজই করছেন। আমি তাই আবার বলছি আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করুন। আপনি স্বীকারোক্তি না করলে বাধ্য হয়ে আমাকে নির্যাতনের পথে যেতে

হবে। আমার এটা ইচ্ছে নয়। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ কর্তব্য আমাকে পালন করতেই হবে।"

"আমি গুপ্তচর নই," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে মিথ্যে স্বীকারোক্তি আদায় করা যাবে না।"

হো-সান ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। তারপর সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলো—"বাঁধন শক্ত করো।"

সৈনিকরা এগিয়ে এলো হুকুম তামিল করবার জন্যে। এই সময় চুংরেন বললে—"শুধু বাঁধনেই কাজ হবে না, ওকে আচ্ছামতো পিটুনী দিতে হবে।"

"আগে দেখা যাক দড়িতে কাজ হয় কিনা," হো-সান বললে,—"এতে কাজ না হলে অন্য কথা চিন্তা করা যাবে।"

"আপনি এর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করছেন।" চুংরেন বললে—"সদয় ব্যবহার করে এর কাছ থেকে কথা বের করা যাবে না।"

"ঠিক আছে, দড়ির বাঁধনে কাজ না হলে পিটুনী দেবার ব্যবস্থাই করা হবে।" হো-সান বললে।

এই কথা বলেই সে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়ে কাগজপত্রগুলো পড়তে লাগলো। ইত্যবসরে সৈনিকরা ফাদার ও'বেনিয়নের বাঁধন শক্ত করতে লাগলো। বাঁধন এমন ভাবে টাইট করা হলো যে, তাঁর দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। তাঁর মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে এলো।

হো-সান তাঁর দিকে লক্ষ্য করছিলো। "আপনাকে এতো কাহিল মনে হচ্ছে কেন বলুন তো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"আমি গতকাল থেকে কিছুই খাইনি।" ফাদার ও'বেনিয়ন অতি কষ্টে বললেন কথাগুলো।

"সে কি! আপনাদের তো যথেষ্ট পরিমাণ রেশন দেওয়া হয়," হো-সান বললে—"না খেয়ে থাকার তো কথা নয়।

"আ—আমি—মানে আমার রেশন থেকে একটা মেয়েকে আর তার মাকে দিতে হয় কিনা, তাই—ওর একটা ছেলে হয়েছে, তাই ওর জন্মে—"

কথা বলতে বলতে ফাদার ও'বেনিয়নের মাথাটা এক দিকে হেলে পড়লো। হো-সান চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চুং-য়ের দিকে তাকিয়ে বললে,—"এ লোকটার জন্যে আমিই দায়ী, চুং, এঁর জন্যে কিছু খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করো। খাওয়ার পরে এ হয়তো কথা বলবার মতো শক্তি পাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর কাছ থেকে আমি স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারবো। এবার ওর বাঁধন খুলে দাও।"

হো-সানের আদেশে সৈনিকরা ওঁর বাঁধন খুলে দিলো। চুং অনিচ্ছাসত্বেও হো-সানের আদেশ পালন করতে বাইরে গেল। তিন মিনিটের মধ্যেই ফাদার ও'বেনিয়ন মুক্ত হলেন। কিন্তু তখনও তাঁর নড়াচড়া করবার সাধ্য ছিলো না। সারা দেহে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি।

"আপনি উঠে একটু হেঁটে বেড়ান," হো-সান বললে—"শরীরে রক্ত চলাচল করলে এই আড়ষ্ট ভাবটা কেটে যাবে।"

এই পর্যন্ত বলে গলার স্বরটা খাটো করে সে আবার বললে—"ছেলেটা কেমন হয়েছে বলুন তো?"

ফাদার ও'বেনিয়ন সন্দেহের দৃষ্টিতে সৈনিকদ্বয়কে একবার দেখে নিলেন। তারপর ইংরাজীতে বললেন—"এদের সামনে এ সব কথা বলা কি ঠিক হবে?"

"ইংরাজীতে বললে কোনো অসুবিধা হবে না।" হো-সান বললে।

"কিন্তু ওরা যদি বুঝতে পারে?"

"না, ওরা কেউ ইংরাজী জানে না।" হো-সান বললে—

"ইংরেজীতে কথা বললে ওরা বুঝতে পারবে না। যাই হোক এবার ছেলেটার কথা বলুন। ছেলেটা নিশ্চয়ই আপনার?"

"একথা কি করে বললে তুমি?" ফাদার ও'বেনিয়ন আপত্তি করলেন।

"তা না হলে নিজের খাবার দিয়ে ওর মাকে সাহায্য করছেন কেন?"

ফাদার ও'বেনিয়ন হো-সানের মুখের দিকে তাকালেন। "তুমি ভালো করেই জানো যে, ও ছেলে আমার নয়।"

"কিন্তু আমি জানি যে, মেয়েটাকে আপনি গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।" হো-সান বললে।

"আমি তাকে নিয়ে যাইনি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"ও আগে থেকেই অন্তঃস্বত্বা ছিলো।"

"ও কি বিবাহিতা?" হো-সান জিজ্ঞেস করলো।

"না।"

ফাদার ও'বেনিয়ন হো সানের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

"আপনি মেয়েটিকে ভালোবাসেন বলেই আমার ধারণা।" হো-সান বললে।

"ওকে আমি ভালোবাসি ঠিকই," ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"কিন্তু ভালোবাসা বলতে তুমি যা বুঝতে চাইছো, আমার ভালোবাসা সে রকম নয়। আমি ওকে মেয়ের মতো ভালোবাসি।"

"কিন্তু ও আপনার সঙ্গে এক গাড়িতে গিয়েছিলো।" হো-সান আবার বললে কথাটা।

"ও আমার ইচ্ছেয় যায়নি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"ও আমাকে কিছু না বলে গাড়িতে উঠে লুকিয়েছিলো। ওকে আমি দেখতে পাই অনেকটা পথ যাবার পর। সেখান থেকে ফিরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ওকে পথের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া যেতো হয়তো কিন্তু সেটা হতো অমানুষিক কাজ।"

"আপনি তাহলে ষষ্ঠ অনুশাসন ভঙ্গ করতে পারতেন।" হো-সান বললে—"আপনার পক্ষে ওটা ছিলো একটা মহা সুযোগ, সে সুযোগ কি আপনি গ্রহণ করেন নি?"

হো-সানের কথা শুনে ফাদার ও'বেনিয়ন হেসে উঠলেন। "নিজে গিয়ে ছেলেটিকে একবার দেখে এসো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন'—"ওর মুখ চোখ সবই তোমার মতো। এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো কে ওর পিতা!

"ছেলে না মেয়ে?" হো-সান জিজ্ঞেস করলো।

"ছেলে। ভারী সুন্দর, ঠিক ওর বাপের মতো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"তুমি যদি ওকে অস্বীকার করো তাহলে আমি আদালতে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি।"

হো-সান হঠাৎ প্রবল ভাবে কাশতে শুরু করলো। সে টিপট থেকে চা ঢেলে নিয়ে এক চুমুক সবটা চা পান করে ফেললো।

"মেয়েটা যদি আমাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করে," হো-সান বেশ জোরের সঙ্গে বললে,—"তাহলে আমি আইনের আশ্রয় নেবো। ও যদি মিথ্যে অভিযোগ আনে তাহলে ও তার ফল ভোগ করবে।"

এই সময় ফাদার ও'বেনিয়ন আর একবার তার দিকে তাকালেন। হো-সান তাঁর দিকে তাকালে তিনি সৈনিকদ্বয়ের দিকে চোখ ইসারা করেন। তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হো-সান আড় চোখে সৈনিকদ্বয়ের দিকে তাকালো। তার মনে হলো, ওদের মধ্যে একজন বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। 'ও কি ইংরাজী জানে নাকি'—কথাটা মনে হতেই হো-সান তার বেল্টের সঙ্গে যুক্ত খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে সোজা ওর বুকে গুলি করলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মারা গেল। এরপর সে ছুটে গিয়ে মৃত সৈনিকটির রাইফেলটা নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

হঠাৎ এই রকম একটা অঘটন ঘটে যাওয়ায় ফাদার ও'বেনিয়ন ভীত হয়ে পড়লেন। তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"তুমি নরহত্যা করলে, হো-সান !"

"ওকে আমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম।" হো-সান বললে—"ও চুংয়ের বিশ্বস্ত লোক। চুংই ওকে সেনাবাহিনীতে এনেছে। তাছাড়া এ অঞ্চলের লোকও ও নয়। অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা যায় না।"

"আমার সন্দেহ, ও ইংরাজী জানতো।" ফাদার ও'বেনিয়ন দুঃখিত ভাবে বললেন, "তবে এটা আমার সন্দেহ মাত্র। তার জন্যে ওকে এইভাবে মেরে ফেলাটা কি উচিত হলো ?"

"ওকে না মেরে আমার উপায় ছিলো না।" হো-সান বলল,—"ও যদি এই সব কথা চুংকে বলতো তাহলে সে আমাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করতো। আপনি জানেন না, আমারও অনেক শত্রু আছে।"

ফাদার ও'বেনিয়ন কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাইরে অনেক লোকের পদশব্দ শুনে চুপ করে গেলেন তিনি। পিস্তলের আওয়াজ শুনে অনেকে ছুটে আসছিলো হো-সানের অফিস ঘরের দিকে। প্রথমেই ঘরে ঢুকলো চুং-রেন। ঘরে ঢুকতেই তার নজর পড়লো ভূপতিত মৃতদেহের দিকে। তারপর হো-সানের দিকে তাকালো সে।

"ওকে হত্যা করা হলো কেন ?" চুং-রেন বললে,—"আপনি কি বলতে চান ও আত্মহত্যা করেছে ?"

"লোকটা বিশ্বাসী ছিলো না, ও একজন দেশদ্রোহী খ্রীষ্টান। আমার দিকে বন্দুক উচিয়েছিলো লোকটা।"

ওরা একে অন্যের দিকে তাকালো। হো-সান তারপর সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলো—"মৃতদেহটা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও।"

সৈনিকরা মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চুং-য়েনও গেল তাদের সঙ্গে। ঘরে তখন হো-সান আর ও'বেনিয়ন ছাড়া আর কেউ নেই। হো-সান ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বললে,—"আপনিই লোকটির মৃত্যুর কারণ। আপনি চোখ ইসারা না করলে আমি ওকে গুলি করতাম না।"

তুমি যে ওকে হত্যা করবে তা আমি ধারণাও করতে পারিনি। ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"অন্যায়কে তুমি হয়তো ন্যায় বলে প্রতিপন্ন করতে পারবে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির জীবন দান করতে তো পারবে না।"

একটু চুপ করে থেকে ফাদার ও'বেনিয়ন আবার বললেন,—"তোমার এখন উচিত হবে ছেলেটিকে নিজের ছেলে বলে স্বীকার করে নিয়ে ওর মাকে বিয়ে করা।"

ও'বেনিয়নের কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে হো-সান অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। তার দিকে তাকিয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন বুঝতে পারলেন যে, তার মনের মধ্যে ঝড় বইছে। অবশেষে সে ও'বেনিয়নের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—"আমি যদি ওখানে যাই তাহলে আপনার কথায় যাবো না। আমি যে ন্যায়বান লোক সেই কথাটা প্রমাণ করবার জন্যই আমি যাবো।"

এই কথা বলে হঠাৎ সে গলার স্বর নামিয়ে বললে—"আমি দেখতে চাই বাচ্চাটার চোখ কালো না নীল। চোখ যদি নীল হয় তাহলে বুঝবো যে, আপনি নিজেকে যতটা সাধু বলে জাহির করেন, ততটা সাধু আপনি নন।"

ফাদার ও'বেনিয়ন হেসে ফেললেন হো-সানের কথা শুনে। "বেশ, নিজের চোখেই দেখে এসো। দেখলেই বুঝতে পারবে কে ওর জন্মদাতা, আমি না তুমি?"

"আপনি উপস্থিত না থাকলে হো-সানের সঙ্গে আমি কথা বলবো না"

শিউ-লান তিক্তস্বরে কথাগুলি বললে ফাদার ও'বেনিয়নকে।

শিউ-লান তার ছোট্ট ঘরটিতে বসে ছেলেকে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছিলো।

"আমার থাকা কি উচিত হবে?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"তাহলে আমার পক্ষেও উচিত হবে না তাকে এখানে ঢুকতে দেওয়া।" শিউ-লান দৃঢ়স্বরে বললে—"আপনি যাই বলুন, ফাদার, হো-সানের সঙ্গে আমি নিভৃতে কথা বলতে পারবো না।"

"কিন্তু মদন দেবের (Cupid) সামনে আমি উপস্থিত থাকতে চাই নে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"মদন দেব কে?" শিউ-লান জিজ্ঞাসা করলো।

"মদন দেব হলো ছিদেনদের একজন দেবতা।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"সে এখন তোমার কোলে আশ্রয় নিয়েছে।"

কথাটা শুনে খুশী হয়ে উঠলো শিউ-লান। "আপনি তাহলে বলছেন আমার ছেলেকে দেবতার মতো দেখতে।"

"হ্যাঁ। তাই।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন—"আমি আশা করছি সে এবার মদন দেবের কাজ করবে।"

"মদন দেবের কাজ মানে?" শিউ-লান জিজ্ঞাসা করলো।

"মদন দেবের কাজ হলো ভালোবাসার বন্ধনে পুরুষ ও নারীকে একত্রে বাঁধা।" শিউ-লান হেসে উঠলো। "কিভাবে এ কাজটি সে করবে?"

"ফুলের ধনুর্বানের সাহায্যে।" ফাদার ও'বেনিয়ন মৃদু হেসে বললেন—"ফুলশরের সাহায্যে দুটি হৃদয়কে এক করে বাঁধে সে।"

ফাদারের কথা শেষ হতে না হতেই হো-সান ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে ফাদার ও'বেনিয়ন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শিউ-লানের

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে উঠে ছেলেটার মুখখানা তার কাঁধের ওপরে নিয়ে লুকিয়ে রাখলো! হো-সান স্থির দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। শিউ-লানও তাকালো তার দিকে। তার মনের মধ্যে তখন ঝড় বইছে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর হো-সান প্রথমেই কথা বললে।

"ছেলেটিকে একবার দেখাও।"

শিউ-লান তার দিকে পেছন ফিরে তাকালো। এবার সে ছেলেটির মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলো।

"কালো চোখ!" নিজের মনেই কথাটা বলে সে।

"তুমি কি অন্য রঙ আশা করেছিলে নাকি?" শিউ-লান পেছন দিকে তাকিয়েই বলে কথাটা।

"না," হো-সান বললে,—"আমি তা আশা করিনি।"

"এবার তাহলে কি বলতে চাও?" শিউ-লান বললে।

হো-সান চুপ করে থাকে। শিশুটি তখন বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ হো-সানের মনে জেগে ওঠে অপত্যস্নেহ। সে মনে মনে বলে,—"হ্যাঁ এ ছেলে আমার, আমারই ঔরষে ওর জন্ম হয়েছে।"

তারপর শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে সে বললে—"তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি। তুমি প্রথম যেদিন আমার অফিসে গিয়ে রেক্টরীতে থাকবার জন্য আমার অনুরোধ করেছিলে সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ, আমার মনে আছে।" শিউ-লান মুখ না ফিরিয়েই বললে।

"তুমি কি বুঝতে পারোনি কেন আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছিলাম?" হো-সান বললে, "অপর কাউকে আমি এ রকম অনুমতি দিই নি।"

"কেন অনুমতি দিয়েছিলে তা কি করে জানবো আমি?" শিউ-লান বললে।

"কেন দিয়েছিলাম শুনবে?" হো-সান বললে—"সেদিন আমি তোমাকে কিছু বলিনি। আমি তোমাকে অনুমতি দিয়েছিলাম তোমাকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম বলে। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পারি যে, তুমি ওই যুবক পাদ্রীকে ভালোবাসো। এটা জানবার পর আমি ওকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম।"

"এখন আর আমি ওঁকে ভালবাসিনে।" শিউ-লান মৃদুস্বরে বললে,—"এখন আমি ওকে ধর্মবাবা ছাড়া আর কিছু ভাবিনে।"

"তার মানে উনি তোমাকে চাননি এই তো?" হো-সান বললে।

"হ্যাঁ, উনি আমার মনের কলুশকে দূর করে দিয়েছেন।" শিউ-লান বললে।

"আমি যদি সেদিন তোমার সঙ্গে ওই রকম ব্যবহার না করতাম তাহলে ব্যাপারটা হয়তো অন্যরকম হতো, তাই না?"

"তুমি একটা পশু।" শিউ-লান বললে,—"হ্যাঁ, তুমি পশুর চেয়েও অধম।"

"না, না। এমন কথা বলো না!" হো-সান অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে,—"আমাকে তুমি ক্ষমা করো।"

"আমি—আমি তোমাকে ক্ষমা—না, না। সেদিন আমার সঙ্গে তুমি পাগলা ষাঁড়ের মতো ব্যবহার করেছিলে। সে ব্যবহার আমি ভুলতে পারিনে।"

"আমাকে ষাঁড় বলে অপমান করো না," হো-সান বললে—"আমি প্রতিজ্ঞা করছি—"

"কোনো মেয়েকে কেউ ভালোবাসলে তার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে না।" শিউ-লান বললে।

"তা করে না ঠিকই, আমি সেদিন ভুল করেছিলাম। তোমাকে ওই পাদ্রী সাহেবের ঘরে দেখে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো।"

ছেলেটিকে কোলে নেবার জন্য হো-সান এগিয়ে আসে শিউ-লানের দিকে। শিউ-লান দেওয়ালের দিকে পিছু হটতে থাকে।

"দেওয়ালে ঠেকে যাবে যে!" হো-সান মৃদুহেসে বলে।

"না।"

"আমি তাহলে ছেলের সঙ্গে কথা বলবো।" ছেলের দিকে তাকিয়ে হো-সান বলে—"তুমি আমার ছেলে। হ্যাঁ, আমারই ছেলে তুমি। কিন্তু যেভাবে তোমাকে পেয়েছি সেটা খুবই দুঃখজনক। আমি তার জন্যে দুঃখিত। তুমি তোমার মাকে বলতে পারো, এরকম কাজ আর কখনও হবে না।"

"তুমি এখান থেকে চলে যাও।" শিউ-লান বলে,—"তুমি এখনই চলে যাও এখান থেকে।"

হো-সান তার হাত দুটি শিউ-লানকে বেষ্টন করে দেওয়ালে ঠেকায়। "এবার তুমি আমার বন্দী।"

এরপর কি হতো তা বলা সম্ভব নয়; কারণ ঠিক এই মুহূর্তেই ফাদার ও'বেনিয়ন প্রবেশ করলেন সেই ঘরে। তার সঙ্গে দুজন বয়স্ক লোকও ঘরে ঢুকলো দুজনই চীনা। একজন পুরুষ এবং অন্যজন নারী।

"হো-সান!" স্ত্রীলোকটি চীৎকার করে বললে—"কি করছো তুমি?"

হো-সান তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসে। স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর চিনতে পারে সে। সে তার গর্ভধারিণী মা।

"এ তুমি কি করছো হো-সান?" তার মা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেসা করে।

কি করে সে বলবে, কি সে করতে যাচ্ছিলো? সে নিজেই তা জানে না। সে তার বাবার দিকে তাকায়। বাবাকে দেখে হঠাৎ তার মনে এক নতুন ভাবের সৃষ্টি হয়। আগে সে তার বাবাকে ভালোবাসতো না। কিন্তু আজ নিজে সন্তানের বাবা হয়ে বুঝতে পারছে, বাবার সঙ্গে সন্তানের কি সম্বন্ধ' "আপনি আমাকে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিলেন কেন?" হো-সান তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে।

বৃদ্ধ লোকটি তার দিকে তাকিয়ে বলে—"তুমি কি মনে করো আমরা তোমাকে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম?"

"হ্যাঁ, তা-ই আমি মনে করি। কারণ আপনারা তাই করেছিলেন।" হো-সান বললে।

"তোমার মনে এই রকম ভ্রান্ত ধারণা কেন হলো তা আমি বুঝতে পারছিনে। আমরা তোমাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর বহু খোঁজাখুঁজি করে যখন তোমার সন্ধান পেলাম তখন তুমি রেক্টরীতে স্থান পেয়েছো। মনসিনর তোমাকে আমাদের হাতে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তোমাকে নিইনি। এর কারণ এই নয় যে, আমরা তোমাকে চাইনি। আসল কারণ হলো আমরা তখন কোনোদিন আধপেটা খেয়ে এবং কোনোদিন না খেয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। তাই আমরা যখন দেখতে পেলাম যে, মনসিনর তোমাকে সন্তান স্নেহে পালন করছেন, তখন আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে চাইনি। কিন্তু মাঝে মাঝেই এসে তোমাকে দেখে যেতাম।"

বাবার মুখ থেকে এই কথা শুনে হো-সান মনে মনে অনুতপ্ত হয়। সে বুঝতে পারে, সে ওঁদের বুঝতে ভুল বুঝেছিলো।

এই সময় তার মা এগিয়ে এসে বলতে শুরু করলো:

"হো-সান, তুমি কি করে ভাবলে যে, আমরা তোমাকে পরিত্যাগ

করেছি। মা বাবা কখনও কি তাদের সন্তানকে পরিত্যাগ করতে পারে? ওই শিশুটির মুখের দিকে একবার তাকাও তো! ফাদার আমাদের বলছেন যে, তুমিই ওর বাবা। আমি এটা বিশ্বাস করি। ওকে দেখতে ঠিক তোমার মতোই হয়েছে। জন্মাবার পর তোমার চেহারাও ঠিক ওর মতোই হয়েছিলো। অমনি বড়ো বড়ো কালো চোখ। তুমি কি পারো ওকে পরিত্যাগ করতে? না। তা তুমি কিছুতেই পারো না।"

এই বলে শিউ-লানের কাছে এগিয়ে এসে তার কাছ থেকে শিশুটিকে নিয়ে কোলে করে সে। ছেলেটি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। ছেলেকে কাঁদতে দেখে হো-সান শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে অসহায় ভাবে বলে—"ও কাঁদছে যে!"

শিউ-লান ছেলেকে নেয়, কিন্তু তার কান্না থামে না।

"তুমি ওকে ঠিক মতো ধরো নি।" হো-সান বলে।

"বেশ, তাহলে তুমি নিজে ওকে ধরো।" এই কথা বলে শিশুটিকে হো-সানের হাতে তুলে দেয় সে।

হো-সান তাকে কোলে নিতেই হঠাৎ তার কান্না থেমে যায়। হো-সানের মুখের দিকে তাকাতে থাকে সে।

হো-সানের মা খুশী হয় এই দৃশ্য দেখে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে সে বলে—"দেখ দেখ, ছেলে তার বাপকে কেমন চিনে নিয়েছে!"

হো-সান তার মায়ের দিকে তাকায়। তার মুখে তখন শিশুর মতো সরল হাসি। হো-সানের বাবা এবং ফাদার ও'বেনিয়ন খুশী হন তার মুখে হাসি দেখে। আগের দিনের ভুল ধারণা, ভুল বোঝাবুঝি সব যেন ধুয়ে মুছে গেছে।

হো-সানের মুখে আর কোনো কথা নেই। কিছুক্ষণ ছেলেকে কোলে করে রাখবার পর তাকে সে শিউ-লানের কোলে তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সারাটা রাত ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে বসে ভাবছে হো-সান। ঘুরে ফিরে শিশুটির কথাই মনে হচ্ছে তার। শিশুর সুন্দর মুখখানা বার বার ভেসে উঠছে তার মনের মধ্যে। শিউ-লানের কথাও মনে হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে ফাদার ও'বেনিয়নের কথা। ওঁকে সে অন্যায় ভাবে সন্দেহ করেছিলো। আজ সে বুঝতে পারছে, উনি প্রকৃতই সন্ন্যাসী। নারী দেহের প্রতি ওঁর আদৌ কোনো লোভ নেই। অথচ কী নির্যাতনই করা হয়েছে ওঁকে! বৃদ্ধ মনসিনরের ওপরের অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। অথচ ওঁরই দয়ায় সে মানুষ হয়েছে। মনসিনর একটু রাগী প্রকৃতির; কিন্তু ফাদার ও'বেনিয়ন একেবারে মাটির মানুষ। যে ব্যক্তি ওঁর ওপরে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে তার প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে উনি কি না করেছেন! সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর দয়াতেই হো-সান বেঁচে গেছে। বাবা মা-র কথাও মনে হয় হো-সানের। ওঁদের সঙ্গেও সে ভালো ব্যবহার করেনি। বার বার এইসব কথাই মনে হওয়ায় হো-সানের মনটা অনুশোচনায় ভরে ওঠে। পার্টির কথাও মনে হয় তার। সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়। কনিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়েই সে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে এই কথা মনে করে যে, চার্চ যা পারেনি কমিউনিজম তা পারবে। চার্চের কাজ চলে মন্থর গতিতে। চার্চ যদিও মনে করে যে, একদিন না একদিন সারা পৃথিবীতে সবাই হবে ভাই-ভাই, সবাই ভালোভাবে খেতে পরতে পাবে, মানুষে মানুষে স্বার্থের সংঘাত থাকবে না—কিন্তু কতদিনে সে অবস্থা আসবে তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু কমিউনিজম তথা কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুতগতিতে এই লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে। এখনও সে এই কথাই মনে করে। কিন্তু পার্টির কাজকর্ম লক্ষ্য করে তার মনের বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে। সে ভেবেছিলো যে, পার্টির ভেতরে যে

করাপশন দেখা গেছে তা হবে নিতান্তই সাময়িক। জনগণের ওপরে যেভাবে জোর-জবরদস্তি আর নির্যাতন চালোনা হচ্ছে তা শুধু শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যেই। এই কথা ভেবে সে তার মন থেকে দয়া মায়া স্নেহ ভালোবাসা সব কিছু দূর করে দিয়েছিলো। ভালোবাসার শক্তির কথাও সে ভুলে গিয়েছিলো। হয়তো জীবনে সে কাউকে ভালোবাসেনি বলেই এটা হয়েছিলো। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী পুত্র কন্যার ভালোবাসা যে পায়নি তার পক্ষে ভালোবাসার কথা চিন্তা করাও কঠিন। কিন্তু আজ সে বুঝতে পারছে ভালোবাসা কি জিনিস। শিউ-লানের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিলো অন্য কারণে। তার রূপ আর যৌবনই ছিলো এর কারণ। কিন্তু নিজের ঔরষযাত সন্তানকে দেখবার পর এবং বাবা মার কাছ থেকে তার ছেলেবেলার প্রকৃত ঘটনা জানবার পর তার মন আজ ভালোবাসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আজ শিউ-লানকে সে দেখছে তার নিজের সন্তানের জননী হিসেবে।

গভীর রাত পর্যন্ত এই সব কথাই চিন্তা করছে সে। এবং যতই চিন্তা করছে ততই তার মনটা অনুশোচনায় ভরে উঠছে। কেন এমন হচ্ছে? কেন তার মন আজ ভালোবাসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে? এর উত্তর সে খুঁজে পায় না। কার কাছ থেকে জানা যাবে এর সদুত্তর? মনসিনর?—না, তিনি এর উত্তর দিতে পারবেন না। তিনি ভালো মানুষ হলেও ভীষণ রাগী। এর উত্তর দিতে পারেন শুধু ফাদার ও'বেনিয়ন। হ্যাঁ, তিনিই পারেন এর উত্তর দিতে। এই কথা মনে হতেই সে তার টেবিলের ওপরের ছোট ঘণ্টাটা বাজালো। ঘণ্টা ধ্বনি শুনে পাশের ঘর থেকে তার বৃদ্ধ চাকর এসে দাঁড়ালো তার সামনে। লোকটি অত্যন্ত বিশ্বাসী।

"তুমি এখনই রেক্টরীতে গিয়ে ওখানে যে অল্পবয়সী পাদ্রী আছেন তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।" হো-সান আদেশ করলো,—"তাঁকে

বলবে যে, আমার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়েছে। তাঁকে পেছনের গোপন পথ দিয়ে নিয়ে আসবে। সামনের দরজা দিয়ে নয়, বুঝলে!"

লোকটি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হো-সান তখন দাঁড়িয়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলো। হাত দুটি পেছনে নিয়ে মাথাটা নিচু করে পায়চারি করছে সে। তার মনের মধ্যে বার বার ভেসে উঠছে শিশুটির মুখখানা। শিশুটি তার অবৈধ সন্তান হলেও তার প্রতি অসীম মমতা জাগে হো-সানের মনে। ফাদার ও'বেনিয়ন কি ওকে বৈধ করতে পারবেন? শিউ-লান কি রাজী হবে তাকে বিয়ে করতে। এই সব কথা চিন্তা করতে করতে হো-সানের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

"আমি এসেছি, হো-সান।" পেছনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন।

হো-সান দাঁড়িয়ে পড়ে। "আপনার কথাই আমি ভাবছিলাম ভেতরে আসুন। একটু গরম চা পান করুন।"

ও'বেনিয়ন ভেতরে ঢুকে আসন গ্রহণ করেন। হো-সান টিপট থেকে একটা বাটিতে চা ঢেলে ফাদার ও'বেনিয়নের সামনে এগিয়ে দেয়। ও'বেনিয়ন তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চায়ের বাটিটা মুখে তুলে চুমুক দেন।

"আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি, ফাদার।" হো-সান বললে।

"কি হয়েছে খুলে বলো আমাকে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"চিন্তিত হয়েছি আমার ছেলের মায়ের ব্যাপারে।" এই বলে কথাটা শুরু করে হঠাৎ সে থেমে যায়। কি করে সে বলবে যে, শিউ-লানকে সে ভালোবেসে ফেলেছে।

"মেয়েটা সত্যিই ভালো। ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন।"

"আপনি তো ওকে অনেকদিন থেকে জানেন!" হো-সান বলে।

"হ্যাঁ। অনেকদিন থেকে ওকে জানি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"এবং ওকে জানি বলেই আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি, ওর মতো ভালো মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।"

"ও আমাকে ঘৃণা করে।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না।" ফাদার ও'বেনিয়ন মৃদু হেসে বলেন।

"আপনি যাই বলুন আমি জানি ও আমাকে ঘৃণা করে।" হো-সান বলে,—"ঘৃণা করাটা স্বাভাবিক।"

ঘৃণাকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায়।" ওবেনিয়ন বলেন।

"আপনি তো সবই জানেন", হো-সান ও'বেনিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—"সব জেনেও কি মনে করেন ওর মন থেকে ঘৃণা দূর করা সম্ভব?"

"নিশ্চয়ই।" ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন, "মানব জীবনের এটাই হলো ধর্ম।"

হো-সান এক বাটি চা পান করলো। তারপর খালি বাটিটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে ও'বেনিয়নের মুখের দিকে তাকালো। "আমি এখনই একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাই।" কিন্তু আমি মনঃস্থির করতে পারছিনে। হো-সান বললে।

"তোমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা আমাকে বললে আমি হয়তো এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

"তাহলে খুলেই বলছি সব কথা।" হো-সান বললে—"আমি খবর পেয়েছি যে, আগামীকাল ওপর হতে আমার বদলির আদেশ আসবে। আমার অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে আমাকে দক্ষিণ অঞ্চলে

যেতে হবে। আমার ধারণা, আমার কোনো শত্রু আমাদের নেতার কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। আমার মনে হয় চুংই এ কাজটি করেছে। সে আমাকে হিংসে করে। আমাকে সে ধ্বংস করতে চায়। সুতরাং······

"সুতরাং তুমি যাবে কি যাবে না তা স্থির করতে চাইছো, তাই না?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করে।

"আমাকে যেতেই হবে।" হো-সান নিম্নকণ্ঠে বলে,—"আমি যদি এ আদেশ অমান্য করতে চাই তাহলে আমাকে পালাতে হবে। আগে যদি এ আদেশ হতো তাহলে আমি খুশী মনেই এখান থেকে চলে যেতাম, যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মতো মনোবল এবং শিক্ষা আমার আছে।"

"আমি তা জানি" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"এবং তা জানি বলেই তোমার সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমি কখনও দুষ্কৃতকারী বলে মনে করিনি, এমনকি তুমি যখন আমার সামনে একজন সৈনিককে হত্যা করেছিলে তখনও আমি তোমাকে দুষ্কৃতকারী বলে মনে করিনি। আমি জানতাম যে, তুমি অনিচ্ছা-সত্ত্বেই ও কাজটি করেছিলে।"

একটু থেমে তিনি আবার বলেন,—"নরহত্যা করা পাপ। কিন্তু তুমি যে অদ্ভুত জগতে বাস করছো, তাতে তুমি বাধ্য হয়েই নরহত্যা করেছো।"

"হ্যাঁ, ওকে হত্যা না করে উপায় ছিলো না।" হো-সান বললে, —"কিন্তু আমার জগৎ কি ভ্রান্ত?"

"এ প্রশ্নের উত্তর তুমি তোমার নিজের মনের কাছেই জিজ্ঞেস করো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আমার জগতে এটা অপ্রয়োজনীয়; শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, অসম্ভবও।"

হো-সান ফাদারের মুখের দিকে তাকায়।

"শুনুন ফাদার, জীবনে আমি কাউকে ভালোবাসিনি।" হো-সান বলে,—"কারো ভালোবাসাও আমি পাইনি। আপনি হয়তো বলবেন, মনসিনরের ভালোবাসা আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু আমি তা মনে করিনে। তাঁর কাছ থেকে আমি যা পেয়েছিলাম, তা নিছক দয়া আর অনুকম্পা ছাড়া আর কিছু নয়। মা-বাবার ভালোবাসা যে কি জিনিস তাও আমি বুঝতে পারিনি। এই কারণেই আমি কাউকে ভালোবাসতে পারি নি। তাছাড়া মনসিনর আমাকে বলতেন যে, ভালোবাসা একটা নিকৃষ্ট জিনিস এবং তার শক্তিও নিকৃষ্ট ধরনের, ভালোবাসা মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। প্রথম দিকে আমিও এই কথাই বিশ্বাস করতাম। তারপর কমিউনিস্ট মতবাদ পড়ে এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে আমি সব জিনিস অন্য চোখে দেখতে থাকি।...কিন্তু—"

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ সে থেমে যায়। তারপর আবার বলতে শুরু করে,—"কিন্তু এখন আর আমার মনে আগের সেই চিন্তাধারা নেই। আমার মানসিক অবস্থা এখন সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। আমি এখন ছেলের বাবা। ছেলের সঙ্গে রয়েছে তার মা...এবং আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা। আজ আমি বুঝতে পেরেছি, তাঁরা আমাকে ইচ্ছে করে পরিত্যাগ করেননি। আমি তাই আবার নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। আগে আমি ওঁদের ভালোবাসতে পারিনি, কারণ আমি মনে করতাম, আমাকে ওঁরা চাননি।"

"মনসিনর কি তোমাকে ওঁদের কথা বলেননি?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করেন।

"না। তিনি ওঁদের কথা কিছুই বলেন নি।" হো-সান বলে,—"মনসিনর আমাকে অনেক কথা বলেছেন এবং অনেক জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি একদিনও আমাকে বলেননি যে,

আমার মা-বাবা আমাকে ভালোবাসেন।…এখন আমি সব কিছু জানতে পেরেছি। আর আমি ওঁদের ছেড়ে দূরে যেতে রাজী নই। কিন্তু আমাকে যদি ওপরওয়ালার আদেশ পালন করতে হয় তাহলে আমাকে ওঁদের ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি তা চাইনে। মা-বাবা, ছেলে এবং—"

"এবং তোমার স্ত্রী।" ফাদার ও'বেনিয়ন অনুক্ত কথাটা প্রকাশ করেন।

"হ্যাঁ। আমার ছেলের মা নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী।" হো-সান বলে।

আবার চুপ করে যায় হো-সান। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ফাদার ও'বেনিয়ন বলেন,—"আমার মনে হচ্ছে, তুমি মনঃস্থির করতে পারছো না। তোমার মনটা এখনও পার্টির দিকে ঝুঁকে আছে।"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন ফাদার। সত্যিই আমি মনঃস্থির করতে পারছিনে। সত্যি কথা বলতে কি, পার্টির বন্ধন থেকে আমি এখন মুক্ত হতে চাই। কিন্তু তার মানে আমাকে এ দেশ থেকে পালাতে হবে। এই প্রশ্নটাই আমার মনের মধ্যে ঝড় তুলেছে। এ ব্যাপারে আপনি কি উপদেশ দেন?"

"আমি কি উপদেশ দেবো?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"এ প্রশ্নের উত্তর তোমার নিজের মনকেই জিজ্ঞেস করো।"

"নিজের মনকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু সঠিক উত্তর পাইনি।" হো-সান বললে—"কিন্তু আমাকে একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসতেই হবে, এবং এখনই আসতে হবে।"

একটু চুপ করে থেকে হো-সান আবার বললে,—"শুনুন ফাদার, আমি পালাবো বলেই স্থির করেছি। চুং এবং তার লোকদের ধোঁকা দিতে অসুবিধে হবে না আমার। এখনও ওরা আমার অধীনস্থ। আমার আদেশ ওরা মানতে বাধ্য।"

"কি বলতে চাচ্ছো তুমি?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করলেন।

হো-সান মনে মনে কি চিন্তা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে টেবিলের ওপরে একটা ঘুসী মেরে সে বললে—"ঠিক হয়েছে, আমরা সবাই একসঙ্গে পালাবো।"

"কিভাবে?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমাদের তো নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় আমরা কেমন করে পালাবো তা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার।"

"তাহলে শুনুন।" হো-সান তাঁর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে মৃদুস্বরে বললে,—"টান-ইয়াংয়ে একজন আমেরিকান মিশনারী আছে। জায়গাটা এখান থেকে একশো মাইল দক্ষিণে। আমি এক আদেশ জারী করবো যে, আগামীকালই তার বিচার হবে। আমি আরও আদেশ দেবো যে, আপনার এবং মনসিনরের বিচারও একই সঙ্গে হবে। আমি এই বলে আদেশ জারী করবো যে, আপনাদের অবিলম্বে টান-ইয়াং অভিমুখে রওনা হতে হবে। এর জন্যে রেক্টরীর গাড়িটা আপনাদের দেওয়া হবে। আমার বাবা-মা, ছেলে এবং তার মাকেও নিয়ে যাবেন আপনারা। আগামীকাল সকালেই আপনাদের রওনা হতে হবে। আমি আমার আমেরিকান গাড়িটা নিয়ে আপনাদের অনুসরণ করবো। আমার সৈনিকরাও যাবে একটা ট্রাকে করে। অনেক দূর যাবার পর আপনারা গাড়িটা থামিয়ে দেবেন। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করবো, গাড়ি থামানো হলো কেন? আপনারা বলবেন যে, এঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, এটা হতে পারে বটে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন।

"আমি তখন আপনাদের গাড়িটাকে আমার গাড়ির পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে থাকবো। আপনাদের যাতে ঠিক সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত করা যায় সেই উদ্দেশেই এটা করা হবে।"

"তারপর ?" ফাদার ও'বেনিয়ন জিজ্ঞেস করলেন।

"তারপর কি করা হবে তা আমি পথে যেতে যেতে স্থির করবো।" হো-সান বললে।

এই সময় হো-সানের চাকরটি ঘরে ঢুকে বললে—"ভোর হয়ে এসেছে হুজুর!"

"সে কি! এত তাড়াতাড়ি ভোর হয়ে গেল!" হো-সান ও'বেনিয়নের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। "আপনি এখনই পেছনের দরজা দিয়ে চলে যান। একটু পরেই আমি প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করবো।"

॥ ষোল ॥

বেলা তখন প্রায় দুপুর। ফাদার ও'বেনিয়ন গাড়ি চালাচ্ছেন। মনসিনর বসেছেন তাঁর বাঁ দিকে। পেছনের সিটে বসেছে হো-সানের বাবা, মা, আর শিউ-লান। ছেলেটা রয়েছে তার কোলে। ছেলেটার খিদে পেয়েছে। সে তখন কাঁদছে। মনসিনরের মেজাজ রীতিমত খাট্টা।

"হো-সানের মতলব সুবিধের নয়," মনসিনর তিক্তকণ্ঠে বললেন,—"তুমি যে কেন ওর কথামত কাজ করছো তা আমি বুঝতে পারছিনে। ধারে কাছে একটা চায়ের দোকানও নেই যে, এক কাপ চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নেবো।"

"আমি ঠিকই করেছি।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আমাদের দুঃখের দিন শেষ হতে আর দেরী নেই।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না।" মনসিনর বললেন,—"ও আমাদের আজ ফাঁসিতে লটকাবে বলে মনে হচ্ছে।"

এই সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে হো-সানের গাড়িটা দেখতে পেলেন ফাদার ও'বেনিয়ন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়িটা থামিয়ে দিলেন।

"কি হলো!" মনসিনর বললেন—"গাড়ি থামালে যে?"

"এই রকমই কথা ছিলো।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মুক্তি পাবো।"

হো-সানের গাড়িটা একটু পরেই এসে গেল ওখানে। গাড়ি থামিয়ে হো-সান ক্রুদ্ধস্বরে বললে—"কি হলো! গাড়ি থামালে কেন?"

"এঞ্জিনটা বিকল হয়ে গেছে।" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"এখন কি করে যাবো তাই ভাবছি!"

"সে কি! বেলা তিনটেয় বিচার শুরু হবে যে!" হো-সান চিন্তিত হবার ভান করলো। "তিনটের আগেই তোমাদের আদালতে পৌঁছাতে হবে।"

"আমি কি করতে পারি?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"যন্ত্রের ওপরে তো আমার হাত নেই!"

হো-সান একটু চিন্তা করলো। তারপর ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বললে—"আমার গাড়িটা সামনে নিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের গাড়িটা আমার গাড়ির পেছনে বেঁধে দাও। আমি ওটাকে টেনে নিয়ে যাবো।"

হো-সান তার গাড়িটাকে সামনে নিয়ে গেল। ফাদার ও'বেনিয়ন গাড়ি থেকে নেমে তাঁর গাড়িটাকে হো-সানের গাড়ির পেছনে চেন দিয়ে বাঁধতে শুরু করলেন। এই সময় সৈন্য-বোঝাই ট্রাকখানা সেখানে এসে হাজির হলো। চুং-রেনও ছিলো সেই ট্রাকে। হো-সানের গাড়ির সঙ্গে বন্দীদের গাড়িটা বাঁধা হচ্ছে দেখে সৈনিকরা গাড়ি থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়লো। পেছনের

গাড়িটাকে ঘিরে ফেললো ওরা। হো-সান তাদের দিকে তাকিয়ে বললে—"তোমরা এগিয়ে যাও। আমি বন্দীদের নিয়ে আসছি।"

হো-সান রেডআর্মির একজন কর্নেল এবং চুং-য়েন তার অধীনস্থ লেফটেন্যান্ট। চুং-য়েন তাই মনে মনে গজরাতে গজরাতে সৈনিকদের সঙ্গে ট্রাকে চড়ে এগিয়ে চললো।

ওরা অনেকটা দূরে গেলে হো-সান ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললে,—"এখন পর্যন্ত সবই পরিকল্পনা মতোই চলেছে, এবার পরবর্তী কর্মপন্থার জন্যে তৈরী হতে হবে আমাদের।"

এই কথা বলেই সে তার গাড়িতে উঠে বসলো। রেক্টরীর গাড়িটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে হো-সানের গাড়ির পেছনে। কিছুক্ষণ চলবার পর হো-সান ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললে—এবার ওপরে উঠতে হবে। খুব সাবধানে চালাবে বুঝলে!

ওদের এবার ওপরের দিকে উঠতে হবে সরু পার্বত্য পথ দিয়ে। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল গাড়ি দুটো। ডান দিকে গভীর খাদ। খাদের নিচে বয়ে চলছে একটা পার্বত্য নদী। ক্রমশঃ গাড়ি দুটো এমন জায়গায় এসে হাজির হলো যেখান থেকে পেছনের গাড়িটা টেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ড্রাইভার তখন গাড়ি থামিয়ে হো-সানের দিকে তাকিয়ে বললে—"স্যার, এই পথ দিয়ে গাড়ি টেনে নেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। একটু এদিক ওদিক হলেই আমরা শত শত ফিট নিচে পড়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবো।"

ড্রাইভারের কথা শুনে হো-সান বললে—"ঠিকই বলেছো। কিন্তু এখন তাহলে কি করা যায় বলো তো!"

"যাই করা যাক, ও গাড়ি টেনে নেওয়া আর সম্ভব হবে না।" ড্রাইভার বললে।

হো-সান একটু চিন্তা করে বললে,—"ঠিক আছে। ও গাড়ির আরোহীদের আমাদের গাড়িতে তুলে নিচ্ছি।"

"তা না হয় নিলাম" ড্রাইভার বললে—"কিন্তু ও গাড়িটাকে যদি পথের মধ্যে রেখে যাই তাহলে অন্য কোনো গাড়ি এ পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না।"

"সে কথাও আমি চিন্তা করেছি।" হো-সান বললে,—"ওদের সবাইকে আমাদের গাড়িতে তুলে নেবার পর ও গাড়িটাকে ঠেলে নিচে ফেলে দেবো। ওই রকম একটা বাজে গাড়ি নষ্ট হলে আমাদের কিছু আসবে-যাবে না। তুমি বরং নেমে শিকলটা খুলে দাও।"

হো-সানের নির্দেশে ড্রাইভার নিচে নেমে শিকলটা খুলতে শুরু করলো। ইত্যবসরে হো-সান গাড়ি থেকে নেমে মনসিনরের দিকে তাকিয়ে আদেশের সুরে বললে,—"তোমরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে আমার গাড়িতে উঠে বসো। পিছনের সীটে বসতে হবে তোমাদের। একটু অসুবিধে হয়তো হবে, কিন্তু উপায় নেই। ও গাড়িকে টেনে নেওয়া সম্ভব নয়।"

হো-সানের নির্দেশে মনসিনর আর ফাদার ও'বেনিয়ন গাড়ি থেকে নেমে আগের গাড়িতে উঠে বসলেন। শিউ-লান এবং হো-সানেরও মা বাবাও উঠে বসলো সেই গাড়িতে।

সবাই উঠে বসলে হো-সান ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললে—"এসো, এবার ওই গাড়িটাকে ঠেলে নিচে ফেলে দেওয়া যাক। তুমি আগের দিক থেকে ধাক্কা দাও আমি পেছন থেকে ঠেলছি।"

এই কথা বলে সে গাড়িখানার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ড্রাইভার সামনের দিক থেকে ঠেলতে শুরু করলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়িটা হুড়মুড় করে নীচে পড়ে গেল।

ড্রাইভার তখন খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে গাড়িটার পতন লক্ষ্য করেছিলো। হো-সান যে কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে লক্ষ্যই করেনি। হঠাৎ হো-সান তাকে একটা ধাক্কা দিল। আচমকা

ধাক্কা খেয়ে ড্রাইভার খাদের মধ্যে পড়ে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শত শত ফিট নিচে নদীগর্ভে পড়ে বিলীন হয়ে গেল।

হো-সান তখন তার গাড়ির কাছে ছুটে এসে ড্রাইভারের আসনে বসলো। তারপর মনসিনর আর ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বলল—"আপনারা এখন সামনের সীটে চলে আসুন।"

তার কাণ্ড-কারখানা দেখে মনসিনর আর ফাদার ও'বেনিয়ন যেন পাথর হয়ে গেছেন। ওঁদের মুখ থেকে কোনো কথাই বের হচ্ছে না। ওঁরা নিঃশব্দে এসে সামনের সীটে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে দিল হো-সান।

কিছুদূর যাবার পর হো-সান ঘাড় ফিরিয়ে মনসিনরের দিকে তাকিয়ে বললে—"শুনুন মনসিনর। আপনি হয়তো আমার মতলবটা জানেন না। আমি এবার এই অভিশপ্ত দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। এবার আর আমাদের কোনো বাধা নেই। এবার আমরা নিরাপদ।"

ফাদার ও'বেনিয়নকে লক্ষ্য করে সে আবার বললে,—"শুনুন ফাদার ও'বেনিয়ন আমার পরিকল্পনা সফল হবার মুখে। আমরা এবার সীমান্তের দিকে যাবো। সীমান্ত এখান থেকে তিনশো মাইলের মতো। ওখান থেকে আমরা সোজা হংকং চলে যাবো। আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম চুং-রেন এবং আমার সৈনিকদের চোখে ধুলো দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে না। আমার কথা ঠিক হয়েছে দেখলেন তো! আপনি ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি মোটেই ভয় পাইনি।

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল সে। তারপর আবার বলতে শুরু করলো—"এবার আমি আমার ছেলের মাকে বিয়ে করবো। আমার নামেই আমার ছেলের নামকরণ করা হবে। বাবা মা স্ত্রী আর ছেলে—"

এই সময় মনসিনর কি ভেবে পেছনের দিকে তাকালেন। তারপর হঠাৎ চীৎকার বললেন—"পেছনের আকাশের দিকে একবার লক্ষ্য করো হো-সান। দিগন্তের কাছাকাছি আমি একটা হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছি। তুমি নিজেকে যতটা চালাক মনে করো তা তুমি নও।"

মনসিনরের কথা শুনে হো-সান পেছনের আকাশের দিকে তাকালো। ফাদার ও'বেনিয়নও তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সত্যিই দিগন্তের কাছাকাছিই একটা হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। ওটা দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে তাঁদের গাড়িটার দিকে।

"কি সর্বনাশ!" হো-সান বললে,—"এ যে দেখছি মিলিটারীর হেলিকপ্টার। ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এসে পড়বে। চুং-রেনই এটা করেছে। আমাকে সে সন্দেহ করেছিল। তাই সে কর্তৃপক্ষের কাছে গোপনে খবর পাঠিয়েছে।"

এই কথা বলেই সে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু হেলিকপ্টারকে পেছনে ফেলে পালানো একেবারেই অসম্ভব। প্রতি সেকেণ্ডে উভয়ের মধ্যের দূরত্ব কমছে। হো-সান বুঝতে পারলো যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই হেলিকপ্টার তাকে ধরে ফেলবে। সে তাই গাড়ি থামিয়ে ফাদার ও'বেনিয়নের দিকে তাকিয়ে বললে—"শুনুন ফাদার! আমার আর রক্ষা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু আমার যাই হোক না কেন, আমার ছেলেকে আপনি রক্ষা করুন। আমার ছেলে যেন আমার শত্রুদের হাতে না পড়ে।"

"আমি ওকে কিভাবে রক্ষা করবো?" ফাদার ও'বেনিয়ন বললেন,—"ওরা আমাদের কাউকেই রেহাই দেবে না।"

"আপনারা যে আমার গাড়িতে আছেন তা ওরা জানে না।" হো-সান বললে—"এবার আমি যা বলছি শুনুন এবং সেইভাবে

কাজ করুন আপনারা নেমে গিয়ে নিচের ওই বাঁশঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকুন। আমি গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ওরা আমাকেই। আমি বুঝতে পারছি, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা ধরে ফেলবে। তারপর আমাকে হেলিকপ্টারে করে রেড আর্মির দপ্তরে নিয়ে যাবে। ওখানে কোর্ট মার্শালে আমার বিচার। সে বিচারের ফল যে কি হবে তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। ওরা আমাকেই শুধু নিয়ে যাবে। আমার গাড়িখানা এই পড়ে থাকবে। আপনারা এক ঘণ্টা ওখানে লুকিয়ে থাকবেন। তারপর বাইরে এসে আমার গাড়িতে উঠে সীমান্ত পার হয়ে যাবেন। এদিকের সীমান্ত সুরক্ষিত নয়। সুতরাং সীমান্ত পার হয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না। সন্ধ্যার পরেই আপনি সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবেন।"

হো-সানের কথার সারবত্তা অনুধাবন করতে দেরী হলো না ফাদার ও'বেনিয়নের। তিনি তাই মনসিনয়ের দিকে তাকালেন তাঁর সম্মতির জন্য। মনসিনর বললেন—"বর্তমান অবস্থায় হো-সান যা বলছে তা আমাদের করতে হবে। ওর ছেলে বউ আর বাবা মাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে এর চেয়ে ভালো পন্থা আর কিছু হতে পারে না।"

এই কথা বলে তিনিই প্রথমে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফাদার ও'বেনিয়নও নামলেন। তিনি শিউ-লানের দিকে তাকিয়ে চীনা ভাষায় বললেন—"ছেলেকে নিয়ে তুমি নেমে এসো, শিউ-লান। তোমার শ্বশুড় শাশুড়ীকেও নামতে বলো। আমাদের এই খাদের ভেতরে নেমে ওই বাঁশঝাড়টার পেছনে আত্মগোপন করতে হবে।"

ফাদার ও'বেনিয়নের কথা শুনে সবাই নিচে নেমে দাঁড়ালো। এই সময় শিউ-লানের ছেলেটি হঠাৎ কেঁদে উঠলো। শিউ-লান

তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু
করে ছেলেটি ততই কাঁদে। ছেলেকে ওইভাবে
হো-সান এগিয়ে এসে তাকে কোলে তুলে নিলে
হো-সান তাকে কোলে নিতেই তার কান্না থেমে
ছেলের মুখে একটা চুমো দিয়ে তাকে শিউ-লানের
দিয়ে বললে—"বিদায় শিউ-লান। ভেবেছিলাম
তোমাকে বিয়ে করে বাবা-মার সঙ্গে এক সঙ্গে থাক
আর হলো না। ওই দেখ আমার যম এদিকে
আমাকে ধরবার জন্যেই ওটা আসছে। আর আ
আমাকে এখনই এখান থেকে চলে যেতে হবে। নই
ওরা গ্রেপ্তার করবে।"

এই বলে বাবা-মার দিকে তাকিয়ে অশ্রুপূর্ণ চো
বললে—"তোমরা আমাকে বিদায় দাও। আ
অকৃতজ্ঞ সন্তান। জীবনে তোমাদের জন্যে কি
ভেবেছিলাম, এবার তোমাদের নিয়ে নতুন করে স
কিন্তু তা আর হলো না।"

এরপর ফাদার ও'বেনিয়ন আর মনসিনরের দি
বললে—"আপনারা আর দেরী করবেন না। ওরা
বলে। আপনাদের প্রতি আমি যে অন্যায় ব্যবহার করেছি তার
জন্যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

এই কথা বলেই সে এক লাফে গাড়িতে চড়ে পূর্ণবেগে গাড়িটাকে
ছুটিয়ে দিলো সামনের দিকে। ফাদার ও'বেনিয়ন আর মনসিনর
ফিজগিবন শিউ-লান আর হো-সানের বাবা-মাকে নিয়ে নিচের
দিকে নামতে লাগলেন।

বাঁশঝাড়টা খুব বেশী নিচে ছিলো না। ওঁরা সবাই মিলে সেই

র পেছনে আত্মগোপন করলেন। কারো মুখেই কোনো
। শিউ-লানের চোখ দিয়ে তখন টপ টপ করে জল

পরেই হেলিকপ্টারটা কাছাকাছি এসে পড়লো।
ার গাড়ি তখন সামনের দিকে ছুটে চলেছে। হেলিকপ্টারটা
একটা বাজপাখির মতো নিচে নামতে লাগলো। এরপর
তা আর ওঁরা দেখতে পেলেন না।

র ও'বেনিয়ন তাঁর ঘড়িটা একবার দেখলেন।
রা একঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করবো।" তিনি বললেন,—
আমরা রওনা হবো সীমান্তের দিকে। হো-সান আমাকে
বলে গেছে।"

———